প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের তিনটি অ্যাডভেঞ্চার

পয়জন বেল্ট (বিষ-বলয়)

ডিসইনটিগ্রেসন মেশিন (নিলয় যন্ত্র)

হোয়েন দি ওয়ার্ল্ড স্ক্রীমড (পৃথিবী যেদিন চেঁচিয়েছিল)

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৪৮

প্রকাশক : মৈনাক বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ : মদন সরকার

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার সামই
স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
বাগবাগান স্ট্রীট

১। ঝাপসা রেখা

সময় যত যাবে, স্মৃতি ততই আবছা হবে। তাই অত্যাশ্চর্য সেই ঘটনাগুলোর খুঁটিনাটি স্মৃতির পটে জট পাকিয়ে যাওয়ার আগেই ঠিকঠাক লিখে ফেলব। ঠিক যে-ভাবে ঘটেছে, মনে থাকতে থাকতেই ঠিক সেই ভাবেই লিখব এবং লিখব এখুনি।

লিখতে বসে কিন্তু একটা কথা ভেবে অভিভূত না হয়ে পারছি না। অজ্ঞাত জগৎ-য়ের অ্যাডভেঞ্চারে আমরা যে কজন ছিলাম, বিস্ময়কর এই ব্যাপারটায় সেই কজনই জড়িয়ে পড়েছি। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, প্রফেসর সামারলি, লর্ড জন রক্সটন এবং আমি—চারজনেই আছি এই অদ্ভুত কাহিনীর মধ্যে।

বছর কয়েক আগে ডেলী গেজেট খবরের কাগজে লিখেছিলাম দক্ষিণ আমেরিকায় আমাদের এই ছোট্ট দলের ঐতিহাসিক অভিযানের বিবরণ। তখন কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি তার চাইতেও বিচিত্র এমন একটা কাহিনী পরে আমাকে লিখতে হবে যা অসাধারণ ঘটনা হিসাবে অদ্বিতীয় হয়ে থা[illegible]
ঘটনাটা অসাধারণ তো বটেই, তার চাইতে[illegible]
আমাদের চার মূর্তিমানের আবার এক জায়[illegible]
একই অভিজ্ঞতায় গা ভাসিয়ে দেওয়া। যা-[illegible]
সুস্পষ্টভাবে এবং যথা সম্ভব সংক্ষেপে লিখ[illegible]
জানি সাধারণ মানুষ বিশদ বিবরণ পেলেই [illegible]
। কৌতূহল কারোরই পুরোপুরি মেটেনি।

সাতাশে আগস্ট, শুক্রবার তারিখটা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐ দিনই আমি তিন দিনের ছুটি চেয়েছিলাম মিঃ ম্যাকআর্ডেলের কাছে। উনি তখন-ও নিউজ ডিপার্টমেন্টের কর্তা।

হন হন করে তাঁর ঘরে গিয়ে ছুটির কথা বলতেই উনি প্রথমে মাথা নাড়লেন, তারপর মাথার কিনারায় কোনমতে-থেকে-যাওয়া লালচে চুলের গোছা চুলকোলেন; তারপর মুখ দিয়ে অনিচ্ছেটা প্রকাশ করলেন।

বললেন—“মিঃ ম্যালোন, আমি কিন্তু কদিন ধরেই ভাবছিলাম কিভাবে আরো ভাল ভাবে কাজে লাগানো যায় তোমাকে। একটা গল্পের কথা ভাবছিলাম। সে গল্প তোমার চাইতে ভাল. কেউ লিখতে পারবে না।”

শুনে দমে গেলাম। কিন্তু বাইরে প্রকাশ করলাম না। বললাম—“তা তো বটেই। এভাবে কাঁহাতক আর বসে থাকা যায়। কিন্তু যেখানে এনগেজমেণ্ট করে ফেলেছি, সেটাও খুব দরকারী—খুব জানাশুনোর মধ্যে কিনা—না গেলেই নয়। যদি আমাকে ছাড়া চলে—”

“উঁহুঁ, তোমাকে ছাড়া চলবে না।”

গেল মেজাজটা খিঁচড়ে। কিন্তু মুখখানা যদ্দূর সম্ভব নির্বিকার রাখলাম। দোষটা আমারই। অ্যাদ্দিন সাংবাদিকতা করার পর আমার জানা উচিত ছিল যে সাংবাদিকরা কক্ষনো নিজেদের খেয়ালখুশী মত চলতে পারে না।

এইটুকু সময়ের মধ্যেই গলার স্বর যতখানি খুশী খুশী করা যায় বললাম—“তাহলে যাওয়া বাতিল। বলুন কি করতে হবে।”

“রোদারফিল্ডের সেই শয়তান লোকটার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে।”

সবিস্ময়ে বললাম—“প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কথা বলছেন?”

“ধরেছো ঠিক। গত সপ্তাহে ‘কোরিয়ার’ কাগজ থেকে এক ছোকরা গিয়েছিল। অ্যালেক সিম্পসন। প্রফেসর ছোকরার কোটের কলার খামচে ধরে বড় রাস্তায় মাইল খানেক হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেছেন। পুলিশ রিপোর্টে ব্যাপারটা পড়েছো

নিশ্চয়। অন্য কাউকে ওঁর কাছে পাঠানো মানে চিড়িয়াখানা থেকে ছাড়া পাওয়া কুমীরের সামনে তাকে ফেলে দেওয়া। কিন্তু তুমি পারবে। হাজার হোক পুরোনো বন্ধু তো।"

মনটা হাল্কা হয়ে গেল। বললাম—"আলবৎ পারবো। ছুটি চাইছিলাম রোদারফিল্ডে গিয়ে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গেই দেখা করব বলে। তিন বছর আগেকার প্রথম মালভূমি অ্যাডভেঞ্চারের বার্ষিকী-উৎসব উদযাপন করার জন্যে আমাদের সেই ছোট্ট দলের প্রত্যেককেই নেমন্তন্ন করেছেন।"

"অপূর্ব!" দুহাত ঘসতে ঘসতে চশমার মধ্যে দিয়ে খুশী চকচকে চোখে তাকিয়ে বললেন ম্যাকআর্ডল—"তুমিই পারবে পেট থেকে ওঁর অভিমত বার করতে। আর কেউ হলে বুঝতাম স্রেফ ভাঁওতা মারছেন। তবে ইনি একটা ব্যাপারে অন্ততঃ নাম করেছেন—আবার যে করবেন না তা কে জানে!"

"পেট থেকে কি বার করবো বললেন? অভিমত? কেন বলুন তো? আবার কিছু আরম্ভ করেছেন নাকি?"

"আজকের টাইমস্ কাগজে ওঁর লেখা চিঠি 'সায়েন্টিফিক পজিবিলিটিস' পড়ো নি?

"না।"

হেঁট হয়ে মেঝে থেকে একটা টাইমস্ কাগজ প্রায় ছোঁ মেরে তুলে আনলেন ম্যাকআর্ডল।

আঙুল দিয়ে একটা কলম দেখিয়ে বললেন—"জোরে পড়ো। আবার শোনা দরকার। সব কথা এখনো মাথায় ঢোকেনি।"

'গেজেট' কাগজের বার্তা সম্পাদককে সে যে চিঠিটা পড়ে শোনালাম, তা এই:

"বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা"

"মহাশয়,—আপনার কাগজে সম্প্রতি প্রকাশিত জেমস উইলসন

ম্যাকফেলের চিঠিখানা পড়ে ভীষণ মজা লাগল। গ্রহ আর স্থির নক্ষত্রের বর্ণালীতে ফ্রনহোফারের লাইন কেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, এই বিষয়ে চিঠিখানা উনি আগাগোড়া স্রেফ নির্বোধের মত লিখে গেছেন। ওঁর মতে বিষয়টার কোনো গুরুত্বই নেই। কিন্তু অধিকতর ধীমান ব্যক্তির কাছে জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রহের প্রতিটি নারী, পুরুষ, শিশুর হিতাহিত নির্ভর করছে তুচ্ছ এই ব্যাপারটার ওপর। খবরের কাগজ পড়ে যাঁরা জ্ঞানের ভাঁড়ার ভরেন, তাদের বুদ্ধিমত্তা এত কম যে বৈজ্ঞানিক ভাষায় আমার বক্তব্য বলতে গেলে তাঁদের মাথায় ঢুকবে না। তাই তাঁদের স্বল্পবুদ্ধির উপযোগী করেই অল্প কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

মাথা নাড়তে নাড়তে ম্যাকআর্ডল বললেন—"লোকটা সত্যিই একটা জ্যান্ত বিস্ময়। লণ্ডন শহর তেতে উঠেছে এই একখানা চিঠিতেই—পাবলিক ক্ষেপে গেছে। এই রকম একটা খাসা মগজের এই হাল দেখলেও কষ্ট হয়! যাক গে, তুমি পড়ে যাও।"

আমি পড়লাম—"ধরা যাক, এক বাণ্ডিল সোলার ছিপি অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্রোতের টানে ভেসে চলেছে গায়ে গায়ে লেগে থাকা ছিপিগুলো। চলেছে দিনের পর দিন। পরিবেশ একই রকম। চেতনা থাকলে ওরা কিন্তু মনে করত আশপাশের সব কিছুই চিরকাল একই ভাবে যাবে এবং নিরাপদেই দিন কাটবে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি ছিপিদের জ্ঞানবুদ্ধির চেয়ে বেশী বলেই জানি পরিস্থিতি কখনই একরকম থাকবে না এবং ছিপিদের আক্কেল গুড়ুম করে দেওয়ার মত অনেক ঘটনাই ঘটবে। জাহাজের গায়ে লাগতে পারে, ঘুমন্ত তিমির সঙ্গী হতে পারে অথবা সামুদ্রিক আগাছায় জড়িয়ে যেতে পারে। ল্যাব্রাডরের পাথুরে উপকূলেও ঠিকরে পড়তে পারে। কিন্তু দিনের পর দিন নিরুপদ্রব অভিযানে ভেসে থেকে এত বিপদের আঁচ করা কি সম্ভব? ছিপিদের ধারণায় কিন্তু মহাসমুদ্র অনন্ত এবং তা সর্বত্রই এক রকম।

"পাঠকরা নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝে নিয়েছেন এই রূপকের মধ্যে ছিপিগুলো হল সৌরজগৎ—যার মধ্যেকার একটি গ্রহে আমরা রয়েছি এবং আটলান্টিক হল বিপুল ইথার সমুদ্র—যার মধ্যে দিয়ে এতগুলো গ্রহকে নিয়ে সূর্য ভেসে চলেছে। তৃতীয় শ্রেণীর এই সূর্য বেশ কিছু আবর্জনা আর অকিঞ্চিৎকর উপগ্রহ নিয়ে দিনের পর দিন একই রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে অজ্ঞাত এক পরিণতির দিকে --কে জানে মহাশূন্যের কোথায় কোন মহা বিপর্যয় ওৎ পেতে রয়েছে — কবে গিয়ে পড়ব ইথারের খপ্পরে অথবা অচিন্তানীয় ক্যাব্রেডরের মৃত্যু উপত্যকায়। জেমস উইলসন ম্যাকফেল তলিয়ে কিছু না ভেবে এবং অনেক কিছু না জেনেই চিঠিখানা লিখে ফেলেছেন। অত আশাবাদী হওয়া ভাল নয়। যে মহাজাগতিক পরিবেশের ওপর আমাদের ভাগ্য ঝুলছে, তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার এবং তিলমাত্র হেরফের ঘটলেই টনক নড়ানো প্রয়োজন।"

"যাই বল, লোকটা মিনিস্টার হলে ফাটিয়ে দিত," বললেন ম্যাকআর্ডল। "তারপর কি হল ? হঠাৎ তাঁর ঘিলুটা নড়ল কেন ?"

"আমার মতে, বর্ণালীর ওপর ফ্রনহোফার লাইন্স*-য়ের আবছা হয়ে যাওয়া অথবা সরে সরে যাওয়ার মানে একটাই—একটা অতি সূক্ষ্ম কিন্তু অত্যদ্ভুদ এবং ব্যাপক মহাজাগতিক পরিবর্তন আসন্ন। গ্রহের নিজস্ব আলো নেই—সূর্যের আলোই গ্রহতে পড়ে ঠিকরে আসে। কিন্তু নক্ষত্রের আলো তার নিজস্ব—ধার করা নয়। অথচ এই ক্ষেত্রে গ্রহের বর্ণালি আর নক্ষত্রের বর্ণালিতে একই পরিবর্তন

* জোসেফ ভন ফ্রনহোফার জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী। সৌরগোলকের বহিরাবরণের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের অস্তিত্ব নির্দেশক 'ফ্রনহোফার লাইন্স' আবিষ্কারে প্রসিদ্ধি। সূর্যরশ্মির ধারা-বর্ণালিতে (ব্যাণ্ড স্পেকট্রাম) যেসব সঞ্চরমান কৃষ্ণরেখা দৃষ্ট হয়, সেইগুলিই 'ফ্রনহোফার লাইন্স' নামে পরিচিত হয়েছে। এর সাহায্যে তৎকালে অজ্ঞাত হিলিয়াম গ্যাস ফ্রনহোফার কর্তৃক প্রথমে সূর্যে আবিষ্কৃত হয় এবং পরে পৃথিবীতে পাওয়া যায়।

দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি পরিবর্তনটা ঐ সব গ্রহ আর নক্ষত্রের মধ্যেই ঘটছে? এ ধরনের কল্পনা অন্তত: আমার দ্বারা সম্ভব নয়। একই সাথে একই রকমের পরিবর্তন সবায় ক্ষেত্রে ঘটা কি সম্ভব? তবে কি পরিবর্তনটা আমাদেরই আবহমণ্ডলে? সম্ভব হলেও হতে পারত, কিন্তু তা হয় নি। আশেপাশে পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখছি না। রাসায়নিক বিশ্লেষণও ধরা যায় নি, তৃতীয় সম্ভাবনাটা তাহলে কি? ইথারের মধ্যে নয়ত? হয়ত তাই। এই ইথারই সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে আছে—এক নক্ষত্র থেকে আরেক নক্ষত্রের মধ্যে বিরাজ করছে। নিরতিসীম সূক্ষ্ম এই ইথারেই হয়ত পারবর্তটা দেখা দিয়েছে। ইথারের এই মহাসমুদ্রে ভেসে চলেছি অতি ধীর একটা স্রোতের টানে। ভাসতে ভাসতে আমরা ইথার-বলয়ের এমন অঞ্চলে গিয়ে পড়তে পারি যেখানকার ইথার ভাতধর্মে ভিন্ন প্রকৃতির, অভিনব এবং আমাদের কল্পনারও অতীত। স্রোতটাই কি সেইদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না? কোথাও না কোথাও একটা পারবর্তন এসেছে—বর্ণালিতে পরিস্ফুট মহাজাগতিক অস্থিরতাই তার প্রমাণ। পরিবর্তনটা শুভ হতে পারে। অশুভও হতে পারে। দুয়ের মাঝামাঝি হতে পারে। জানি না ঠিক কি ঘটছে। পর্যবেক্ষণ শক্তি যাদের নীচু স্তরের, তারা বিষয়টা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারে, কিন্তু আমার মত খাঁটি দার্শনিকের গভীর বুদ্ধিবৃত্তির কাছে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি, ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ডকারখানা হিসেব করে বার করা যায় না। তাই অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু ঘটে যাওয়ার জন্যে নিজেকে তৈরী রাখাই হল সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। আজকের কাগজেই খবর বেরিয়েছে, সুমাত্রার আদিবাসীদের মধ্যে রহস্যজনক একটা রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। মহাজাগতিক এই পরিবর্তনের সঙ্গে সুমাত্রার রোগের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা কে বলবে? তারা সরল সাদা মানুষ—পরিবর্তনের খপ্পরে পড়েছে আগে। ইউরোপের মানুষ জটিল প্যাঁচালো—রোগে কাবু হচ্ছে

তাই সময় লাগবে বেশী। স্রেফ অনুমানের কথা যদিও, এই মুহূর্তে তা নাকচ করতেও পারেন, ভাবনা শুরুও করতে পারেন—তবে খেয়াল রাখবেন সম্ভাবনাটা বিজ্ঞানসম্মত। ধারণাটা মাথায় আনতে যারা অপারগ হবেন, বুঝতে হবে তাঁদের নিরেট মস্তিষ্ক কল্পনা করতেও অক্ষম।

আপনার বিশ্বস্ত

দি ব্রায়ার্স, রোদারফিল্ড জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার"

"চমৎকার চিঠি। রীতিমত চনমনে চিঠি", চিন্তান্বিত মুখে কাঁচের নলে সিগারেট লাগাতে লাগাতে বললেন ম্যাকআর্ডল, এটাই ওঁর সিগারেট হোল্ডার। "মিঃ ম্যালোন, তুমি কি বল ?"

বিষয়টা যে একেবারেই আমার জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে, তা স্বীকার করতেই হল। উদাহরণ স্বরূপ, ফ্রনহোফার লাইন্স্ আবার কি জিনিস রে বাবা ? আপিসের পোষা বৈজ্ঞানিককে ধরে বেঁধে এনে ব্যাপারটা সম্পর্কে সদ্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ম্যাকআর্ডল। তাই দুটো বহুরঙা বর্ণালি ব্যাণ্ড তুলে ধরলেন টেবিল থেকে। দেখতে অনেকটা ক্রিকেট ক্লাবের টুপির মত। ফিতের এক প্রান্তের উজ্জ্বল লাল রঙটা আস্তে আস্তে পালটে কমলা, হলদে, সবুজ, নীল, ইণ্ডিগো এবং বেগুনী হয়ে শেষ হয়েছে কিন্তু কতকগুলো কালো রেখা আড়াআড়ি ভাবে গিয়েছে লাল থেকে শুরু করে সব কটা রঙের ওপর দিয়ে বেগুনী পর্যন্ত।

বললেন—"কালো ব্যাণ্ডগুলোর নাম ফ্রনহোফার লাইন্স। রঙগুলো ঠিক আলোর মতই। প্রিজমের মধ্যে, মানে তিনপলা কাঁচের মধ্যে, যে কোন আলো গেলে ভেঙে গিয়ে ঝকঝকে এই সব রঙ হয়ে দেখা যাবে। রঙগুলোর কোন মানে না থাক, এই কালো লাইনগুলোর একটা মানে আছে। যা থেকে আসছে আলো, তার রকমফের ঘটলেই কালো লাইনগুলো পালটে যায়। গত হপ্তায় এই লাইনগুলো স্পষ্ট থাকে নি—কিরকম যেন ঝাপসা হয়ে যাওয়ায়

জ্যোতির্বিদদের মাথা গুলিয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেই এক-একটা কারণ দর্শাচ্ছেন। এই ছাখো কালো লাইনের একটা ফটো—কাল বেরোবে আমাদের কাগজে। সাধারণ মানুষ এখনও এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কিন্তু আমার তো মনে হয় টাইমস্-য়ে চ্যালেঞ্জারের এই চিঠিখানা এতক্ষণে টনক নড়িয়ে ছেড়েছে দেশশুদ্ধ লোকের।”

“সুমাত্রার ব্যাপারটা কি?”

“এটা যেন কাশীধামে কাক মরেছে, কামরূপেতে হাহাকার, গোছের একটা ব্যাপার। বর্ণালির কালো লাইনের সঙ্গে সুমাত্রার এক কালা-আদমির রোগের সম্পর্ক ভাবা হাস্যকর বইকি। তবে কি জানো, লোকটা কখনো ফাঁকা আওয়াজ দেয় না—না জেনে কথা বলে না—এর আগে সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। সুমাত্রার অসুখটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই। গোদের ওপর বিষ-ফোড়ার মত আর একটা খবর এসেছে এইমাত্র। সিঙ্গাপুরের কেবল্। সুদান প্রণালীর লাইট হাউসগুলো বিকল হয়ে গেছে। ফলে, দুটো জাহাজ আছড়ে পড়েছে সমুদ্রতীরে। ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে দেখছি চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে কথা বললে কাজ হবে। সঠিক কিছু যদি পেট থেকে বার করতে পারো, সামনের সোমবার কাগজে এক কলম এই নিয়ে লিখবে।”

নতুন কাজের ঝক্কিটা মাথার মধ্যে নিয়ে বার্তা-সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলাম নীচের ওয়েটিংরুম থেকে আমার নাম ধরে কে ডাকছে। গিয়ে দেখি টেলিগ্রাম। আমার নামে। বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে অফিসের ঠিকানায়। যাঁকে নিয়ে এইমাত্র এত কথা হয়ে গেল, টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন তিনিই।

“ম্যালোন, ১৭, হিল স্ট্রীট, স্ট্রেটহাম।—অক্সিজেন আনবে।—চ্যালেঞ্জার।”

অক্সিজেন আনবো মানে! প্রফেসরকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি।

রসিকতা করার ক্ষমতা তাঁর অদ্ভুত। কে জানে এটাও সেই ধরনের একটা রসিকতা কিনা। তখন কিন্তু তিনি অন্য মানুষ। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বেন। অট্টহাসির ঠেলায় চোখ দুটো দেখাই যাবে না। বিকট হাঁ করে দাড়ি নাড়তে নাড়তে নিজের হাসিতেই এমন মশগুল হ'য়ে থাকবেন যে আশপাশের মানুষগুলোর উৎকট গাম্ভীর্যকেও পাত্তা দেবেন না।

হুকুমটা আর একবার মনে মনে তোলাপাড়া করলাম। কিন্তু মাথা-মুণ্ডু কিস্সু বুঝতে পারলাম না। ছোট হুকুম—অদ্ভূত, কিন্তু চাঁচাছোলা। এ হুকুম অমান্য করার বুকের পাটাও আমার নেই। হয়ত নতুন ধরনের কোনো কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে মেতেছেন। কেন চেয়েছেন তাই বা আমার ভাববার দরকার কি? অক্সিজেন চেয়েছেন, অক্সিজেন নিয়ে যাবো। ট্রেন ছাড়তে এখনো একঘণ্টা। টেলিফোন বুক থেকে অক্সিজেন টিউব সাপ্লাই কোম্পানীর অফিসটা কোথায় টুকে নিলাম। তারপর একটা ট্যাক্সি পাকড়ে চলে এলাম অক্সফোর্ড স্ট্রীটে।

ফুটপাতে নামতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখলাম দুজন ছোকরা ধরাধরি করে একটা লোহার সিলিণ্ডার নিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে এবং কষ্টেসৃষ্টে তুলে দিল অপেক্ষমান একটা গাড়ীতে। পেছন পেছন পেছন খ্যাঁক খ্যাঁক করে ধমকাতে ধমকাতে এল ছাগলে-দাড়িওলা শুকনো খ্যাটখেটে চেহারার এক প্রৌঢ়। লোকটার কথা বলার ধরনটাই কেমন বাঁকা ধরনের। দেখেই চিনলাম। না চিনে উপায় আছে। মার্কামারা ঐ দাড়ি আর চেহারা কি ভোলবার। 'অজ্ঞাত জগৎ' অভিযানে আমাদের অন্যতম সঙ্গী—প্রফেসর সামারলি।

আমাকে দেখেই তেড়ে উঠলেন সামারলি—"একি হে! তোমাকেও বলেছেন নাকি অক্সিজেন আনতে? যাচ্ছেতাই টেলিগ্রাম তুমিও পেয়েছো মনে হচ্ছে?"

টেলিগ্রামখানা দেখিয়েই দিলাম।

উনি বললেন—"আমিও একখানা পেয়েছি। ইচ্ছে না থাকলেও নিয়ে যাচ্ছি। চ্যালেঞ্জারকে নিয়ে আর পারা গেল না। ওঁর বোঝা উচিত ওঁর চাইতে অনেক বেশী ব্যস্ত মানুষদের অক্সিজেন আনতে হুকুম করার মত জরুরী অবস্থা নিশ্চয় দেখা দেয় নি। অর্ডারটা নিজে দিলে হত না?"

কি আর বলব? মিনমিন করে বললাম—"হয়ত এখুনি চান বলেই ঝামেলাটা চাপিয়েছেন আমাদের কাঁধে।"

"সত্যিই কি দরকার? না, মনে মনে ভেবেছিলেন দরকার হলেও হতে পারে। মরুক গে, তোমার আর নেওয়ার দরকার নেই। আমি তো একটা নিয়েছি—ঐ যে থলি।"

"তা ঠিক। তবে কি জানেন, উনি চান আমিও একটা নিয়ে যাই। ওঁর কথামত কাজ করা কিন্তু অনেক নিরাপদ।"

গজগজ করতে লাগলেন সামারলী। আমি বাক্যব্যয় করলাম না। আরেকটা সিলিণ্ডার তুললাম ওঁরই গাড়ীতে—উনিই বললেন এক গাড়ীতেই যাওয়া যাক ভিক্টোরিয়া স্টেশনে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের পাওনা মিটিয়ে দিতে গিয়ে একগাদা ট্যারা-বাঁকা কথা শুনতে হল। ভাড়া তার মনের মত হয়নি। ফিরে এসে দেখি প্রফেসর হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছেন। যে দুটো ছোকরা সিলিণ্ডার তুলতে এসেছিল, তাদের ওপর এমন তেরিয়া মেজাজ দেখাচ্ছেন যে একটা ছোকরা তো ফস করে বলেই বসল—"এটা কোথাকার বোকা বুড়ো রং ওঠা কাকাতুয়া রে।" মনিবকে গাল দেওয়ায় তাঁর ড্রাইভার আস্তিন গুটিয়ে নেমে এল মারপিট করতে। আর একটু হলেই দাঙ্গা লেগে যেত রাস্তার ওপর। থামালাম অতিকষ্টে।

ঘটনাগুলো তুচ্ছ। কিন্তু তবুও খুঁটিয়ে লিখছি। কেননা পুরো কাহিনীটা লিখতে বসে দেখছি অত্যাশ্চর্য এই উপাখ্যানের সঙ্গে এই সবকিছুরই একটা সম্পর্ক ছিল।

ড্রাইভার লোকটাও মনে হল হয় আনাড়ি, না হয় গোলমালের চোটে মাথার ঠিক নেই। কি যাচ্ছেতাই ভাবে যে নিয়ে গেল স্টেশনে তা বলবার নয়। উল্টোদিক থেকেও ঠিক এইভাবেই এলোপাতাড়ি ড্রাইভ করে আসছিল অনেক গাড়ী। দু'দুবার এই রকম দুটো গাড়ীর সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খেতে খেতে পাশ কাটিয়ে গেলাম কোনমতে। সামারলিকে তখনি বলেছিলাম, লণ্ডন শহরে আজকাল গাড়ী ড্রাইভ করা হচ্ছে অতি যাচ্ছেতাইভাবে। একবার একদল লোককে আর একটু হলেই চাপা দিয়ে ফেলতাম। মল য়ে দাঁড়িয়ে মারপিট দেখছিল কাতারে কাতারে লোক। একদম গা ঘেঁসে হুউ-উস করে বেরিয়ে গেল আমাদের গাড়ী। মারমুখী একটা লোক লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল পাদানীতে। হৈ হৈ করে তেড়ে এল বাকী সবাই। আমি স্রেফ ঠেলে ফেলে দিলাম লোকটাকে—নইলে কারোরই মাথা সেদিন আস্ত থাকত না। এই রকম ধরনের ঘটনা একটার পর একটা ঘটে যাওয়ার ফলেই আমারও মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। আড়চোখে দেখলাম, সামারলির সঙ্গও ঘুরিয়ে এসেছে—ভীষণ খিটখিটে হয়ে গিয়েছেন।

দীর্ঘদেহী কৃশকায় লর্ড জন রক্সটনকে দেখে একটু ধাতস্থ হলাম। প্ল্যাটফর্মে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হলদে টুইড শুটিং স্যুটে বেশ মানিয়েছে। দুই চক্ষু তীক্ষ্ণ, কিন্তু কৌতুকরসে টলমল, নাক যেন শানানো। ও চোখ একবার দেখলে ভোলা যায় না। যেমন ভয়ংকর, তেমনি মজার। দেখেই ভাল লাগল—মেজাজটাও জুড়িয়ে গেল। লালচে চুলে রূপোলি রেখা চিকচিক করছে বটে, কপালেও বয়েসে রেখা প্রকট হয়েছে। এর বেশী একটুও পালটাননি 'অজ্ঞাত জগৎ' অভিযানের মহা ডানপিটে লর্ড জন রক্সটন।

"কি খবর প্রফেসর। ছোকরা, আছো কি রকম।" আমাদের দেখেই পা বাড়িয়ে বাজখাঁই চীৎকার ছাড়লেন লর্ড।

তারপরেই হেসে উঠলেন প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে—কুলিরা ট্রলি করে অক্সিজেন সিলিণ্ডার আনছে দেখতে পেয়েছেন।

"আপনারাও এনেছেন? আমারটা ভ্যানে তুলে দিয়েছি। কি ব্যাপার বলুন তো? ওল্ডফ্রেণ্ডের মতলবটা কি?"

"টাইমস্ কাগজে ওঁর চিঠিখানা পড়েছেন?" বললাম আমি।

"কিসের চিঠি?"

"রাবিশ!" রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলেন সামারলি। "ননসেন্স!"

"আমার বিশ্বাস, এত অক্সিজেন নিয়ে যাওয়ার মূলে ঐ চিঠিখানা।" বললাম আমি।

"রাবিশ, ননসেন্স!" আবার তেড়ে উঠলেন সামারলি—অথচ অতটা খাপ্পা হওয়ায় দরকার ছিল না মোটেই।

কথা বলতে বলতে ফার্স্ট ক্লাস স্মোকার কম্পার্টমেণ্টে উঠে বসে-ছিলাম। সামারলি ওঁর পেটেণ্ট পাইপ ধরিয়ে নিয়েছেন। ব্রায়ার পাইপ। পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। খাড়া উদ্ধত নাকের তলা দিয়ে ভুস ভুস করে ধোঁয়া উঠছে তো উঠছেই।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার বললেন বিষম তীব্র গলায়—"চ্যালেঞ্জার বন্ধুলোক হলে কি হবে, মহা ধড়িবাজ। উনি যে ভীষণ ধূর্ত তা জানে সবাই, কিন্তু মানতে চায় না অনেকেই—তারাই হল পাঁঠা। টুপিটা দেখেছেন চ্যালেঞ্জারের? যাট আউন্স ব্রেন রয়েছে তলায়। বিরাট ইঞ্জিন—চলেছে নিঃশব্দে, সুসম ছন্দে। আরে বাবা, ইঞ্জিন হাউসের সাইজ দেখলেই বলে দিতে পারি ইঞ্জিনের কেরামতি কতখানি। তবে কি জানেন, লোকটা একটা আস্ত ভণ্ড, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভণ্ড - ওঁর মুখের ওপরেই তা বলেছি—শোনেন নি পাবলিকের সামনে নিজেকে জাহির করবার কতরকম ফিকিরই না জানেন। কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ মনে হল পাবলিক তাঁকে নিয়ে একটু কথা বলুক। এই হল সেই সুযোগ। বুঝলেন? ইথার না কচুপোড়া! মানুষের সর্বনাশ হচ্ছে চলেছে নাকি ইথারের জন্যে। ননসেন্স!"

বিশ্বাস করা যায়? জীবনে এ রকম আষাঢ়ে গল্প কখনো শুনেছেন?

বলে, ঠিক যেন একটা বুড়ো সাদা দাঁড়কাক মাথা নাড়তে নাড়তে হেসে উঠল খ্যা-খ্যা করে।

রাগে পিত্তি জ্বলে গেল আমার। চ্যালেঞ্জার আমাদের লীডার। তাঁর জন্যেই আজ আমাদের এত নাম, যশ, খ্যাতি। তাঁর সম্বন্ধে কিনা এই রকম কটূক্তি? ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেওয়ার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছি, তার আগেই শুরু করে দিলেন লর্ড জন।

বললেন শক্ত গলায়—"প্রফেসর সামারলি, এর আগেও একবার চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে টক্কর লেগেছিল আপনার এবং আপনাকে চিৎপটাং করতে ওঁর দশ সেকেণ্ডও লাগেনি। আরে মশাই, মানুষ হিসাবে উনি আপনার নাগালের বাইরে। কেন ঘাঁটাতে যাচ্ছেন? নিজের চরকায় তেল দিন।"

"তা ছাড়া", বললাম আমি—"ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই। ওঁর স্বভাবটাও ছুঁচের মত সোজা, স্ক্রুর মত প্যাঁচালো নয়। আড়ালে কখনও বন্ধুদের পিণ্ডি চটকান না।"

"বলেছো ভালো ছোকরা," বলে প্রিয়বন্ধুর মতই সামারলির পিঠে একখানা চাপড় লাগিয়ে বললেন লর্ড জন—"প্রফেসর, সারা রাস্তাটা কি ঝগড়া করতে করতে যাবো? ঢের হয়েছে, আর না। আপনি শুধু খেয়াল রাখবেন, চ্যালেঞ্জারকে খোঁচা মারতে গেলে বিপদ আছে। আমরা দুজনেই তাঁর পরম ভক্ত।"

সামারলি কিন্তু মিটমাট করার মুডে নেই। সরু মুখখানা পাকিয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে। ঘন রাগী ধোঁয়া পাক দিয়ে উঠছে পাইপের ফুটো থেকে।

বললেন তিরিক্ষে তীক্ষ্ণ গলায়—"লর্ড জন রক্সটন, আপনার সম্বন্ধেও আমার বলবার আছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার মতামতের দাম আমার কাছে যতখানি, নতুন ধরনের শটগান সম্বন্ধে আমার

মতামতের দামও আপনার কাছে ততখানি। আমি নিজের বিচার বুদ্ধি নিয়ে চলি মশায়। অতীতে একবার ভুল করেছি বলেই যে বারবার ভুল করব, এমন কোন কথা নেই। বিনা সমালোচনায় সব কিছুই গিলতে হবে নাকি? চ্যালেঞ্জার যতবড় বৈজ্ঞানিকই হোন না কেন, আমার নিজের একখানা ব্রেন আছে এবং সে ব্রেন খানার ওপর আমার নিজের ধারণা খুবই উঁচু। যদিও মুখে কখনো বলি না। ফ্রনহোফার লাইনস নিয়ে গালগল্প আপনারা বিশ্বাস করতে চান করুন। আপনাদের চাইতে বয়স যার বেশী, জ্ঞানবুদ্ধিও বেশী, তাকে করতে বলবেন না। চোখ কান বুঁজে চ্যালেঞ্জারের চালিয়াতি গেলবার পাত্র আমি নই। ইথার যদি বিষিয়ে গিয়ে থাকত এবং মানুষ জাতটার পক্ষে তা ক্ষতিকারক হত, তাহলে তা মালুম হত অনেক আগেই—আমরা নিজেরাই টের পেতাম—তাই নয় কি?" এই পর্যন্ত বলে সামারলি ট্রেনের আওয়াজ ডুবিয়ে ভীষণ জোরে হেসে উঠলেন—যুক্তিটা দিয়েছেন ভাল—এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে বললেন—"বুঝেছেন? এতক্ষণে আর রেলের কামরায় বহাল তবিয়তে বসে থাকতে হত না—বিষের ক্রিয়া রক্তের মধ্যে শুরু হয়ে যেত—লক্ষণও ফুটে বেরোতো। সে রকম কিছু দেখছেন কি? জবাব দিন মশায়, এড়িয়ে গেলে চলবে না—জবাব দিন মহাজাগতিক বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি?"

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল আমার রাগ। সামারলির কথাবার্তা এমনই উদ্ধত আর হাড়পিত্তি জ্বলানো যে সহ্য করা যায় না।

শেষকালে বলেই ফেললাম—"সব ঘটনা যদি জানতেন, ফট করে মুখ খুলে বসতেন না।"

মুখ থেকে পাইপ নামালেন সামারলি। পাথর কঠিন চোখে চাইলেন আমার দিকে।

"খুব যে স্পর্ধা দেখছি! কি বলতে চাও।"

"অফিস থেকে যখন বেরোচ্ছি, নিজে এডিটরের মুখে শুনলাম সেই মুহূর্তে দুটো টেলিগ্রাম এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। সুমাত্রার আদিবাসীদের মধ্যে রহস্যজনক একটা রোগ ছড়িয়ে পড়েছে; আর সুন্দা প্রণালীর লাইট হাউসে আলো জ্বলে নি।"

শুনেই দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠলেন সামারলি—"মানুষের বোকামির একটা সীমা থাকা উচিত। আরে ছোকরা, এটা মাথায় এল না যে ইথার সর্বত্রই এক? চ্যালেঞ্জারের আষাঢ়ে তত্ত্ব যদি মেনেই নিয়ে থাকে, তাহলেও তো বোঝা উচিত বিষাক্ত ইথার পৃথিবীর ওদিকে থাকলে এদিকেও থাকবে? নাকি ইংলিশ ইথার আর সুমাত্রা ইথারে রকমফের আছে? তোমার বোধহয় বিশ্বাস কেন্টের ইথার সারির ইথারের চেয়ে উচুদরের? ট্রেন কিন্তু এখন সেখান দিয়েই যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ এত নিরেটও হয়! সুমাত্রার ইথার এত বিষিয়ে গেল যে সেখানকার লোকে খাবি খাচ্ছে—আর এখানকার ইথার এত খাঁটি রইল যে বহাল তবিয়তে ট্রেনে চড়ে আমরা চলেছি? রাবিশ! ছোকরা, এই মুহূর্তে কিন্তু আমার নিজের ভীষণ ভাল লাগছে। জীবনে মাথা এত ঠাণ্ডা থাকেনি—শরীরটাও এত জোরালো মনে হয় নি।"

বললাম-"তা হতে পারে। আমি বিজ্ঞান জানি বলে বড়াই করতে চাই না। তবে শুনেছি এক যুগের বিজ্ঞান পরের যুগে ভুল বলে বাতিল হয়ে যায়। বিজ্ঞান না জেনেও কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বলতে পারি, যেহেতু ইথার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব অল্প, তাই নানা দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইথারের কার্যকারিতাও কমবেশী সময় নিতে পারে। সুমাত্রায় যে লক্ষণ আগে দেখা দিয়েছে, এখানে হয়ত তা একটু পরে দেখা দেবে।"

" 'পারে' আর 'হয়ত' দিয়ে কিছু প্রমাণ করা যায় না," যেন মারতে এলেন সামারলি। "শূওর উড়লেও উড়তে পারে—কিন্তু ওড়ে না। তোমার সঙ্গে তর্ক করাও বৃথা—বৃথা এনার্জি নষ্ট। চ্যালেঞ্জারের

ভূমি ধারণায় তোমার ব্রেন এখন ভরাট—বেঞ্চির গদীগুলোর সঙ্গেও বরং কথা বলা চলে—তোমার সঙ্গে নয়।"

রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন লর্ড জন—"প্রফেসর সামারলি, আপনার কথাবার্তা আগের চাইতেও খারাপ হয়েছে।"

তেঁতো হেসে তক্ষুনি বলে উঠলেন সামারলি—"আপনারা লর্ডরা সত্যি কথা শুনতে অভ্যস্ত নন। লর্ড খেতাব নিয়েও আপনি যে একটা নেহাতই অজ্ঞ লোক, এ কথা কেউ বুঝিয়ে দিলে তাই বড্ড ধাক্কা লাগে, তাই না?"

"প্রফেসর সামারলি," লর্ড জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভীষণ শক্ত, আড়ষ্ট হয়ে গেল—"বয়স যদি আর একটু কম হত, এ কথা মুখের ওপর বলবার সাহস আপনার হত না।"

সামারলি সঙ্গে সঙ্গে থুৎনি বাড়িয়ে দিয়ে ছোট্ট ছাগুলে দাড়ি নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে উঠলেন কাকের মত কর্কশ গলায়—"আরে মশায় অ্যাদ্দিনে আপনারাও জানা উচিত ছিল যে প্রফেসর সামারলি জীবনে কখনো সত্যি কথা বলতে পেছপা হয় নি—কিস্সু-না-জানা দেমাকী ফুলবাবুর সামনেও মনের কথা বলতে ডরায়নি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিস্সু না-জানা দেমাকী ফুলবাবু—একশবার বলব—আপনার খেতাবের মত গালভরা অমন অনেক খেতাবই গোলামের দল বানায় আর গোমূর্খের দল মাথায় চাপায়।"

মুহূর্তের জন্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল লর্ড জনের চোখ। পরক্ষণেই প্রবল চেষ্টায় সামলে নিলেন নিজেকে—হেলান দিয়ে বসলেন সিটে দুহাত ভাঁজ করা অবস্থায় রইল বুকের ওপর—ঠোঁটের কোনে তিক্ত হাসি।

আমি থ হয়ে গেলাম। একি ভয়ানক কাণ্ড ঘটছে সকাল থেকে। চোখের সামনে ভেসে উঠল অতীতের বন্ধুত্বপূর্ণ সুখের দিনগুলো। অ্যাডভেঞ্চারে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম চারজনে, হার-জিৎ দুঃখ-সুখ আনন্দ-বিষাদ ভাগ করে নিয়েছি সমানভাবে।

তারপরেই কিনা এই অপমান আর গালাগাল! হঠাৎ কেঁদে উঠলাম ফুঁপিয়ে। কিছুতেই কান্না থামতে পারলাম না। ঢেকে রাখতেও পারলাম না। সরব ফোঁপানি দেখে সবিস্ময়ে ওঁরা দুজন চাইলেন আমার পানে। দুহাতে ঢাকলাম মুখ।

বললাম—"ও কিছু নয়! কষ্ট হচ্ছে, কেন এমন হল ভেবে!"

লর্ড জন বললেন—"শরীর তোমার ভাল নয় হে! গোড়া থেকেই লক্ষ্য করেছি।"

মাথা নাড়তে নাড়তে সামারলি বললেন—"এই তিন বছরেও স্বভাব চরিত্র তোমার একটুও পাল্টায়নি দেখছি। প্রথমবার দেখেই আমিও বুঝেছিলাম তোমার কথাবার্তা কি রকম যেন খাপছাড়া' লর্ড জন, সহানুভূতির অপচয় বন্ধ করুন। ছোকরা মদ খেয়েছে—এ কান্না মাতালের কান্না। ভাল কথা, একটু আগেই আপনাকে কিস্সু না জানা দেমাকী ফুলবাবু বলেছিলাম—কথাটা খুবই কড়া হয়ে গেছে। তবে ঐ সঙ্গে আর একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল—মজাব ব্যাপার। আপনি আমাকে বিজ্ঞান-সাধক বলেই জানেন। কিন্তু এককালে জন্তুজানোয়ারের ডাক নকল করতে পারতাম চংমকার। বহু নাসারীতে ডাক পড়ত। বাকী পথটা সেই সব ডাক ডেকে আপনাদের হাসানো যাক—সময় কাটবে ভাল। মোরগ ডাকটা আগে শুনবেন?"

"আজ্ঞে না," অপমান চট করে ভুলে যাওয়া লর্ড জনের ধাতে নেই—"মোরগ ডাকে আমি অন্তত: মজা পাব না।"

"তবে মুরগীর ডাক শুনুন—ডিম পাড়বার পর মুরগী কিভাবে ডাকে শুনেছেন কখনো? এটাই কিন্তু সবচেয়ে ভাল ডাক। ডাকি?"

"আজ্ঞে না—বারণ করছি ডাকবেন না।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে। লর্ড জন শুনবেন না—সামারলি শোনাবেনই। শুরুও হয়ে গেল চলন্ত ট্রেনের মধ্যে। সে এক

দৃশ্য। সারা রাস্তা কখনো জন্তুর মত কখনো পাখীর মত চেঁচিয়ে গেলেন প্রফেসর। কখনো ডাকলেন পোষমানা মুরগীর ডাক কোঁক-কোঁক, কখনো ল্যাজ মাড়িয়ে দেওয়া কুকুর ছানার কেঁউ কেঁউ। সামনে বসে আমি। চোখের জল তো শুকিয়ে গেলই, হাসতে হাসতে পেট ফাটবার দাখিল। বাস্তবিকই হাসিয়ে পেটে খিল ধরানোর মত কাণ্ড করে গেলেন প্রফেসর। চোখের কোণ দিয়ে একবার দেখলাম উৎকট গম্ভীর মুখে বসে খবরের কাগজের সাদা মার্জিনে লর্ড জন লিখছেন—"ডাহা পাগল।"

কিচির-মিচির কেউ-মেউ শব্দের মধ্যেই হঠাৎ লর্ড জন আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে এমন একটা বিদঘুটে গল্প শুরু করে দিলেন যার শুরু নেই শেষও নেই। গল্পটা এক মেয়ে আর একজন ভারতীয় রাজাকে নিয়ে। গল্প যখন ক্লাইমাক্সে পৌঁছেছে সামারলি তখন ক্যানারি পাখীর ডাক নকল করতে শুরু করলেন। ঠিক সেই সময়ে ট্রেন পৌঁছোলো জার্ভিস ব্রুক স্টেশনে—এখান থেকেই যেতে হবে রোদারফিল্ডে।

চালেঞ্জার নিজেই দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের পথ চেয়ে। দাঁড়িয়ে ছিলেন জমকালো চেহারায়। পৃথিবীর সেরা টার্কি মোরগ বা গিনি ফাউলও অমন মুরুব্বি চালে বুক ফুলিয়ে প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করতে পারত কিনা সন্দেহ। চোখে সেই দৃষ্টি—আশপাশের মানুষগুলোকে যেন কৃপা করছেন। হাসির মধ্যে যেন প্রসাদ ঝরে পড়ছে। পালটেছে কেবল শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো—আরও বেশী করে চোখে পড়ার মত হয়ে উঠেছে। যেমন, প্রকাণ্ড মাথা আর বিশাল কপাল আরও প্রকাণ্ড, আরও বিশাল হয়েছে। মাথার পেছনে কালো চুলের জট আরও জটিল হয়েছে। মস্ত কালো দাড়ি আরও মস্ত হয়ে বুকের ওপর উপচে পড়ছে। টলটলে পরিষ্কার ধূসর চোখের ঔদ্ধত্য আর বিদ্রুপাত্মক চোখের পাতার কর্তৃত্বব্যঞ্জনা যেন প্রবল হয়েছে আগের থেকেও।

কৌতুক-তরলিত চোখে প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করে চ্যালেঞ্জার এমন উৎসাহব্যঞ্জক হাসি হাসতে লাগলেন যেন বাচ্ছা ছেলেকে অভয় দিচ্ছে স্কুলের হেড মাস্টার। তারপর সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে মাল পত্র, অক্সিজেন সিলিণ্ডার আর আমাদের নিয়ে এগোলেন স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মস্ত গাড়ীটার দিকে। ড্রাইভার সেই অস্টিন। মুখ আগের মতই নির্বিকার। প্রথম যে বার চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে টক্কর লেগেছিল আমার, এই অস্টিনই খাস চাকরের ভূমিকা নিয়েছিল। অস্টিন কথা বলে খুব কম। নীরবে গাড়ী চালিয়ে পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে নিয়ে গেল ওপরে। আমি বসেছি ওর পাশেই—সামনের সিটে। পেছনের সিটে তিনজনেই কথা বলছেন একসঙ্গে। লর্ড জন তখনও সেই মোষের গল্প বলছেন বলে মনে হল, চ্যালেঞ্জারের গুরুগম্ভীর গলা ছাপিয়ে উঠছে সামারলির খ্যাঁকখেঁকে প্রতিবাদকে—দুই শক্তিশালী মগজে মোরগ-লড়াই চলছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কূটকচালি নিয়ে। হঠাৎ অস্টিনের মেহগনী মাথাটা হেলে পড়ল আমার দিকে—চোখ রইল কিন্তু স্টীয়ারিং হুইলের ওপর।

বলল অতি সংক্ষেপে—"প্রফেসর জবাব দিয়েছেন আমাকে। চাকরী আর নেই।"

"সর্বনাশ!" বললাম আমি।

আজকের সব ঘটনাই বড় অদ্ভুত। এমন সব কথা আচমকা শুনছি যা কল্পনাতেও আসে না। যেন স্বপ্ন দেখছি।

অস্টিন বললে—"এই নিয়ে সাতচল্লিশ বার হল।"

কি বলা উচিত ভেবে পেলাম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"যাচ্ছো কবে?"

"যাচ্ছি না।"

মনে হল, বুঝি আর কথা নেই। অস্টিন কিন্তু থামল না।

বললে—"আমি গেলে ওঁকে দেখবে কে?" মাথা ঝাঁকিয়ে মনিবকে উদ্দেশ করে—"সেবা করবে কে?"

"আর কেউ," বললাম আমতা আমতা করে।

"এক হপ্তার বেশী কেউ টিঁকবে না। আমি গেলে ও বাড়ীর মেনস্প্রিং ভেঙে যাবে—চলবে ভাঙা ঘড়ির মত। আপনাকে বলছি, কেননা আপনি জানেন—ওঁরই বন্ধু তো। ওঁর কথা মত চাকরী ছেড়ে দিলে কর্তা-গিন্নীর অবস্থা কি হবে ভাবতে পারেন? আমিই যে ওঁদের সব। তা সত্ত্বেও উনি যখন তখন নোটিশ দিচ্ছেন—চাকরী থেকে তাড়াচ্ছেন।"

"কেউ টিঁকবে না কেন?"

"আমি গায়ে মাখিনা—অন্যে তা পারবে না। ওঁর ভেতর পর্যন্ত আমি দেখেছি। ভীষণ চালাক। এত চালাক যে মাঝে মাঝে বেতাল হয়ে যান। আজ সকালে কি কাণ্ড করেছেন জানেন?"

"কি?"

কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে চাপা স্বরে বললে অস্টিন—"হাউস-কীপারকে কামড়ে দিয়েছেন।"

"কামড়ে দিয়েছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—পায়ে। নিজের চোখে দেখলাম মেয়েটা ম্যারাথন দৌড় দৌড়ে বেরিয়ে গেল হলঘর থেকে।"

"কি সর্বনাশ!"

"বুঝুন তাহলে। দিনরাত একটা না একটা কাণ্ড করে বসছেন। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব নেই। প্রতিবেশীরা কেউ কেউ কি বলে জানেন? ঐ যে একখানা বই লিখেছিলেন আপনি—তাতে একদল দৈত্যের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন প্রফেসর—তখনই নাকি ওঁকে সবচেয়ে বেশী মানিয়েছিল—ঐ দেশটাই ওঁই বাড়ী হওয়া উচিত—সব আপনজন কিনা! যে যাই বলে বলুক, দশ বছর সেবা করবার পর জেনেছি উনি মানুষ হিসাবে কত বড়—ওঁর মত মানুষের পায়ের

কাছে থাকা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। মাঝে মাঝে কিন্তু এমন নিষ্ঠুর হয়ে যান। নিজের চোখেই দেখুন না কেন, অতিথি আপ্যায়নের এই কি নমুনা?"

গাড়ী তখন চড়াই ভেঙে উঠছে মন্থর গতিতে। বাঁকের মুখে দেখলাম একটা নোটিশ লাগানো। পড়তে কষ্ট হল না। শব্দ সংখ্যা কম—কিন্তু চিত্তাকর্ষক:

সাবধান

দর্শনার্থী, সাংবাদিক আর ভিখারীদের

পাত্তা দেওয়া হবে না।

জি. ই. চ্যালেঞ্জার

প্ল্যাকার্ডটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে দুঃখের সঙ্গে বললেন অস্টিন—"এটা কি ঠিক? এর পরেও কিন্তু বলব—চাকরী আমি ছাড়ব না। উনি মনিব, আমি সেবাদাস। এ সম্পর্ক যেমন আছে তেমনিই থাকবে। রেগে আগুন হয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেও আমি যাব না। আজ আমার মনটা খুব ভাল আছে বলেই বলছি। শেষ পর্যন্ত না দেখে যাবই না।"

ফটকের সাদা খুঁটি পেরিয়ে বক্রাকার মোটর পথে তখন গাড়ী ঢুকছে। দুপাশে রডোডেনড্রনের ঝোপ। সামনে একটা ছোট-খাট ইঁটের বাড়ী—সাদা কাঠের কাজের জন্যে বেশ দেখিয়েছে এক নজরেই মন জুড়িয়ে যায়। চ্যালেঞ্জার গৃহিনী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়। ছোট খাট চেহারা, বেশ রুচি সম্পন্না।

গাড়ীর মধ্যে থেকে গোলার মত বেরিয়ে আসতে আসতে চ্যালেঞ্জার বলে উঠলেন—"এই যে মাই ডিয়ার, এসে গেছেন অতিথিরা। এ বাড়ীতে অতিথি আসাটা একটা নতুন কিছু ব্যাপার, তাই না? প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার দরকারটা কি? ওরা মনে করলে আমার রুটিতে সেঁকো বিষও মিশিয়ে দিতে পারে।"

"কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!" হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে বললেন চ্যালেঞ্জার গৃহিনী। "জর্জের সঙ্গে ঝগড়া প্রত্যেকের। তল্লাটের কেউ আমাদের বন্ধু নন।"

"ফলে, অতুলনীয়া স্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারি অনেক বেশী।" বলতে বলতে খাটো পুরু বাহু, দিয়ে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরলেন চ্যালেঞ্জার। ঠিক যেন একটা গরিলা আর একটা হরিণী। "চলে এস, আর দেরী নয়। অতিথিরা অনেক পথ এসেছেন, খেতে দিতে হবে এখুনি। সারা ফিরেছে?"

সখেদে মাথা নাড়লেন স্ত্রী। দাড়িতে হাত বুলোতে বুলাতে কড়িকাঠ কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন কর্তা।

তারপর বললেন—"অস্টিন, গাড়ী গ্যারেজে রেখে গিন্নীমার সঙ্গে একটু হাত লাগিও হে, চটপট খাওয়ার ব্যবস্থা করেই খবর দেবে।—জেন্টেলমেন, এবার আসুন পড়ার ঘরে। ভীষণ জরুরী কথা কতকগুলো আছে।"

২। মরণের জোয়ার

হলঘরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। কান খাড়া না করেও শুনতে হল প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সংলাপ। শুধু আমরা কেন, একশ গজের মধ্যে প্রত্যেকেই শুনেছে সেই দানবিক কণ্ঠস্বর। গমগমে গলার আওয়াজে কাঁপতে লাগল গোটাবাড়ীটা। সেদিন টেলিফোনে উনি যা-যা জবাব দিয়েছিলেন, আজো তা কানে লেগে রয়েছে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ছাড়া আবার কে···হ্যাঁ, আমিই বলছি··· আরে হ্যাঁ, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, কোন সন্দেহ নেই, বিখ্যাত প্রফেসর, ···নিশ্চয়, প্রত্যেকটা কথা, নইলে লিখতামই না···খুব একটা অবাক হব না···সেই রকম সব লক্ষণই দেখা যাচ্ছে···খুব জোর তু'একদিনের মধ্যেই···আওতায় পড়বে আপনার চাইতে দরকারী লোকজন। ঘ্যানঘ্যান করে লাভ নেই···না, আমি পারব না। যা পারেন নিজে করুন ··খুব হয়েছে মশায়। ননসেন্স। আপনার বাজে ঘ্যানঘ্যানি শোনার সময় আমার নেই— তার চাইতেও দরকারী কাজ রয়েছে।"

দড়াম করে টেলিফোন নামিয়ে রেখে উনি আমাদের সবাইকে নিয়ে উঠে গেলেন ওপরতলায় পড়ার ঘরে। ঘরটা বড়, আলো বাতাস প্রচুর। প্রকাণ্ড মেহগনী টেবিলে সাত আটটা টেলিগ্রাম, তখনো খোলা হয় নি।

খামগুলো জড়ো করতে করতে বললেন—"একটা টেলিগ্রাফিক ঠিকানা রাখলে ভাল হত—বেচারীদের অনেক খরচ কমে যেত। 'নোয়া রোদারফিল্ড' নামটা কিন্তু সবচেয়ে যুৎসই।"

বলতে বলতে টেবিলে হেলান দিয়ে এমন অট্টহাসি হাসতে লাগলেন যে হাত কাঁপতে থাকার ফলে খামগুলো ছিঁড়তে পর্যন্ত

পারলেন না। এটা কিন্তু ওঁর বরাবরের স্বভাব। দুর্বোধ্য রসিকতা করে নিজেই হো-হো করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েন।

হাসছেন আর খাবি-খাওয়া গলায় বলছেন—"নোয়া। নোয়া।" মুখখানা দেখতে হয়েছে অবিকল বীটের শেকড়ের মত। তাল মিলিয়ে একটু একটু হাসছি আমি আর লর্ড জন। সামারলির মোটেই পছন্দ হয়নি নামটা—তাই বিদ্রূপচ্ছলে মাথা নাড়ছেন অক্ষুধায় শীর্ণ ছাগলের মত। ঐভাবে গুমগুম হাসতে হাসতে আর দুমদাম ফাটতে ফাটতেই টেলিগ্রামগুলো শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেললেন চ্যালেঞ্জার। জানলায় দাঁড়িয়ে তিনজনে দুচোখ ভরে দেখতে লাগলাম প্রাকৃতিক দৃশ্য।

দেখবার মতই দৃশ্য। রাস্তা ঘুরে ঘুরে অনেকটা উঠে এসেছে—সাতাশ ফুট—জেনেছিলাম পরে। পাহাড়ের ধারেই চ্যালেঞ্জারের বাড়ী। পড়ার ঘরের জানলা বাড়ীর দক্ষিণ অংশে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর—সাউথ ডাউন্‌স্—ঢেউ খেলে উঠে নেমে মিলিয়ে গেছে দিগন্তে। পাহাড়ের একটা খাঁজে একতাল ধোঁয়া কুয়াশার মত চিহ্নিত করছে লুইজ। পায়ের ঠিক তলায় সবুজ মাঠ—গলফ খেলার মাঠ—পিল পিল করছে খেলোয়াড়রা। একটু দক্ষিণে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে লণ্ডন-ব্রাইটন রেলপথের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। একদম কাছে নাকের ঠিক নীচে চৌকোণ চত্বরে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জারের গাড়ী—এই গাড়ীতেই এসেছি স্টেশন থেকে।

বিস্ময়ধ্বনি শুনে ঘুরে দাঁড়ালাম। টেলিগ্রামগুলো পড়া হয়ে গেছে চ্যালেঞ্জারের। এক থাকে সাজিয়ে রেখেছেন টেবিলে। মুখখানা তখনও রাঙা—দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেটুকু দেখা যাচ্ছে। যেন একটা সাংঘাতিক উত্তেজনা গনগন করছে ভেতরে।

জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন যেন, এইভাবে শুরু করলেন চ্যালেঞ্জার—"জেন্টেলমেন, আজকের এই পুনর্মিলন খুবই চিত্তাকর্ষক—কেন না

তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটা অসাধারণ—বলা উচিত অভূতপূর্ব—পরিস্থিতির মধ্যে। লণ্ডন থেকে আসবার পথে কিছু লক্ষ্য করেছিলেন ?”

তিক্ত হেসে অমনি বললেন সামারলি—“একটা ব্যাপারই মনে খুব দাগ কেটে গিয়েছে। এই ছোকবার ব্যবহার। এত বছরেও শোধরাযনি।”

লর্ড জন বলে উঠলেন—“থামুন মশায়। ম্যালোন তো কারো পাকা ধানে মই দেয় নি ? সাংবাদিকতা ওর পেশা। আধঘণ্টা ধবে একটা ফুটবল খেলা যদিই বলে থাকে, তাতে আপনার কি ?”

আমি চটে গিয়ে বললাম—“ফুটবলের গল্প বলেছি আধঘণ্টা ধরে ! বলেন কি ! আপনিই আধঘণ্টা নিয়েছেন একটা মোষের গল্প বলতে। প্রফেসর সামারলি সাক্ষী।”

সামারলি বললেন—“তোমাদের তুজনের কেউই কম যাওনি। চ্যালেঞ্জার, ফুটবল বা মোষ কোনটাই আমার পছন্দ নয়।”

প্রতিবাদ করলাম—“কক্ষণো নয়। ফুটবল নিয়ে একটা কথাও আজ বলিনি।”

সবিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠলেন লর্ড জন—সামারলি মাথা নাড়তে লাগলেন পরম তুঃখে।

বললেন—“কি আশ্চর্য। কি আশ্চর্য। চুপচাপ বসে ভাবছিলাম—”

“চুপচাপ বসে ভাবছিলেন !” লাফিয়ে উঠলেন লর্ড জন—“সারা রাস্তা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত বাজছিলেন—জন্তু-জানোয়ারের ডাক নকল করে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিলেন।”

রুখে দাঁড়ালেন সামারলি।

বললেন ভিনিগার-টক মুখে—“আপনি তো খুব রঙ্গ জানেন মশাই।”

গলাবাজিতে লর্ড জন কম যান না। গাঁক গাঁক করে চেঁচাতে চেঁচাতে বললে—“কি মুস্কিল ! একি পাগলামিতে পেয়েছে সবাইকে !

প্রত্যেকেই জানে অপরে কি করেছে—কিন্তু কারো মনে নেই নিজে কি করেছে। গোড়া থেকে ভাবা যাক। একটা ফার্স্ট ক্লাশ স্মোকার কামরায় উঠলাম তিনজনে, ঠিক আছে? তারপরেই ঝগড়া লাগল টাইমস-এ প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের চিঠিখানা নিয়ে।"

"তাই নাকি! তাই নাকি!" গরগর করে উঠলেন চ্যালেঞ্জার, চোখের পাতা আস্তে আস্তে নামতে লাগল নীচে।

"সামারলি বলছিলেন চিঠিখানার মধ্যে নাকি সত্যি একদম নেই।"

"তাই নাকি! তাই নাকি!" দ্বিগুণ ফুলে উঠল চ্যালেঞ্জারের বুক, দ্রুত হাত চলতে লাগল দাড়ির ওপর। "সত্যিই নেই! এ রকম কথা এর আগেও শুনেছি মনে হচ্ছে। গ্রেট প্রফেসর সামারলি, জিজ্ঞেস করতে পারি কি, অধীনের বৈজ্ঞানিক মতবাদটাকে ধূলিসাৎ করতে গিয়েছিলেন কোন যুক্তি নিয়ে?"

কথাগুলো ছুঁড়ে দিলেন অত্যন্ত সবিনয়ে। বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে, দুহাত উল্টে মেলে ধরে, প্রফেসর সামারলি যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, তা ভাল করে সমঝে দিয়ে শেষ করলেন বিদ্রূপতীক্ষ্ণ বচনমালা। ওঁর কথা বলার ধরনই এই রকম।

সামারলিও কুত্তার মত গোঁ ধরে বললেন—"যুক্তিটা খুব সোজা। পৃথিবীর চারদিকেই ইথার। একদিকে বিষাক্ত ইথার থাকা মানে অপর দিকেও থাকা। তাই যদি থাকত, তাহলে ট্রেণে আসতেই তা টের পেতাম।"

শুনেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন চ্যালেঞ্জার। এমন আওয়াজ করে হাসতে লাগলেন, যে শেষ পর্যন্ত ঘরের প্রতিটা জিনিসপত্র যেন খটাখট শব্দে কাঁপতে আর দুলতে লাগল।

অতি কষ্টে অনেকক্ষণ পরে বোমাফাটা হাসি সামলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে চ্যালেঞ্জার বললেন—"সামারলি ঠিক আগের মতই রয়ে গেছেন। যা ঘটছে আশেপাশে, তার কোন খবরই রাখেন না।

আমি নিজে আজ যা করেছি, আগে তাই শুনুন। আপনারা ট্রেনের মধ্যে যে কাণ্ড করে এসেছেন, তার চাইতেও খারাপ। মাথার ঠিক ছিল না কারোরই—বাদ যাইনি আমি নিজেও। বেশ কয়েক বছর ধরে আমার ঘরসংসার দেখাশুনা করে একটি মেয়ে। নাম সারা। নামের বাকীটুকু মনে রাখবার চেষ্টা কখনো করিনি—স্মৃতির ওপর খামোকা বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই। মেয়েটা একেবারে রসকষহীন বিরক্তিকর উদাসীন। শান্ত, নির্লিপ্ত, আবেগহীন। খোঁচা মারলেও অনুভব করতে অক্ষম। সকালের দিকে আমার গিন্নী ঘরদোর গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত থাকে বলে ব্রেকফাস্ট খেতে দেয় এই সারা। আজ সকালে হঠাৎ কেন জানি ভীষণ ইচ্ছে হল একটা পরীক্ষা করার। ইচ্ছেটা অদম্য এবং পরীক্ষাটাও বীভৎস। ইচ্ছে হল, ঠাণ্ডা মেয়েটা কতখানি ঠাণ্ডা, তা দেখা যাক। খুব সাদাসিদে এক্সপেরিমেণ্ট। টেবিলের ওপর রাখা ফুল-বোঝাই একটা ফুলদানী উল্টে ফেলে দিলাম। তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলাম সারাকে। ছুটে এল সারা। তার আগেই অবশ্য টেবিলের তলায় টেবিলক্লথের আড়ালে গা ঢেকে লুকিয়ে বসে আছি আমি। সারা ঘরে ঢুকল, কিন্তু আমাকে দেখতে পেল না। আমি জানি উল্টে পড়া ফুলদানী ওর চোখে পড়বেই, এগিয়ে আসবে সিধে করে বসাতে। হলও তাই। টেবিলের তলা থেকে আমি শুধু দেখলাম সুতির মোজা আর রবার ইলাস্টিক লাগানো বুট। মুখটা বাড়িয়ে ঘ্যাঁক করে দাঁত বসিয়ে দিলাম পায়ের ডিমে। ফলটা হল সাংঘাতিক—এতখানি সাকসেসফুল হব ভাবতেও পারিনি। কয়েক মুহূর্ত থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সারা, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার মাথার দিকে। তারপরেই চিলের মত চেঁচিয়ে উঠে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল পা এবং ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পেছন পেছন আমিও ধাওয়া করলাম ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্যে, কিন্তু ধরতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে দূরবীনের মধ্যে দিয়ে দেখলাম

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খুব দ্রুত হাঁটছে। এবার বুঝে নিন কেন বললাম ঘটনাটা। ব্রেনের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখুন এর থেকে সিদ্ধান্ত কি দাঁড়ায়। বুঝলেন? মাথায় কিছু ঢুকলো? লর্ড জন, আপনিই বলুন আগে।"

গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে লর্ড জন বললেন—"এখনও সময় আছে নিজেকে সামলানোর, নইলে বিপদে পড়বেন।"

"সামারলি, আপনার মত?"

"তিনমাস ছুটি নিয়ে জার্মান সৈকতে গিয়ে থাকুন।"

"চমৎকার! চমৎকার!" চ্যালেঞ্জার যেন উল্লাসে ফেটে পড়লেন —"ম্যালোন, বয়েসে তুমি নেহাতই কাঁচা। কিন্তু পাকাদের বুদ্ধির দৌড় তো দেখাই গেল। তুমি কি পারবে?"

আমিই কিন্তু পারলাম। সবিনয়ে যা বলবার, তা বললাম। কিন্তু প্রতিটি কথাই হল চ্যালেঞ্জারের মনের মত। আপনারা যাঁরা এ কাহিনী পড়ছেন, তাঁরা সবই জানেন। বুঝতেও পেরেছেন আসল ব্যাপারটা। কিন্তু সেই মুহূর্তে সভ্য সভ্য ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ায় বুদ্ধি-টুদ্ধি আমাদের সবই গুলিয়ে গেছিল। তারই মাঝে আসল ব্যাপারটা ঝাঁ করে মাথায় এসে গেল আমার—তিলমাত্র সন্দেহ আর রইল না।

চীৎকার করে বললাম—"বিষ!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আজকের সকালের সৃষ্টিছাড়া ঘটনাগুলো। লর্ড জনের মোষের গল্প, আমার অকারণ কান্না, প্রফেসর সামারলির বিসদৃশ আচরণ, লণ্ডনের পার্কে দাঙ্গা, ড্রাইভারের এলোপাতাড়ি গাড়ী চালানো, অক্সিজেনের দোকানে ঝগড়াঝাঁটি। সব কটা ঘটনা সাঁৎ করে ভেসে গেল মনের পর্দা দিয়ে। চক্ষের নিমেষে বুঝলাম কেন এই উন্মত্ততা। কারণ একটাই।

বিষ!

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিষ।" চীৎকার করে বললাম—"বিষ। বিষ ঢুকেছে আমাদের প্রত্যেকের রক্তে!"

দুহাত ঘষতে ঘষতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বললেন চ্যালেঞ্জার—"বিলকুল ঠিক! বিষে আচ্ছন্ন আমরা প্রত্যেকেই। ইথারের বিষ-বলয়ে ঢুকে পড়েছে পৃথিবী। মিনিটে লক্ষ লক্ষ মাইল বেগে ঢুকছে আরো ভেতরে। সকাল থেকে উল্টো পাল্টা যা কিছু ঘটেছে, শুধু এই কারণেই। এক কথায় সুন্দরভাবে তা বুঝিয়েছে তরুণ বন্ধু ম্যালোন—'বিষ' থেকেই বিগড়েছে আমাদের মাথা!"

এ-ওর মুখের দিকে চাইলাম। কথা বলতে পারলাম না। অবাক বিস্ময়ে নীরব প্রত্যেকেই।

চ্যালেঞ্জার বললেন—"লক্ষণগুলো দেখে, বিচার করে, মুঠোয় আনার ক্ষমতা মনের মধ্যেই রয়েছে। তবে সবার মনের গড়ন তো সমান নয়। মনের শক্তিও এক নয়। কিন্তু আমাদের এই তরুণ বন্ধুটি বিষয়টা ধরতে পারবে বলে আশা করা যায়। আজ সকালে সারার পা কামড়ে দেওয়ার পর চুপচাপ একলা বসে ভাবতে লাগলাম, কেন এমন হল। কক্ষনো তো বাড়ীর কারোর পা কামড়ানোর ইচ্ছে আমার হয়নি। কামড়ানোর আবেগটা তাহলে অস্বাভাবিক। মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্য। নাড়ি টিপে দেখি হৃদঘাত স্বাভাবিকের চাইতে দশ বেড়েছে। রিফ্লেক্সও বেড়েছে। শরণ নিলাম আত্ম-শক্তির—প্রকৃত আমি'র—আনবিক গণ্ডগোলের বাইরে গিয়ে সংবরণ করলাম নিজেকে। দেখলাম, আমি ঠিকই আছি। আমার প্রভু আমিই—আর কেউ নয়। বেসামাল মনকে চিনে নিয়ে তাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতাও আমি হারাই নি। যে বিশেষ বস্তুর সংস্পর্শে এসে মনের এই উত্তেজনা, সেই বস্তুর জারিজুরি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল মনেরই কাছে। কতবড় সাফল্য বলুন তো। অথবা বলা যেতে পারে, মন ভুল করছিল, ব্যক্তিত্ব তাকে শায়েস্তা করেছে। সেই কারণেই, আমার স্ত্রী যখন নিচে নামল, দারুণ ইচ্ছে হল দরজার

আড়ালে লুকিয়ে ডাকাতে-হুঙ্কার ছেড়ে চমকে দিই। কিন্তু ভীষণ সেই আবেগকে দাবিয়ে রেখে অভ্যর্থনা জানালাম ভারিক্কি চালে— সংযতভাবে। হাঁসের মত প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে ওঠার একটা প্রবল ইচ্ছায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল মন—কিন্তু ঝেড়ে ফেলে দিলাম একইভাবে। তারপরে একতলায় নামলাম। অস্টিন হেঁট হয়ে গাড়ী সারাচ্ছিল। আপনা থেকেই হাতটা ওর মাথার ওপর উঠে গিয়েছিল এমন একখানা মার মারতে যার ফলে সারার মত ও বেচারীকেও হয়ত হারাতে হত আমায়। কিন্তু সে বাসনাকেও দমন করলাম মনের প্রভুত্ব দিয়ে। থাপ্পড় না মেরে আলতো ভাবে কাঁধে হাত রেখে বললাম গাড়ী বার করতে—স্টেশনে যাবো। এই মুহূর্তে আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে প্রফেসর সামারলির বিদিগিচ্ছিরি পাকা ঐ ছাগুলে দাড়ি ধ'রে মুণ্ডুটা সামনে পেছনে জোরে জোরে ঝাঁকাই। কিন্তু দেখুন সামলে রেখেছি নিজেকে। আমাকে দেখে শিখুন।"

"মোষটার খোঁজে রইলাম," বললেন লর্ড জন।

"আমি রইলাম ফুটবল ম্যাচের পেছনে।"

সংশোধিত সংযতস্বরে সামারলি বললেন—"চ্যালেঞ্জার, ঠিকই বলেছেন মনে হচ্ছে। আমার মনের মধ্যে সমালোচনার ঝোঁকটা বেশী, সৃষ্টির তাগিদ কম। বিশেষ করে অদ্ভুত অস্বাভাবিক অবিশ্বাস্য তত্ত্ব শুনলেই মনটা মুখিয়ে ওঠে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেওয়ার জন্যে। আপনার এই থিওরীও কিন্তু ফ্যানটাসটিক। সকাল থেকে যা কিছু ঘটেছে, এখন তার একটা মানে পাওয়া যাচ্ছে। ট্রেনে এই দুই বন্ধুর হাস্যকর আচরণের কারণ তাহলে একটাই—বিষ ঢুকেছে শরীরে।"

চ্যালেঞ্জার সামারলির কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন—"এই তো বুদ্ধি খুলেছে!"

সবিনয়ে বললেন সামারলি—"বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন?"

"নিশ্চয় ভেবেছি। এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি", বলে টেবিলে পা

ঝুলিয়ে বসলেন চ্যালেঞ্জার। বেঁটে পা দোলাতে দোলাতে বললেন—"একটা সাংঘাতিক ভয়ংকর ব্যাপাবে আমরা প্রত্যেকেই সহযোগী। পৃথিবীর শেষ হতে চলেছে।"

পৃথিবী শেষ হতে চলেছে! আপনা থেকেই সবার চোখ ঘুরে গেল ধনুকাকৃতি বিরাট জানলার দিকে—দৃষ্টি প্রসারিত হল গ্রীষ্মের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর ওপর দিয়ে দিগন্ত পর্যন্ত। ঢেউ খেলানো মাঠ, চাষী-বাড়ী, খামার ভবন। পৃথিবী শেষ হতে চলেছে। কথাটা এর আগেও শোনা গেছে, কিন্তু মানেটা এভাবে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায় নি। পৃথিবী শেষ হতে চলেছে! স্তম্ভিত মুখে বোবা বিস্ময়ে তিনজনেই চেয়ে রইলাম চ্যালেঞ্জারের পানে—তাঁর কথা শোনার প্রতীক্ষায়। সেই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জারকে আর অদ্ভুত, অস্বাভাবিক মনে হল না। বরং মনে হলে ওঁর ঐ কর্তৃব্যঞ্জক জমকালো ব্যক্তিত্ব সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। উনি ে অতিমানব। ঠিক তখনি আচম্বিতে মনে পড়ে গেল, এ ঘবে আসবা৯ পর চ্যালেঞ্জাব হু'হুবার পিলে চমকানো অট্টহাসি হেসেছেন। এই দুর্দিনেও যিনি এমন নির্লিপ্ত থাকতে পারেন, তিনি নিশ্চয় জানেন সংকটটা আর যাই হোক, অন্তিম নয়।

চ্যালেঞ্জার পা দোলাতে দোলাতে বললেন—"বাগানের মালি জীবাণু বোঝাই আঙুরের খোসাকে জীবাণু মুক্ত করার জন্যে জীবাণু-বারক বিষের মধ্যে ডুবিয়ে তুলে নেয়—আঙুরের ওপরে কিলবিলে জীবাণু অক্কা পায়। জগৎ সংসারের মালি—পৃথিবীকে জীবাণু মুক্ত করতে চলেছেন। মানুষ সেই জীবাণু—পৃথিবীর বাইরের খোসায় কিলবিল করে ঘুরছে। গোটা সৌরজগৎটাকে তাই তিনি বিষের মধ্যে চুবিয়ে তুলে নেবেন—শেষ হব আমরা।" সব চুপ। কারো মুখে টুঁ শব্দ নেই। তীক্ষ্ণ শব্দে যেন ককিয়ে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা।

কূট হাসি হেসে চ্যালেঞ্জার বললেন—"আরেকটা জীবাণু সাহায্য

চাইছে। এতক্ষণে বুঝেছে, ব্রহ্মাণ্ড আর চায় না পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব থাকুক।”

বলে, ঘরের বাইরে গেলেন মিনিট দুয়েকের জন্যে। ওঁর অবর্তমানে কারো মুখে একটা কথাও ফুটল না। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় বাক্যহারা প্রত্যেকেই।

ফিরে এসে চ্যালেঞ্জার বললেন—“ফোন করছেন ব্রাইটনের মেডিক্যাল অফিসার। লক্ষণগুলো কি কারণে জানা নেই সমুদ্র তীরেই খুব তাড়াতাড়ি দেখা দিচ্ছে। সাতশ ফুট ওপরে আছি বলে অনেকটা নিশ্চিন্ত আমরা। এ ব্যাপারে আমিই একমাত্র জ্ঞানদান করতে পারি, বোকাগুলো বুঝেছে এতক্ষণে। টাইম্‌স্-এর চিঠিখানায় কাজ হয়েছে দেখছি। তখন যে টেলিফোনটা এল, সেটা একটা শহরের মেয়রের কাছ থেকে। লোকটার ধারণা ওর প্রাণের দাম অনেক বেশী। ভুলটা ভেঙে দিয়েছি।”

সামারলি জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হাড়-সর্বস্ব সরু আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছিল নিদারুণ আবেগে।

বললেন প্রগাঢ় কণ্ঠে—“চ্যালেঞ্জার, পরিস্থিতি গুরুতর—বাজে তর্ক করবার সময় আর নেই। প্রশ্ন করলে ভাববেন না যেন খোঁচা মারতে চাইছি। কিন্তু একবার ভেবে দেখবেন কি যুক্তির মধ্যে ফাঁক কোথাও আছে কিনা? সূর্য এখনও ঝকঝক করছে নীল আকাশে, পাখী উড়ছে, ফুল ফুটছে সবুজ মাঠে, গলফ-মাঠে দিব্বি খেলা নিয়ে মত্ত খেলোয়াড়রা, ফসল কাটছে চাষী ভাইরা। এই সবই কি শেষ হতে চলেছে? যে সূর্যের প্রতীক্ষায় চিরকাল মানুষ সমস্ত রাত কাটিয়েছে, সেই সূর্যের মধ্যেই, এই আলো হাসি গানের মধ্যেই, প্রাণের সব চিহ্ন মুছে যেতে বসেছে? অদ্ভুত কতকগুলো ব্যাপার দেখে এত বড় সিদ্ধান্তে আপনি পৌঁছেছেন। যেমন, বর্ণালির ওপর কতকগুলো অস্বাভাবিক কালো রেখা—সুমাত্রার গুজব—ট্রেনে আমাদের তিনজনের অদ্ভুত আচরণ। শেষের লক্ষণগুলো

খুব একটা প্রকট না হলেও আমরা সামলে নিতে পারতাম—যেমন আপনি করেছেন। মৃত্যু এর আগেও আমাদের সামনে এসেছে—চারজনেই মৃত্যুর সঙ্গে টক্কর দিয়েছি। সুতরাং মৃত্যুকে ডরাই না। কিন্তু আপনি খুলে বলুন চ্যালেঞ্জার, আমাদের ভবিষ্যৎ কি এবং এখনকার পরিস্থিতিই বা কি রকম বুঝছেন।”

বক্তৃতাটা বাস্তবিকই মর্মস্পর্শী নীরস কাঠখোট্টা ঐ আধবুড়ো জীবতত্ত্ববিদের মুখ থেকে এমন বলিষ্ঠ বক্তৃতা আশা করা যায় না। উঠে দাঁড়িয়ে লর্ড জন করমর্দন করলেন সামারলির।

বললেন—“আমারও সেই কথা। ভয়ডর আমাদের কম, চ্যালেঞ্জার। কিন্তু সব কথা শুনতে চাই। হপ্তা শেষের ছুটিতে এসে যদি শুনি পৃথিবীর মৃত্যুর দিনক্ষণ আপনি জেনে বসে আছেন, স্বভাবতঃই জানতে ইচ্ছে যায় আসল বিপদটা কি, কতখানি এবং বিপদ এসে গেলে আমাদের করণীয় কি হবে।”

জানলার ধারে রোদে দাঁড়িয়ে সামারলির কাঁধে বাদামী হাত রেখে কথাগুলো বললেন দীর্ঘদেহী শক্তিমান পুরুষ লর্ড জন। আমি কাৎ হয়ে পড়ে রইলাম আর্মচেয়ারে—ঠোঁটের ফাঁকে শিথিলভাবে ঝুলতে লাগল আধপোড়া সিগারেটটা। আচ্ছন্নের মত দেখলাম এবং শুনলাম সব কিছুই। ঘোরে থেকেও অনুভূতির ধার ভোঁতা হয়নি—বরং বেড়েছে। বিষক্রিয়ার নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে হয়ত। হাত-পা ছুঁড়ে সেই প্রলাপবকার পর্ব কাটিয়ে এসেছি, এখন শুরু হয়েছে অপরিসীম শৈথিল্য। হাত-পা এলিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকার ইচ্ছে—অথচ মনটা সজাগ রয়েছে অতি মাত্রায়। আমি শুধু দর্শক এবং শ্রোতা। নিজস্ব ভূমিকা যেন কিছুই নেই। কিন্তু তিন তিনজন শক্তিমান পুরুষ সংকটের মোকাবিলা করতে বসেছেন—সে দৃশ্য দেখবার মত বইকি। লোমশ ভুরু বেঁকিয়ে দাড়ির ওপর বার কয়েক হাত চালালেন চ্যালেঞ্জার। দেখলেই বোঝা যায় মেপে ওজন করে কথা বলার জন্যে তৈরী হচ্ছেন।

বললেন আমাকে—"লণ্ডন থেকে বেরোনোর সময়ে শেষ খবর কি পেয়েছিলে?"

"দশটা নাগাদ 'গেজেট' অফিসে ছিলাম। রয়টারের খবর এল সিঙ্গাপুর থেকে। সুমাত্রায় দাবানলের মত ছড়িয়ে রহস্যজনক একটা রোগ। লাইট হাউস জ্বলেনি সেই কারণে।"

টেলিগ্রামের তাড়া তুলে নিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন—"তারপর থেকেই একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। খুবই দ্রুত ঘটছে।—সরাসরি খবর আসছে খবরের কাগজের অফিস থেকে—যেখানে ঘটছে সেখান থেকেও। খবর আসছে পৃথিবীর সব অঞ্চল থেকে। গোটা পৃথিবীর খবর এখন শুধু আমারই নখদর্পণে। দাবী উঠেছে আমাকে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়ার—কিন্তু গিয়ে কোন লাভ হবে না। খবরগুলো খুঁটিয়ে পড়েছি বলেই জানি বিষের ক্রিয়ার প্রথম লক্ষণ মানসিক উত্তেজনা। আজ সকালেই মারাত্মক দাঙ্গা শুরু হয়েছে প্যারিসে; ওয়েলসের কয়লা খনির শ্রমিকরা মারমুখো হয়ে উঠেছে। এখন পর্যন্ত যে খবর এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সাংঘাতিক এই উত্তেজনার ঠিক পরেই দারুণ শৈথিল্য নামে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, মন থাকে কিন্তু সজাগ—এই মুহূর্তে তরুণ বন্ধু ম্যালোনের চেহারায় তা বেশ ফুটে উঠেছে—এর পরেই আসে সংজ্ঞাহীনতা এবং মৃত্যু। বিষ-বিজ্ঞানে আমার সামান্য জ্ঞান অনুযায়ী বলতে পারি স্নায়ু পঙ্গু করে দেওয়ার কিছু বিষ গাছপালার জগতে পাওয়া যায়—"

"ধুতরো", ধরিয়ে দিলেন সামারলি।

"চমৎকার!" চ্যালেঞ্জারের আনন্দ দেখে কে—"ইথারের এই বিষেরও একটা বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া দরকার। ধুতরোন নামটা মন্দ নয়। সামারলি, বিশ্বধ্বংসী অদ্বিতীয় এই মহাবিষের নামকরণ করার বিরাট সম্মান শেষ পর্যন্ত আপনার বরাতেই জুটল—যদিও তা পাবেন মৃত্যুর পর। ধুতরোনের লক্ষণ কি, আগেই বলেছি। যেহেতু ইথার বিশ্বব্যাপী, সুতরাং মৃত্যুও আমাদের অবধারিত—জীবন্ত প্রাণী কেউ

আর থাকবে ধরাধামে। ধুতরোনের আক্রমণ খেয়ালখুশী মত হয়েছে এতক্ষণ পর্যন্ত, কিন্তু ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তফাৎটা টের পাওয়া যাবে। জোয়ারের জল যখন উঠতে থাকে, তখন আগে বালির একদিক একটু ভেজে, তারপরের স্তর তারপরে—এলোমেলো সরু সরু ধারায় জল উঠতে থাকে—শেষকালে সব ডুবিয়ে দেয়। ধুতরোনের বিষক্রিয়ার মধ্যেও নিয়ম আছে এবং তা অনুধাবন করার মত—হাতে সময় যদি পেতাম নিয়মগুলো লিখে ফেলা যেত। যেটুকু খবর পাওয়া গেছে"—হাতের টেলিগ্রামগুলোয় চোখ বুলোলেন চ্যালেঞ্জার—"কম উন্নত জাতগুলোই আক্রান্ত হয়েছে সবার আগে। শোচনীয় খবর এসেছে আফ্রিকা থেকে। অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীরা সব নিশ্চিহ্ন। উত্তর গোলার্ধের মানুষদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষদের চাইতে বেশী। এই দেখুন, এই যে টেলিগ্রামটা, এটা এসেছে মার্সেইল্‌স্ থেকে আজ সকাল নটা পঁয়তাল্লিশে। পড়ে শোনাচ্ছি :—

'দেশ জুড়ে সারারাত উন্মত্ত উত্তেজনা। নাইমে আঙুর-ক্ষেতের চাষীরা ক্ষিপ্ত। টুলোনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আজ সকালে অকস্মাৎ অসুখ আর সংজ্ঞাহীনতায় আক্রান্ত জনগণ। রাস্তাঘাটে বিস্তর মড়া। কাজকারবার স্থগিত, সর্বত্রই হট্টগোল।'

"ঠিক একঘণ্টা পরে ওখান থেকেই এল আর একটা টেলিগ্রাম :—

'সম্পূর্ণ অবলুপ্তির পথে সারা দেশ। গির্জেতে আর জায়গা নেই। মৃতের সংখ্যা জীবন্তর চাইতে বেশী। অকল্পনীয় এবং ভয়ংকর। অসুখটা মনে হয় যন্ত্রণাহীন, কিন্তু দ্রুতগতি এবং অবধারিত।'

"একই টেলিগ্রাম এসেছে প্যারিস থেকে—ওখানে আক্রমণটা এখনও চরম আকার নেয় নি। ভারতবর্ষ আর পারস্য প্রাণহীন। কেউ বেঁচে নেই। অস্ট্রিয়ার স্লাভোনিক জনগণ সব শেষ, কিন্তু টিউটোনিকদের বলতে গেলে কিছুই হয়নি। হাতে যতটুকু খবর রয়েছে, তাতে মোটামুটি বলা যায় সমতলভূমি আর সমুদ্রতীরের

লোকগুলোই খুব তাড়াতাড়ি খতম হচ্ছে—ভেতর দিকে বা উঁচু জায়গায় থাকলে ধুতরোন এখনও সুবিধে করতে পারছে না। একটু উঁচুতে থাকলেও তফাৎটা ধরা যাচ্ছে। কে জানে, পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত যদি জীবন্ত মানুষ থেকে যায় দেখা যাবে তারা বসে রয়েছে আর এক 'আরারাতে'র শীর্ষে। আমরা যে পাহাড়ে রয়েছি, শেষ পর্যন্ত এটাও হয়ত দেশব্যাপী ধ্বংস সমুদ্রের মাঝে প্রাণময় দ্বীপে পর্যবসিত হবে। তবে যে হারে ধুতরোন আক্রমণ চালাচ্ছে, আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে চুবিয়ে মারবে আমাদের সবাইকেই।"

কপাল মুছলেন লর্ড জন।

"এর পরেও কি করে একগাদা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে টেবিলে বসে পা দোলাতে দোলাতে হাসছেন ভেবে পাচ্ছি না—সত্যিই অদ্ভুত লোক মশাই আপনি। মৃত্যুকে আমি অনেকবার সামনে দেখেছি, অনেকেই দেখেছে; কিন্তু বিশ্বব্যাপী করাল মৃত্যু—কী ভয়ংকর।"

চ্যালেঞ্জার যেন জবাবের জন্যে তৈরী হয়েই ছিলেন বললেন—"হাসি পাচ্ছে কেন, আগে তা বলা যাক। ইথারের বিষ আপনার আমার মগজে সমান ভাবেই ছড়িয়েছে—বেহাত আমরাও পড়িনি। উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত তাই দুজনেরই স্নায়ু এবার আপনাকে নিয়ে পড়া যাক। বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর করাল ছায়ায় আপনি 'কী ভয়ংকর' বলে শিউরে উঠলেন। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? সমুদ্রে একা একা নৌকো নিয়ে গেলে বুক আপনার ঢিপ ঢিপ করবে ঠিকই —কারণ অত ফাঁকায় একেবারে একা জলবিহার করা যায় না। কিন্তু যদি জাহাজে অনেকের সঙ্গে যেতেন ভয় পেতেন না কোন অবস্থাতেই। মনে বল পেতেন। জানতেন, কপালে যাই থাক না কেন—সবার ভাগ্যেই তাই ঘটবে। সবার সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখার ফলেই আপনি ভেঙে পড়তেন না। একক মৃত্যু ভয়াবহ, কিন্তু সার্বজনীন মৃত্যু—বিশেষ করে এই মৃত্যুর মত যন্ত্রণাহীন মৃত্যু

—আমার কাছে অন্ততঃ ভয়ের কিছু নয়। বরঞ্চ, পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীর মৃত্যুর পর যে কটা হতভাগা টিঁকে যাবে, দুঃখ হচ্ছে তাদের জন্যেই।"

এই প্রথম সতীর্থ বৈজ্ঞানিকের যুক্তি মনে ধরায় ঘাড় নেড়ে সায় দিতে দিতে সামারলি বললেন—"তাহলে বলুন এখন কি করতে হবে?"

"খেতে হবে", বললেন চ্যালেঞ্জার—কেননা ঠিক তখনি সারা বাড়ী কেঁপে উঠল গুরুগম্ভীর ঘণ্টা নিনাদে। "আমার রাঁধুনিটার হাত বড় ভাল। কাটলেট আর ওমলেট দুটোই করে চমৎকার। আশা করব মহাজাগতিক বিপর্যয়ের ফলে ওর রান্নার কেরামতিটা অন্ততঃ নষ্ট হয়নি। '৮৯৬ সাল থেকে রেখে দেওয়া অতি পুরোনো সুরার বোতলগুলো উদ্ধার করব পাতাল কুঠরি থেকে—পানাহারের এই তো সময়।" বলে, বিরাট দেহটা কষ্টে-সৃষ্টে নামিয়ে আনলেন টেবিল থেকে—একটু আগে এখানে বসেই তিনি সহর্ষে ঘোষণা করেছেন পৃথিবীর আসন্ন মৃত্যু-বৃত্তান্ত। "আসুন, আসুন ভালমন্দ খেয়ে নেওয়া যাক সময় যখন আর নেই, ফুর্তির বাকী থাকে কেন।"

তাই করলাম বটে। খেতে বসে এত মজা সচরাচর পাইনি। আসন্ন মৃত্যুর কথা মন থেকে না মুছলেও খাওয়ার আনন্দ তাতে তিরোহিত হল না। বরং মহান মৃত্যুর পদধ্বনিই সংযত সুসংবদ্ধ রাখল আমাদের চিন্তা। মৃত্যু যারা কখনো দেখেনি, মৃত্যু আসছে শুনলে আৎকে ওঠে তারাই। অতীতে কোন না কোন শুভলগ্নে মহান মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাদের প্রত্যেককেই। চ্যালেঞ্জার গৃহিনী সম্পূর্ণ নির্বিকার—শক্তিমান স্বামীর ওপর অগাধ আস্থার ফলেই তিনি ভয়শূন্য—পতির পথই তাঁর পথ—সে পথ মৃত্যুর পথ হলেও কিছু এসে যায় না। ভবিষ্যৎ ভাগ্যের হাতে। বর্তমান আমাদের হাতে। তাই প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দ করে কাটালাম, সঙ্গসুখ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলাম। মন প্রশান্ত,

আশ্চর্য ভাবে নিস্তরঙ্গ। শুধু নিস্তরঙ্গ নয়—খুশীতে টইটুম্বুর—অন্ততঃ আমায় ফুর্তি যেন স্ফুলিঙ্গ হয়ে ছিটকে ছিটকে গেল কথার ফাঁকে ফাঁকে। চ্যালেঞ্জার কিন্তু সত্যিই অনন্য। একাই জমিয়ে রাখলেন খাওয়ার টেবিল। তুলনাহীন মানুষ। লোকটার অসাধারণ বিরাটত্ব এভাবে আমার মনপ্রাণ স্পর্শ করেনি এর আগে—যেমন প্রখর তাঁর ব্যক্তিত্ব, তেমনি তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র তাঁর বোধশক্তি—নিমেষে প্রবেশ করেন যে কোন কূটতত্ত্বের একদম গভীরে। সামারলি স্বভাবগত সমালোচনার চাবুক হাঁকড়িয়ে চললেন নির্মম ভাবে, কথার লড়াই দেখে হেসে কুটিপাটি হলাম আমি আর লর্ড জন, মিসেস চ্যালেঞ্জার মাঝে মাঝে স্বামীর বাহুতে হাত রেখে সামাল দিতে লাগলেন দার্শনিকের গর্জন উচ্ছ্বাসে। জীবন, মৃত্যু, ভাগ্য, নিয়তি—এই সবের আলোচনায় স্মরণীয় হয়ে রইল সেই একটি ঘণ্টা। খাওয়া যতই এগিয়েছে, একটা অদ্ভুত উল্লাসবোধে মনপ্রাণ যেন ময়ূরের মত ততই নেচে উঠেছে—হাত পায়ে বিচিত্র সুড়সুড়ুনি অনুভব করেছি। একবার দেখলাম হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দিলেন লর্ড জন, আরেকবার মুহূর্তের জন্যে চেয়ারে এলিয়ে পড়েই পরক্ষণেই সথে হয়ে বসলেন সামারলি। বেশ বুঝলাম অদৃশ্য মৃত্যু জাল টিয়ে আনছে চার ধারে। প্রতিবার নিঃশ্বেস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফটা বিচিত্র শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে অনুপরমানুতে। মন কিন্তু সুখে গমল, ভয়ভাবনা শূন্য, সহজ, শান্ত। খাওয়া শেষ হল। টেবিলে সিগারেট রাখল অস্টিন। কিন্তু যাওয়ার আগেই ডাক দিলেন চ্যালেঞ্জার :

"অস্টিন!"

"আজ্ঞে?"

"তোমার সেবা মনে থাকবে।"

অস্টিনের মুখের কোঁচকানো চামড়ার ওপর দিয়ে ভেসে গেল চাপা হাসি।

"আজ্ঞে, সে তো আমার কর্তব্য।"

"অস্টিন, পৃথিবী ধ্বংস হবে এখুনি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কটার সময়ে?"

"বলা মুস্কিল। সন্ধ্যের মধ্যেই!"

"ভালই তো।"

অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল স্বল্পভাষী অস্টিন। সিগারেট ধরালেন চ্যালেঞ্জার। চেয়ারটা স্ত্রীর চেয়ারের পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হাতে হাত রাখলেন।

বললেন—"সব জানো তুমি। এঁদেরকেও বলেছি। ভয় করছে?"

"জর্জ, যন্ত্রণা হবে না তো?"

"দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেলে লাফিংগ্যাসে যেটুকু কষ্ট সেই টুকুই।"

"কষ্ট কোথায়, সে তো মজার ব্যাপার।"

"মৃত্যুও তাই। জীর্ণ দেহযন্ত্রে যন্ত্রণার ছাপ আর থাকবে না—কিন্তু আবিষ্ট থাকার বা স্বপ্নাচ্ছন্ন থাকাব মানসিক আনন্দ যে কি জিনিস তা জানি প্রত্যেকেই। আত্মা জন্মজন্ম ধরে মৃতুরূপী ঝলমলে পর্দা সরিয়ে যাচ্ছে এক দেহ থেকে আরেক দেহে। সারাজীবনের সাধনায় আমি বস্তু রহস্যের গভীরে জ্ঞানেব সন্ধান করেছি—কিন্তু মৃতুভয়ে ভীত মানুষের দরকার জীবন থেকে জীবনে যাওয়ার মনোবল। না, না, সামারলি, আপনার বস্তুতন্ত্রে খুশী নয় আমার মন—অন্ততঃ এই 'আমি' টা মৃত্যুর পর মাত্র এক প্যাকেট সল্ট আর তিন বালতি জল হয়ে ফুরিয়ে যাবে—এ তত্ত্ব আমি বিশ্বাস করিনা—প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সল্ট আর জলের চেয়ে অনেক বড় কিছু।" বলেই প্রকাণ্ড রোমশ মুষ্টি তুলে দমাদম কপাল ঠুকতে ঠুকতে বললেন—"এইখানে এমন কিছু একটা আছে যা বস্তুকে ব্যবহার করে—কিন্তু নিজে বস্তু নয়—যা মৃত্যুকে ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু মৃত্যু যাকে ধ্বংস করতে পারে না।"

"মৃত্যুর কথাই যখন বললেন, তখন বলি," লর্ড জন মুখ খুলেছেন। "আমি খৃষ্টান। কিন্তু অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কবরস্থ হওরার ধরনটা আমার কাছে বেশী ভাল লাগে। সারা জীবন যা নিয়ে তারা বাঁচতেন, মরবার পর মাটির তলায় শোওয়ার সময়ে সেই নিয়েই শেষ ঘুম ঘুমোতেন--বুকের ওপর থাকত তীরধনুক ছুরি তলোয়ার।" এই পর্যন্ত বলে চারপাশ দেখে নিলেন লর্ড জন, একটু লজ্জা পেয়েছেন মনে হল—"আমার ইচ্ছে এই সময়ে সঙ্গে বন্দুক ছোরা টোটা থাকলে মনটা নিশ্চিন্ত হত। নিত্যসঙ্গী '৪৫০ এক্সপ্রেসটার অভাব বড্ড বেশী অনুভব করছি। বোকার মত ইচ্ছে যদিও। প্রফেসর, আপনি কি বলেন?"

সামারলি বললেন—"জিজ্ঞেস যখন করেছেন তখন বলি। আপনার ইচ্ছেটা প্রস্তর যুগের ইচ্ছে। আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। মরতে চাই সভ্য মানুষের মত। আমার বয়স হয়েছে। আজ হোক কাল হোক মরতে আমাকে হবেই। তাই মৃত্যুভয় আপনাদের চাইতে বেশী আমার নেই। কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে চুপ চাপ বসে মৃত্যুবরণ করা আমার ধাতে নেই। এ যেন কশাইয়ের হাতে পাঁঠার মৃত্যু। চ্যালেঞ্জার, ঠিক করে বলুন তো, কিছুই কি আর করবার নেই?"

"বাঁচবার উপায় কিছুই নেই। তবে প্রাণটাকে কয়েক ঘণ্টা বেশী ধরে রাখার উপায় আছে। তাতে একটা লাভ—অন্যের মৃত্যু দেখে যেতে পারব।- কিভাবে মহাবিষের খপ্পরে পৃথিবী শেষ হয়ে যাচ্ছে—তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাব। সে উপায় আমি ভেবে রেখেছি। ব্যবস্থাও করেছি—"

"অক্সিজেন?"

"ঠিক ধরেছেন। অক্সিজেন।"

"কিন্তু ইথিরীয় বিষ আসরে অবতীর্ণ হলে অক্সিজেনের আর ভূমিকা থাকছে কি? গ্যাসের সঙ্গে ইটের যা সম্পর্ক, ইথারের সঙ্গে

অক্সিজেনের সেই সম্পর্ক। দুটো একেবারেই ভিন্ন স্তরের বস্তু। একটার ঘাড়ে আর একটাকে চাপানো যায় না। চ্যালেঞ্জার, অসম্ভব কথা বলছেন কেন ?"

"বন্ধু সামারলি, ইথারের এই বিষের ওপর বস্তু জগতের প্রভাব অবশ্যই আছে। আক্রমণের ধরন দেখেই তা বোঝা যায়। মড়ক ছড়িয়েছে যে ভাবে সেটা থেকেও শেখবার আছে। যা ঘটনা, তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একমাত্র অক্সিজেনই ধুতরোন বিষের মারাত্মক ক্রিয়াকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে—কেন না অক্সিজেনই মানবদেহ বাঁচিয়ে রেখেছে, শক্তি জোগাচ্ছে, প্রাণবিন্দুকে ধরে রেখেছে। হয়ত আমি ভুল করছি, কিন্তু যুক্তিতে যে ভুল নেই, সে বিশ্বাস আমার আছে ”

"দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত যদি মুখে বোতল লাগিয়ে অক্সিজেন নিতে বলেন, তাহলে মশাই ওর মধ্যে আমি নেই," বললেন লর্ড জন।

"তার দরকার হবে না," জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার। "ব্যবস্থা হয়ে গেছে—ঋণী থাকুন আমার স্ত্রীর কাছে—কেননা তাঁর সাজঘরটাই কাজে লাগাচ্ছি শেষ পর্যন্ত। বাতাস যাতে ঢুকতে না পারে, সে ব্যবস্থা ভার্নিশ কাগজ আর ম্যাটিং দিয়ে করা যাবে'খন।"

"বলছেন কি চ্যালেঞ্জার ? ইথারকে ভার্নিশ কাগজ দিয়ে আটকাবেন ?"

"হায়রে বন্ধু, ছোট্ট এই ব্যাপারটা মাথায় এল না ? ইথারকে আটকে রাখার জন্যে তো এত কাণ্ড করছি না। করছি অক্সিজেনকে আটকানোর জন্যে। অক্সিজেনের মধ্যে যদি নিঃশ্বাস নিই, আমার দৃঢ় ধারণা ইথারের বিষকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব বেশ কিছুক্ষণ। দুটো সিলিণ্ডার আমার কাছেই আছে। আপনারা আনলেন তিনটে। যথেষ্ট না হলেও কিছুতো বটে।"

'ফুরোতো কতক্ষণ লাগবে ?"

"জানি না। লক্ষণ প্রকট না হলে, কষ্ট একান্তই অসহ্য না

হলে, সিলিণ্ডারের মুখ খুলব না। খোলবার পরেও খরচ করব একটু একটু করে—খুব দরকার না হলে বন্ধ রাখব। এভাবে কয়েকটা দিনও কাটিয়ে দিতে পারি—অভিশপ্ত পৃথিবীর চেহারা দেখে যেতে পারি। মানুষ জাতটার শেষ দেখবার জন্যে থাকব শুধু আমরা পাঁচজনেই।—চরম ভাগ্যকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব শুধু ঐটুকু সময়ের জন্যে। তারপরেই আরম্ভ হবে অজানার উজানে ভেসে যাওয়ার পালা। সিলিণ্ডার গুলো এবার ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া যাক। আবহ এর মধ্যেই ভারী হয়ে উঠছে টের পাচ্ছি।"

৩। নিমজ্জিত

অবিস্মরণীয় সেই অভিজ্ঞতার জন্যে যে কক্ষটি নির্দিষ্ট হয়েছিল, সেটি মেয়েদের সাজঘরই বটে। ভারী সুন্দর ভাবে সাজানো। চৌকো। এক-একদিক চোদ্দ কি পনেরো ফুটের বেশী নয়। একদিকে লাল মখমল দিয়ে আলাদা করা একটা ছোট্ট ঘর— প্রফেসরের সাজগোজের জায়গা। তারপরেই একটা মস্ত শোবার ঘর। পর্দা ঝুলছে তখনও। অতি-অক্সিজেন সমৃদ্ধ কক্ষে রূপান্তরিত হবে এই চৌকো ঘরটাই—প্রফেসরের ড্রেসিংরুমও থাকবে তার মধ্যে। একদিকের একটা দরজা আর জানালার ফাঁকগুলো এর মধ্যেই ঢেকে দেওয়া হয়েছে ভানিশ কাগজে। একটা ফ্যানলাইট থেকে দড়ি ঝুলছে—বাইরের হাওয়ার একান্তই দরকার হলে দড়ি ধরে টানলেই হল। এককোণে টবে বসানো বড়সড় ঝোপের মত একটা গুল্ম।

লোহার সিলিণ্ডার পাঁচটা দেওয়ালের গায়ে সারবন্দী দাঁড় করিয়ে রাখা হল। চ্যালেঞ্জার চারপাশ দেখে নিয়ে বললেন— "অক্সিজেনের বাজে খরচ কমিয়ে কার্বন-ডায়অক্সাইডকে ঘর থেকে সরানো যায় কি করে, সেটাও একটা সমস্যা। হাতে সময় থাকলে সমস্যাটার সমাধান করতে পারতাম ভাল করেই, কিন্তু আপাততঃ ঐ ঝোপটা সে কাজ কিছুটা করতে পারবে— নিঃশ্বাসের কার্বনডায়-অক্সাইড টেনে নিয়ে ঘরে শুধু অক্সিজেনই রেখে দেবে। দুটো সিলিণ্ডার যে কোনো মুহূর্তে খোলার মত অবস্থায় রেখেছি। তবে ঘর থেকে বেশীদূরে না যাওয়াই ভাল। বিপদ আসবে আচমকা— সময় পাওয়া যাবে না।"

জানলা দিয়ে বারান্দার ওদিকে নিসর্গদৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। পড়ার

ঘর থেকে এ দৃশ্য আগেই দেখেছি। যতদূর দুচোখ যায়, বৈলক্ষণ্য কিছু দেখলাম না। পাহাড়ের গা দিয়ে এঁকেবেঁকে নেমে গেছে রাস্তা। স্টেশন থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ী আসছে, ধুঁকতে ধুঁকতে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠছে। মান্ধাতার আমলের ছ্যাকরা এই গাড়ী গ্রামাঞ্চল ছাড়া দেখা যায় না। তারও নিচে একজন আয়া পেরামবুলেটরে বাচ্ছা বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—আর একটা বাচ্ছাকে কোলে করে রয়েছে। কটেজগুলোর চিমনী থেকে কালচে ধোঁযা ধীর গতিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে মাঠের ওপর দিয়ে। শান্তি, সুখ বিরাজ করছে সর্বত্র। নীল স্বর্গে অথবা রৌদ্রালোকিত মর্ত্যে আসন্ন বিপর্যয়ের করাল ছায়ার চিহ্নমাত্র নেই। মাঠে চাষীরা ফসল কাটা নিয়ে ব্যস্ত, গল্‌ফ খেলোয়াড়রা জুটি বেঁধে দৌড়োচ্ছে মাঠে। মাথার মধ্যে অদ্ভুত ওলটপালট অনুভূতির দরুন আর অতি-উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী জট পাকিয়ে যাওয়ার জন্যেই বোধহয় নিচের আর দূরের মানুষগুলোর আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় অবাক হয়ে যাচ্ছি শুধু আমি।

তাই বলেছিলাম—"খেলোয়াড়দের কোন কষ্ট হচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

লর্ড জন প্রশ্ন করলেন—"কখনো গল্‌ফ্ খেলেছো?"

"না।"

"ছোকরা, খেলে থাকলে বুঝতে এক রাউণ্ড জেতার পর খাঁটি গল্‌ফ্ খেলোয়াড় পৃথিবী উল্টে গেলেও মাঠ ছেড়ে যেতে চায় না। ঐ আবার টেলিফোন এসেছে।"

খাওয়ার সময়ে এবং পরে তীব্র শব্দে ঘন ঘন টেলিফোন ঘণ্টা বেজেছে—উঠে গেছেন প্রফেসর। ফিরে এসে কাটছাঁট কথায় শুনিয়েছেন ফোনের বার্তা। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-হেন ভয়ংকর ঘটনা কখনো ঘটেনি। মৃত্যু বন্যার আকারে দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে গুটি গুটি এগোচ্ছে অন্যদিকে। উন্মত্ত প্রলাপের অন্তে পুরো মিশর

এখন সংজ্ঞাহীন। স্পেন আর পর্তুগালে ক্ষিপ্ত পুরুষ আর সশস্ত্র বিপ্লবীদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেছে সকালে—এখন সেখানে সব নিস্তব্ধ। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তারবার্তা আর আসছে না উত্তর আমেরিকায় দাক্ষিণাঞ্চলের মানুষগুলো কিছুক্ষণ মারদাঙ্গা উন্মত্ততা নিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে শেষ পর্যন্ত বিষের খপ্পরে পড়েছে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উত্তরে বিষক্রিয়া তেমন স্পষ্ট নয়—কানাডায় লক্ষণ ধরা যাচ্ছে না বললেই চলে। বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্কের কেউ রেহাই পায়নি। বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক, ডাক্তারখানা, ওষুধের দোকান আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাগলের মত সবাই দৌড়োচ্ছে উপদেশের জন্যে কাকুতি মিনতি করে জানতে চাইছে বাঁচবার পথ কি। প্রশ্নে প্রশ্নে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন জ্যোতির্বিদরা। কিন্তু করার কিছু নেই। বিশ্বব্যাপী মহাবিষের খপ্পর থেকে রেহাই পাওয়ার মহামন্ত্র মানুষের জানা নেই। এ মৃত্যুতে যন্ত্রণা নেই—পরিত্রাণও নেই। ছোট বড়, দুর্বল সবল, ধনী দরিদ্র প্রত্যেককেই মরতে হচ্ছে—বাঁচবার পথ নেই, আশা নেই, সম্ভাবনা নেই। টুকরো টুকরো টেলিফোন বার্তার মাধ্যমে সারা পৃথিবী থেকে এই খবরই এসেছে ক্রমাগত। বড় শহরগুলো বুঝতে পেরেছে নিয়তিকে ঠেকানো যাবে না। হাল ছেড়ে দিয়ে সসম্ভ্রমে পথ চেয়ে আছে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জানলা দিয়ে দেখছি গলফ খেলোয়াড়রা শিরে উদ্যত মৃত্যু নিয়ে নির্বিকারভাবে এখনো খেলায় মত্ত। আশ্চর্য। সত্যিই আশ্চর্য! অবশ্য ওরা জানবেই বা কি করে? অতর্কিতে দানবিক বন্যার আকারে অদৃশ্য মৃত্যু ঝাঁপিয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীর ওপর। সকালের খবরের কাগজে জনগণকে হুঁশিয়ার করার মত খবর ছিল কি? এখন বেলা তিনটে। হঠাৎ দেখলাম চাষীরা মাঠ ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে আসছে। গুজব কানে গিয়েছে বোধ হয়। জনাকয়েক গলফ্ খেলোয়াড় ক্লাব-বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছে। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে হলে যে ভাবে মানুষ দৌড়োয়, ওরাও দৌড়োচ্ছে সেইভাবে। চা

রাখবার ছোট ছোট বাক্সগুলো গড়গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে পেছন পেছন। বাকী খেলোয়াড়রা এখনও খেলায় তন্ময়। ঘুরে দাঁড়িয়ে আয়াট। তাড়াতাড়ি পেরামবুলেটর টেনে তুলছে পাহাড়ি পথে। কপাল টিপে বয়েছে—এতদূর থেকেও দেখলাম স্পষ্ট। দাঁড়িয়ে গিয়েছে ছ্যাকরা গাড়ীটা, ক্লান্ত ঘোড়াটা সামনের দুপায়ের ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে ধুঁকছে। মাথার ওপর কিন্তু পান্নার মত ঝকঝকে নীল গ্রীষ্মের আকাশ—অন্তহীন নীলরঙের একটা বিরাট খিলেন—মাঝে মাঝে ভাসছে পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ। মানুষ জাতটা আজ রাতেই যদি নিশ্চিহ্ন হয়েও যায়, সে মরণ গৌরবময় হয়ে থাকবে অপূব সুন্দর এই মৃত্যুশয্যার জন্যে। মনটা মোচড় দিয়ে উঠছে কিন্তু এই কারণেই। বসুন্ধরার এই স্নিগ্ধ রূপের পাশেই বিকট পাইকারী মৃত্যুকে কল্পনা করতেও কষ্ট হচ্ছে। এত সুন্দর ধরণীর কোল থেকে এমন নির্দয় ভাবে চক্ষের নিমেষে ধরণীর সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বুকের ভেতরটা কি যে করছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজেছিল আগেই বলেছি। হঠাৎ কানে ভেসে এল হলঘর থেকে চ্যালেঞ্জারের বাজখাঁই গলার চীৎকার।

"ম্যালোন! তোমার ফোন।"

দৌড়ে গেলাম। ফোন করছেন ম্যাকআর্ডল—লণ্ডন থেকে।

"মি. ম্যালোন? মিঃ ম্যালোন তো? শোন, শোন, সাংঘাতিক সব ব্যাপার ঘটছে লণ্ডনে, ভগবানের দোহাই বাবা, প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে জিজ্ঞেস কর এ অবস্থায় কি করা উচিত।"

"উনি কিছুই বলবেন না। কেন না, বিপদ সারা পৃথিবী জুড়ে নেমেছে—রেহাই পাবে না কেউ। কয়েক সিলিণ্ডার অক্সিজেন রেখেছি এখানে কয়েক ঘণ্টা বেশী টিঁকে থাকার জন্যে।"

"অক্সিজেন!" ককিয়ে উঠলেন ম্যাকআর্ডল। "অক্সিজেন আনবার আর সময় নেই। তুমি যাওয়ার পর থেকেই অফিসে তাণ্ডব

মৃত্য গিয়েছে। এখন অর্ধেক লোকের জ্ঞান নেই। আমার নিজের মাথা ভারী লাগছে। জানলা দিয়ে দেখছি ক্লিট স্ট্রীটে মড়ার ওপর মড়া পড়ে রয়েছে। গাড়ী-ঘোড়া সব বন্ধ। শেষ টেলিগ্রামটায় খবর এসেছিল গোটা পৃথিবী —”

কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এল এবং স্তব্ধ হল আচম্বিতে। ঠিক তারপরেই ধপ করে একটা শব্দ শুনলাম টেলিফোনের মধ্যে। নিশ্চয় টেবিলে মাথা গুঁজরে পড়ে গেলেন ম্যাকঅর্ডাল।

“মিঃ ম্যাকআর্ডল! মিঃ ম্যাকআর্ডল!”

জবাব নেই। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। ও গলা আর ইহ-জীবনে শোনা যাবে না।

টেলিফোন-যন্ত্র থেকে সবে এক পা সরে এসেছি, ঠিক তখনি জিনিসটা ঝাঁপিয়ে পড়ল চোখে মুখে। যেন গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে স্নান করছিলাম—একটা বড় ঢেউ চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। খুব আস্তে আস্তে যেন একটা অদৃশ্য হাত আমার টুঁটি টিপে ধরে প্রাণটাকে বার করে দিতে চাইল দেহপিঞ্জর থেকে। একটা তীব্র পীড়ন অনুভব করলাম বুকের ওপর। মাথার মধ্যেটা হঠাৎ যেন কে খামচে ধরল। কান ভোঁ ভোঁ করে উঠল আচমকা—যেন অনেক মৌমাছি গুনগুনিয়ে চলেছে। চোখে দেখলাম অজস্র উজ্জ্বল আলোর ঝলক। সিঁড়ির রেলিং ধরে না ফেললে নির্ঘাৎ মুখ থুবড়ে পড়তাম ধাপের ওপর। ঠিক তখনি দেখলাম সাঁৎ করে পাশ দিয়ে ধেয়ে গেলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। কানে শুনলাম তাঁর ঘোঁৎ ঘোঁৎ নাসিকাধ্বনি। চেহারা অতি ভয়ংকর। মুখ লাল টকটকে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। সংজ্ঞাহীন স্ত্রীর ছোট্ট দেহটি শিথিলভাবে ঝুলছে বিরাট কাঁধের ওপর; টলতে টলতে পড়তে পড়তে স্রেফ মনের জোরে সিঁড়ি বেয়ে উল্কার মত তিনি উঠে গেলেন ওপরতলায় সাময়িক নিরাপত্তার ছোট্ট কক্ষ অভিমুখে। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা দেখে নিমেষ মধ্যে হাতীর বল সঞ্চারিত হল আমার

দেহেও, মনে পেলাম আশ্চর্য শক্তি। রেলিং ধরে হোঁচট খেতে খেতেও অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় উঠে গেলাম ওপরের চাতালে। ইস্পাত-কঠিন আঙুল দিয়ে আমার কলার খামচে ধরলেন লর্ড জন এবং পরের মুহূর্তেই দেখলাম চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছি সাজঘরের কার্পেটে কথা বলতে পারছি না, নড়াচড়ার ক্ষমতাও নেই। মিসেস চ্যালেঞ্জার শুয়ে আমার পাশেই। জানলার ধারে চেয়ারে বসে লর্ড জন—পিঠখানা ধনুকের মত বেঁকিয়ে দু'হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে প্রায় নিস্পন্দ। যেন স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম প্রকাণ্ড কদাকার গুবরে পোকার মত চ্যালেঞ্জার হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছেন। তারপরেই হিস্ হিস্ শব্দ শুনলাম—সিলিণ্ডার থেকে অক্সিজেন বেরোচ্ছে। প্রকাণ্ড হাঁ করে বার কয়েক বুক ভরে নিঃশ্বেস নিলেন চ্যালেঞ্জার। গর্জন করতে করতে ফুসফুস জোড়া যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেল প্রাণদায়িনী গ্যাসের সংস্পর্শে।

পরমুহূর্তেই পরমানন্দে বিকট চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর—"হচ্ছে! হচ্ছে। কাজ হচ্ছে! যুক্তি আমার মিথ্যে হয়নি!" তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। সজাগ, সতর্ক, শক্তিমান। খপ করে একটা সিলিণ্ডার তুলে নিয়ে আগে দৌড়ে গেলেন স্ত্রীর কাছে—ধরলেন নাকের কাছে কয়েক সেকেণ্ড পরেই গোঙানি শুনলাম। নড়ে উঠল নিস্পন্দ দেহ। উঠে বসলেন চ্যালেঞ্জার গৃহিণী। এরপর আমার পালা। চ্যালেঞ্জার সিলিণ্ডার ধরলেন আমার নাকে। ধমনীর মধ্যে উষ্ণ প্রাণের বান এল যেন—অদ্ভুত সেই অনুভূতি বলে বোঝাতে পারব না। জানি এ আনন্দ সাময়িক —অক্সিজেন ফুরোবেই—মৃত্যু আবার শ্বাসরোধ ঘটাবে। তবুও পরমায়ুটা আরো কয়েক ঘণ্টা বেড়ে গেল, সে আনন্দ বড় কম নয়। জীবনকে নতুন করে ফিরে পাওয়ার মধ্যে যে এত উল্লাস তা তো আগে কখনো টের পাইনি ফুসফুসের বোঝা কমে গেল, মাথার মধ্যে খামচে ধরা ভাবটাও মিলিয়ে গেল, প্রশান্ত অবসাদের সুমিষ্ট

অনুভূতিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুড়িয়ে গেল। একই ওষুধে সামারলিও চাঙা হলেন। তারপর লর্ড জন। তিনি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে টেনে তুললেন আমাকে। চ্যালেঞ্জারও বউকে ধরে নিয়ে বসিয়ে দিলেন সোফায়।

স্বামীর হাত ছাড়লেন না পতিপ্রাণ স্ত্রী। বললেন—"জর্জ, কেন বাঁচালে আমাকে? কি ভালই না লাগছিল! মরার মধ্যে এত সুখ তুমি ঠিকই বলেছিলে, মৃত্যুর পথ ঝলমলে ঝালরে ঢাকা। দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভাবটা চলে যেতেই কি আরাম কি ভালই না লাগছিল। কেন ফিরিয়ে আনলে জর্জ?"

"একসঙ্গে যাব বলে। একসঙ্গে থেকেছি অনেক বছর। যাওয়ার সময়ে ছাড়াছাড়ি হতে চাইনা বলে।"

নতুন এক চ্যালেঞ্জারকে দেখলাম সেই মুহূর্তে। চকিতের মধ্যে যেন উদ্ধত, গোঁয়ার, গলাবাজ চ্যালেঞ্জার অন্তর্হিত হয়েছেন—এ আর এক চ্যালেঞ্জার। আগের চ্যালেঞ্জার মানুষকে যেমন অবাক করেছে, তেমনি অপমানও করেছে। কিন্তু নতুন এই চ্যালেঞ্জার থ করে দিল আমাকে। এই চ্যালেঞ্জারই আসল চ্যালেঞ্জার—একদম ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা চ্যালেঞ্জার—রমণীর প্রেম অর্জনে যিনি সফল হয়েছেন। পলকের জন্যে দেখলাম আসল চ্যালেঞ্জারের নিবিড় মূর্তি। পরের মুহূর্তেই পাল্টে গেল প্রগাঢ় মুখচ্ছবি। ফিরে এল শক্তিমান ক্যাপ্টেন।

কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হল বৈজ্ঞানিক বৈজয়ন্তী এবং অপরিসীম উল্লাস। বললেন ছাদ কাঁপানো গলায়—"একা আমিই মানুষ জাতটার আসন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত নিয়ে ভবিষদ্‌বাণী করেছি। সামারলি, বর্ণালির কালো রেখা নিয়ে আমার অনুমান যে মিথ্যে নয়, এতক্ষণে তা বিশ্বাস হয়েছে কি? না কি এখনো দ্বিমত আছে? টাইম্‌স্‌ কাগজের চিঠিখানাও নিশ্চয় অলীক কল্পনা নয়।"

জীবনে বোধহয় সেই প্রথম চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে অক্ষম হলেন

খিটখিটে সামারলি। কথা বলবেন কি, ভদ্রলোক তখনো খাবি খাচ্ছেন। হাত-পা এলিয়ে বসেই আছেন। পৃথিবী গ্রহটার ওপরে এখনও যে তিনি বর্তমান, সেই সত্যটা যাচাই করতেই ব্যস্ত। অক্সিজেন টিউবের কাছে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দিলেন চ্যালেঞ্জার। হিস্ হিস্ শব্দটা কমে এল।

"গ্যাসের খরচ বাঁচানো যাক। ঘর এখন অতি-অক্সিজেনে ভরপুর। কেউ আর কষ্ট পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। এখন এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখা যাক ঠিক কতখানি অক্সিজেন বাতাসে মিশিয়ে রাখলে বিষকে নিষ্ক্রিয় রাখা যাবে।"

মিনিট পাঁচেক উত্তেজিত উৎকণ্ঠায় কাটল। প্রত্যেকেই সজাগ যে-যার অনুভূতি নিয়ে। হঠাৎ মনে হল যেন মাথার মধ্যে আবার চাপ বাড়ছে। সেই মুহূর্তে মিসেস চ্যালেঞ্জার বললেন, জ্ঞান হারাচ্ছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে বেশী অক্সিজেন ছেড়ে দিলেন চ্যালেঞ্জার।

বললেন—"প্রাগ বৈজ্ঞানিক যুগে সব সাবমেরিনেই সাদা ইঁদুর রাখা হত। বাতাসে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে আগে টের পেত সাদা ইঁদুর—পরে নাবিকরা। তুমিই আমাদের সাদা ইঁদুর। গ্যাস এখন বেশী বেরোচ্ছে—ভাল লাগছে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে হয়ত সঠিক মিক্সচার এইটাই। ঠিক কতটুকু দরকার, সেটা বার করতে পারলেই কতক্ষণ বাঁচব, তাও জানা যাবে। প্রথম দিকে একটু বেশীই খরচ করে ফেলেছি প্রাণের ভয়ে।"

"তাতে কি এসে যায়?" জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত পুরে বললেন লর্ড জন। "মরতেই যদি হয় তো অযথা আরও কিছুক্ষণ বেঁচে থাকবার দরকার কি? তাতে কি একেবারে বাঁচা যাবে? শেষ মুহূর্তে বাঁচবার সুযোগ কি আশা করছেন?"

হেসে ফেললেন চ্যালেঞ্জার। মাথা নেড়ে বললেন—"তবে কি

বলেন মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে আত্মসম্মান বাড়বে? তাই যদি ঠিক হয় তো বলুন, প্রার্থন -টার্থনা সেরে নিয়ে অক্সিজেন বন্ধ করে দিয়ে জানলা খুলে দিই।"

"তাই দিলেই তো হয়," মিসেস চ্যালেঞ্জারের বুকের পাটা আছে বটে। "লর্ড জন ঠিকই বলেছেন। মরলে এখুনি মরব।"

"কক্ষনো না! ঘোর আপত্তি আছে আমার।" কম্পিত কণ্ঠে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন সামারলি। "মরলে সবাই মরব। কিন্তু মৃত্যুকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আনাটা ডাহা আহাম্মুকি।"

"তরুণ বন্ধুর মতটা জানতে পারি?" শুধোলেন চ্যালেঞ্জার।

"শেষ পর্যন্ত দেখব।"

"আমিও তাই বলি। শেষ না দেখে মরব না।" সায় দিলেন চ্যালেঞ্জার।

"তাহলে আমিও তাই বলব। তোমার মতই আমার মত", সহর্ষে বললেন গৃহিণী।

"বেশ, বেশ, তবে তাই হোক," সায় দিলেন লর্ড জনও। "কথাটা বলেছিলাম স্রেফ তর্কের খাতিরে। তবে সবাই মিলে যদি ঠিক করেন শেষ পর্যন্ত দেখে যাওয়ার, আমিও আছি সবার সঙ্গে। জীবনে অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছি, অনেক রোমাঞ্চ পেয়েছি, অনেক মৃত্যুকে পাশ কাটিয়েছি—কিন্তু এত রোমাঞ্চ এত শিহরণ এত অ্যাডভেঞ্চার কখনো পাইনি। এবং এই পাওয়াই হোক আমার শেষ পাওয়া।"

"জীবন তাহলে প্রলম্বিত হোক" ঘোষণা করলেন চ্যালেঞ্জার।

"অত বড় কথা না বললেই কি নয়? বেশী আশা হয়ে যাচ্ছে না?" খেঁকিয়ে উঠলেন সামারলি।

স্থির দৃষ্টির নীরব ধিক্কারে সতীর্থকে যেন দগ্ধ করে ফেললেন চ্যালেঞ্জার।

বললেন দরাজ কণ্ঠে—"জীবন তাহলে প্রলম্বিত হোক। স্থূল-স্তর আর সূক্ষ্ম-স্তরের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কি সুযোগ-সুবিধে জুটবে, সে,

বৃত্তান্ত আমরা কেউ জানি না। কিন্তু স্থূলতম ব্যক্তিরও জানা আছে (বলেই অর্থপূর্ণ চোখে নিরীক্ষণ করলেন সামারলিকে) জড় শরীরেই জড় বস্তুর ধর্ম পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। কাজেই জীবনকে প্রলম্বিত করা মানেই বাড়তি ঐ কটি ঘণ্টায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এ-হেন বিষম সংকট সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া। এ সুযোগ ব্রহ্মাণ্ডের কেউ পায়নি—পাবেও না। মূল্যহীন সেই সময়টুকুর এতটুকুও বাজে খরচা চরম মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়।"

"একমত। আমিও একমত।" গলা ফাটিয়ে সায় দিলেন সামারলি।

"সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল," বললেন লর্ড জন। "ভাল কথা, আপনার ড্রাইভার বেচারী কিন্তু নিচের তলায় মরতে বসেছে; ওকে ওপরে আনার দরকার আছে কি?"

"পাগল নাকি?" আবার তারস্বরে বাধা দিলেন সামারলি।

"মানছি," বললেন লর্ড জন। "জীবন্ত তুলে আনতে পারব কিনা সন্দেহ, কিন্তু গ্যাস খরচ হবে অনেকখানি।—গাছের দিকে দেখুন। পাখীদের অবস্থাটা দেখুন!"

চেয়ার টেনে নিয়ে জানলার সামনে বসলাম চারজনে। মিসেস চ্যালেঞ্জার পেছনের সোফায় এলিয়ে রইলেন। নিঃশ্বাসের বাতাস অতিমাত্রায় বদ্ধ আর ভারী হয়ে ওঠার জন্যেই বোধহয় সেই মুহূর্তে একটা কিম্ভূতকিমাকার দানবিক কল্পনা মাথাচাড়া দিল মগজের মধ্যে। বিশ্ব-নাটকের শেষ দৃশ্যের একমাত্র দর্শক বুঝি আমরা চারজন —বসে আছি একদম সামনের সারিতে।

জানলার নিচেই ছোট্ট উঠোনে দাঁড়িয়ে আধ-ধোওয়া মোটর-গাড়িটা। সত্যিই শেষ পর্যন্ত চাকরী খতম হয়েছে অস্টিনের। গাড়ীর পাশেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে সে মাটির ওপর। কপালে একটা কালসিটের দাগ। জ্ঞান হারিয়ে পড়বার সময় হয়ত গাড়ীর পাদানিতে লেগেছে। হাতে হোস পাইপের মুখ—গাড়ী

ধুচ্ছিল এই পাইপ হাতেই। উঠোনেব কোণে দুটো ছোট গাছ গাছের তলায় অনেকগুলো তুলোর ডেলার মত পালকের বল— প্রতিটির মাঝে ছোট ছোট একজোড়া পা শূন্যে উত্থিত, মহামৃত্যুর কাস্তের ঘায়ে ছোট-বড় কেউ বাদ যায়নি।

উঠোনের পাঁচিলের ওপর দিয়ে তাকালাম স্টেশন যাওয়ার রাস্তার দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে পাক খেয়ে একদম নিচে পৌঁচেছে পথটা। ঠিক সেইখানে এদিকে ওদিকে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে কয়েকটা দেহ। চাষীদের দেহ। এরাই একটু আগে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে আসছিল ক্ষেত ছেড়ে। তারও ওদিকে ঘাসে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে আয়া ...কাঁখে একটি বাচ্চা—পেরামবুলেটর থেকে তুলে কোলে নিয়েছিল—একদম নড়ছে না। একটু দূরেই অন্য ছেলেটা ঘাসে লুটিয়ে পড়েছে। বাড়ীর কাছেই ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়াটা নিষ্প্রাণ দেহে ঝুলছে কাঠের জোয়াল ডাণ্ডা থেকে। বুড়ো কোচোয়ান কিম্ভূতকিমাকার কাকতাড়ুয়া মূর্তির মত ঘাড় গুঁজে বসে গাড়ীর ছাদে হাতদুটো ঝুলছে দুপাশে। জানলার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে একজন তরুণ আরোহীকে। দরজা খোলা, হাতটা হাতলের ওপর, শেষ মুহূর্তে যেন লাফিয়ে বাইরে আসতে চেয়েছিল। মাঝামাঝি দূরত্বে গল্ফ মাঠে পড়ে অনেকগুলো নিথর দেহ। বিশেষ একটা সবুজ অঞ্চলে পাশাপাশি শুয়ে আটজন খেলোয়াড় -মৃত্যুর মুহূর্তেই খেলা শুরু হয়েছিল নিশ্চয়। আকাশের নীল খিলেনে উড়ছে না পাখী দিগন্ত বিস্তৃত নিসর্গ দৃশ্যে নড়ছে না কোন প্রাণী। স্বর্গে মর্তে প্রাণ বলে আর কিছুই নেই মহান মৃত্যুর পরম প্রসাদে। পড়ন্ত রোদের আলোয় শান্তি বিরাজিত সর্বত্র, পাশাপাশি প্রকটিত বিশ্বমৃত্যুর নিথরতা ও নিস্তব্ধতা। এ মৃত্যুর খপ্পরে আমাদের প্রাণও সঁপে দিতে হবে আর একটু পরেই। আপাততঃ বাইরের ইথারের বিষ আর ঘরের অক্সিজেন সমৃদ্ধিকে আলাদা করে রেখেছে একটিমাত্র পাতলা কাঁচের সার্সি—ভঙ্গুর,

পলকা কাঁচ—নিষ্ঠুর নিয়তিকে ঠেকিয়ে রেখেছে কিছুক্ষণের জন্যে। মৃত্যু-মরুর মাঝে এহেন জীবন-মরুদ্যানের স্রষ্টা কিন্তু একজনই—প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। তাঁর দূরদৃষ্টির দৌলতেই বিশ্বব্যাপী মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছি আমরা ক'জন। কিন্তু গ্যাস ফুরোবেই, প্রাণ হারিয়ে সাজঘরের চেরী রঙের গালিচায় লুটিয়ে পড়ব সকলেই, সম্পূর্ণ হবে মানুষ জাতটার এবং যাবতীয় পার্থিব প্রাণের ললাট-লিখন। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কথা বলতে পারলাম না। স্তব্ধ বিষণ্ণ চোখে চেয়ে রইলাম নিষ্প্রাণ বিশ্বের পানে

"একটা বাড়ীতে আগুন লেগেছে দেখছি" বললেন চ্যালেঞ্জার। আঙুল তুলে দেখালেন দূরে গাছের মাথায় ধোঁয়া উঠছে। "এরকম অগ্নিকাণ্ড আরো অনেক ঘটছে। অনেক বাড়ী, অনেক শহর পুড়ছে। জ্বলন্ত আগুন হাতে হঠাৎ মরলে ঘরে আগুন তো লাগবেই। আগুনের চেহারা দেখে কিন্তু একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল। বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ কমেনি—যত গণ্ডগোলের মূল ঐ ইথার। আরে! আরে! ক্রোবরো হিলের মাথায় আর একটা আগুন লেগেছে! গল্‌ফ্ ক্লাব হাউস পুড়ছে নিশ্চয়। ঐ শুনুন গির্জের ঘণ্টাও বাজছে। মানুষের হাতে গড়া যন্ত্র যে মানুষের মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকতে পারে, এ খবর দার্শনিকদের কানে পৌঁছোনো দরকার ছিল।"

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন লর্ড জন—"কী সর্বনাশ! গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে কোত্থেকে? আরে! আরে! এযে দেখছি চলন্ত ট্রেন!"

চলন্ত ট্রেনই বটে। প্রথমে শুনলাম গুমগুম শব্দ। তারপরেই নক্ষত্র বেগে দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হল চলমান লৌহদানব। কোত্থেকে এল, যাবেই বা কোথায়, কিছুই জানার উপায় নেই। দৈব সহায় না হলে এ গাড়ীর বেশীদূর যাওয়ার কথা নয়। এতদূর যে বিনা দুর্ঘটনায় এসেছে এই যথেষ্ট—কিন্তু আর বেশীদূর যেতে হবে না। লাইনে দাঁড়িয়ে কয়লা বোঝাই একটা মালগাড়ী। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে

দেখলাম ঠিক সেই লাইনেই উল্কা বেগে পড়ল ধাবমান এক্সপ্রেস ট্রেন। তারপরেই ভয়ংকর সংঘর্ষে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাঠ, কয়লা, ইস্পাত, খণ্ডবিখণ্ড নবদেহ। ইঞ্জিন আর মালগাড়ী এমনভাবে গেঁথে গিয়ে এক হয়ে গেল যে আলাদা করে আর চেনা গেল না। নিমেষে আগুন লাগল কাঠ, কয়লা আর ইস্পাতের সেই ভগ্নস্তূপে। বিস্ফারিত চোখে আধঘন্টা ধরে দেখলাম লেলিহান অগ্নিশিখার উন্মত্ত নৃত্য।

অবশেষে আর সহ্য করতে পারলেন না মিসেস চ্যালেঞ্জার। স্বামীর বাহুমূলে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠলেন ডুকরে—"আহারে! অতগুলো মানুষ!"

"কেঁদো না", স্ত্রীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কোমল কণ্ঠে বললেন চ্যালেঞ্জার—"ওরা কেউ নতুন করে মরেনি। কয়লার মতই ওরাও নিষ্প্রাণ হয়েই ছিল—দেহগুলোও এখন সেই কার্বনেই রূপান্তরিত হচ্ছে। ভিক্টোরিয়া থেকে বেরিয়েছিল জ্যান্তদের নিয়ে - ধ্বংস হল মড়াদের নিয়ে।"

অভিভূত কণ্ঠে আমি বললাম —"পৃথিবীতে সর্বত্র তাহলে একই কাণ্ড ঘটছে। চলন্ত জাহাজের চলন যদি মারা যায়, ফার্নেস না নেভা পর্যন্ত অথবা তীরে আছড়ে না পড়া পর্যন্ত সে জাহাজ ভেসেই চলবে দরিয়ায়। পালতোলা মালজাহাজের মাল খালাস হবে না, মরা খালাসীদের সদ্গতিও হবে না। কাঠ পচে যাবে, জোড় খুলে যাবে, একে একে ডুবে যাবে সমুদ্রে একশ বছর পরেও হয়ত দেখা যাবে গোটা আটলান্টিক জুড়ে ভাসছে পচা কাঠের ভাঙাচোরা জাহাজ।"

বিষণ্ণ শুষ্ক হেসে সামারলি বললেন—"কয়লা খনির শ্রমিকরা কয়লা হয়ে যাবে আজ থেকে বহু লক্ষ বছর পরে। ভূতত্ত্ববিদরা তখন অবাক হয়ে যাবেন অঙ্গারীভূত কঠিন শিলাময় অবস্থায় মানুষকে দেখে। ভূতত্ত্ববিদ বলে কোন জীব সে-সময়ে পৃথিবীতে নাও থাকতে

পারে। যদি থাকে, কার্বনিফেরাস স্তরে মানুষ থাকবে কেন, এই নিয়ে হয়ত বিস্তর উদ্ভট অনুমিতির সৃষ্টি হবে বৈজ্ঞানিক মহলে।"

লর্ড জন বললেন—"আমার তা মনে হয় না। পৃথিবীতে কেউ আর থাকবে না, কেউ আর জন্মাবে না। সব মানুষই যদি খতম হয়ে যায় তো আবার মানুষ জন্মাবে কি করে? শূন্য পৃথিবীতে প্রাণ আসবে কি করে?"

জবাবটা দিলেন চ্যালেঞ্জার। বললেন—"পৃথিবী তো আগে শূন্যই ছিল। যে নিয়মের অধীন আমরা সবাই, সেই নিয়মের নির্দেশেই শূন্য পৃথিবী ভরে উঠেছিল মানুষ, প্রাণী, পাখীর ভিড়ে।"

"ভায়া চ্যালেঞ্জার, কথাটা কি আপনি মন থেকে বলছেন?"

"প্রফেসর সামারলি, মনে যা ভাবি না, মুখে তা বলার অভ্যেস অন্ততঃ আমার নেই," বলতে বলতেই বল্লমের মত দাড়ি এগিয়ে এল সামনে, চোখের পাতা এল নেমে। খেপেছেন প্রফেসর। বাকযুদ্ধ শুরু হল বলে।

"মলেও আপনার স্বভাব পাল্টাবে না। প্রমাণ ছাড়াই গলাবাজি করে গেলেন চিরটা কাল—করছেন মরবার সময়েও," তেঁতো গলায় তক্ষুনি জবাব দিলেন সামারলি।

"চরিত্র আপনারও পাল্টাবে না। কল্পনার ক্ষমতা নেই, কিন্তু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে এসেছেন চিরটা কাল—বদ্ধ কূপেই আবদ্ধ রইল কল্পনাশক্তি—বেরোতে পারলেন না।"

আর যায় কোথা, সামারলির গলায় যেন বাজ ডাকল—"কল্পনাশক্তির অভাব অবশ্য আপনার কখনো ঘটেনি—আপনার অতিবড় ছিদ্রান্বেষীও এই অপবাদ আপনাকে দেবে না।"

"আরে গেল যা!" রেগে গেলেন লর্ড জন, "খামোকা গালাগাল দিয়ে অক্সিজেন খরচ করছেন কেন? মানুষ আবার জন্মালেই বা কি, না জন্মালেই বা কি? আমরা তো তখন থাকব না।"

"দেখুন মশাই!" অমনি কড়া গলায় ধমকে উঠলেন চ্যালেঞ্জার

"আপনার দৌড় কতখানি, বেফাঁস বলে তা প্রকাশ করে ফেললেন। খাঁটি বৈজ্ঞানিক মন কখনো নিজের দেশ ও সময়ের বাঁধনে বাঁধা থাকে না। বর্তমানে সীমান্তে দাঁড়িয়ে মানমন্দির থেকে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের মত অনন্ত অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। অভিযান চালায় সেইদিকে যেখানে সৃষ্টির শুরু, অথবা যেখানে সব কিছুর শেষ। শেষ পর্যন্ত পদ্ধতি মাফিক কাজ চালিয়ে যাওয়াই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের লক্ষণ—মৃত্যুকে বরণ করে কাজ করতে করতেই। জড় জগতের মধ্যে নিজের নশ্বর দেহটাও শেষ পর্যন্ত মিশে একাকার হয়ে গেল কিনা, তুচ্ছ সেই ভাবনা নিয়ে কখনো নিজেকে খাটো করে না। প্রফেসর সামারলি, ঠিক বলিনি?"

মুখ গোঁজ করে ঘরঘরে গলায় সায় দিলেন সামারলি—"পুরোপুরি নাহলেও মোটামুটি ঠিক।"

চ্যালেঞ্জার কিন্তু থামলেন না। বললেন—"আদর্শ বৈজ্ঞানিক মন তাকেই বলে যে মন বেলুন থেকে পড়তে পড়তে মাটিতে আছাড় খাওয়ার আগেও কঠিন সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারে। প্রকৃতিকে হারিয়ে দিয়ে সত্যকে আগলাতে পারবে কেবল এঁরাই।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে লর্ড জন বললেন—"প্রকৃতি কিন্তু হারেনি। সবার ওপরে ছিল, এখনো রয়েছে। যদিও গালভরা কথায় ভরা অনেক প্রবন্ধ পড়েছি এ সম্পর্কে।"

দৃঢ়কণ্ঠে চ্যালেঞ্জার বললেন—"পরাজয়টা সাময়িক। মহাকালের গর্ভে কয়েক লক্ষ বছর কি খুব বেশী সময়? দেখতেই পাচ্ছেন, উদ্ভিদ জগৎ বেঁচে আছে। গাছের পাতাগুলোই দেখুন না কেন। পাখীরা মরেছে, কিন্তু গাছপাতা তরতাজা রয়েছে। পুকুর আর জলার গাছপালার প্রাণ থেকেই একসময়ে অণুবীক্ষণে দেখা যায় যায় এমনি সব প্রাণের কণা জন্মাবে; এরাই কিন্তু এককালে উন্নত প্রাণের জন্ম দিয়েছে এই পৃথিবীতে—এদের থেকেই জীবজগতের সৃষ্টি এবং পৃথিবীর শেষ প্রাণী বলতে এই যে আমরা পাঁচজন—

আমরাও ঋণী ঐ সূক্ষ্ম প্রাণকণাদের কাছে। লক্ষ লক্ষ বছর পরে আবার ফিরে আসবে তারা, খুব সামান্য অবস্থায় প্রাণ আবার জাগবে এই পৃথিবীতে—তারপরে আসবে মানুষ। বীজ থেকে মহীরুহ যে ভাবে হয়—ঠিক সেইভাবে। চাকা ঘুরবে—যে ভাবে ঘুরে আসছে অনন্ত কাল ধরে।"

"কিন্তু ইথারের বিষ কি প্রাণকে টিকতে দেবে? অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেবে না?" বললাম আমি।

"বিষ ছড়িয়ে আছে হয়ত ইথারের সামান্য এক জায়গায়—আমরা ভাসছি ইথারের মহাসমুদ্রে। অথবা বিষকে সইয়ে নেবে নতুন প্রাণের ধারা। আমরাই তো অতি-অক্সিজেনের কল্যাণে বেঁচে আছি—বিষ নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে রক্তে ঢুকেও। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে টিঁকে থাকার জন্যে জীবজগৎকে খুব একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না।"

গাছের ওদিকে ধূমায়িত বাড়ীটায় এবার আগুন লকলক করছে। আকাশ ছুঁতে চাইছে লম্ফমান অগ্নিশিখা।

"কী ভয়ংকর!" লর্ড জনকে এরকম বিহ্বল হতে কখনো দেখিনি।

"ভয়ংকর কেন?" বললাম আমি। "পৃথিবীর মৃত্যু হয়েছে। সৎকার হবে না? কবর দেওয়ার চাইতে দাহ করা অনেক ভাল।"

"এ বাড়িতেও যদি আগুন লাগে? জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে যে।"

"সে পথ আগেই বন্ধ করেছি," বললেন চ্যালেঞ্জার। "সম্ভাবনাটা মাথায় এসেছিল। স্ত্রী-কে বলেওছিলাম। উনি ব্যবস্থা করেছেন।"

"ভয় নেই। আগুন লাগবে না," বললেন চ্যালেঞ্জার গৃহিনী। "কিন্তু জর্জ, মাথাটা যে আবার দপদপ করছে। নিঃশ্বেস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।"

"তাহলে অক্সিজেন ছাড়া যাক," বলে সিলিণ্ডারের চাবিতে হাত দিলেন চ্যালেঞ্জার। "যাচ্চলে, এটা তো খালি হয়ে এসেছে

দেখছি। চলেছে অবশ্য তিনঘণ্টা। এখন আটটা বাজে। তার মানে রাতটা ভালই কাটবে। কাল সকাল নটা নাগাদ মরব সবাই। সূর্যকে আর একবারই উঠতে দেখব—দেখব শুধু আমরা পাঁচজন।"

দ্বিতীয় টিউবের মুখ খুলে দিলেন চ্যালেঞ্জার। দরজার মাথায় ফ্যান লাইটটা একটু ফাঁক করলেন। ঝুরঝুরে হাওয়ায় ঘরের বদ্ধ বাতাস হাল্কা হয়ে এল বটে, কিন্তু নিঃশ্বাসের কষ্ট বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ফ্যানলাইট বন্ধ করে দিলেন চ্যালেঞ্জার।

বললেন—"শুধু অক্সিজেন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে না। খেতেও হয়। খাবার সময়ও হয়েছে। ঘরের মধ্যে স্টোভ জ্বালানো মানেই অক্সিজেনের অপচয়। সুতরাং শুকনো খাবারই খাওয়া যাক - সে ব্যবস্থাও করে রেখেছে আমার গিন্নী। কই গো চ্যালেঞ্জারদের রাণী, খেতে-টেতে দাও অতিথিদের।"

মিনিট কয়েক লাগল চ্যালেঞ্জার-জায়ার। ঘরকন্নায় পটু হাতে সাদা চাদর বিছিয়ে ঠাণ্ডা মাংস, রুটি, আচার আর একবোতল মদ রাখলেন টেবিলে। মুখ নির্বিকার। প্রাণ ঢেলে অতিথি সৎকারের আমেজ চোখে মুখে, খাবার আয়োজন সামান্য হলে ত্রুটি নেই আন্তরিকতায়। মাঝে রইল একটা ইলেকট্রিক টর্চল্যাম্প। খেতে বসে দেখি অবাক কাণ্ড। এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও পেটে যেন আগুন জ্বলছে।

চ্যালেঞ্জার তক্ষুণি বোঝাতে বসলেন রাক্ষুসে ক্ষিধের কারণটা। তুচ্ছ ঘটনাকেও বিজ্ঞানের আলোয় ব্যাখ্যা করবার অভ্যেস তাঁর চিরকালের। বললেন "দারুণ সংকট পেরিয়ে এসেছি—আবেগ-উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছেছে— দেহের অণুগুলো জখম হয়েছে—মেরামত দরকার। খুব দুঃখ অথবা খুব আনন্দের পর তাই এত ক্ষিধে পায়—ঔপন্যাসিকরা যা লেখেন তা ভুল—ক্ষিধে মোটেই উড়ে যায় না।"

বললাম—"সেই জন্যেই কেউ মরলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর ভো সভার আয়োজন করে গাঁয়ের লোকেরা ?"

"খাঁটি বলেছো, চমৎকার দৃষ্টান্ত। এসো, আর একটা জিভে মাংস নাও।"

লর্ড জন গোমাংস কাটতে কাটতে বললেন—"বর্বররাও কিং শোকতাপে বেশী খায়। আরুইমি নদীতে একবার দেখেছিলাম জংলীরা সর্দারকে গোর দিয়ে এসেই আস্ত একটা জলহস্তী খাচ্ছে নিউগিনির জংলীরা শোকে ভেঙে পড়ে যে মরেছে তাকেই খেয়ে নেয়। তবে যত রকম ভোজ উৎসব পৃথিবীতে দেখা গেছে আজ পর্যন্ত তার মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র হল এই মুহূর্তের খাওয়া।"

মিসেস চ্যালেঞ্জার খেতে খেতে বললেন—"আমার কিন্তু কারো জন্যে দুঃখ হচ্ছে না। বেডফোর্ডে বাবা মা থাকেন। জানি তাঁরা নেই, কিন্তু একদম কান্না পাচ্ছে না। কারোর জন্যেই বুকের ভেতর মোচড় দিচ্ছেনা। অথচ জানি পৃথিবীতে কেউ আর বেঁচে নেই।"

আমি বললাম -"আমার মা-ও আর নেই। মনের চোখে দেখছি, আয়ার্ল্যাণ্ডের কটেজে জানলার ধারে গায়ে শাল জড়িয়ে উঁচু-পিঠ চেয়ারে চোখ বুঁজিয়ে বসে আছে আমার বুড়ি মা। কোলের ওপর লেসের টুপী, পাশে চশমা আর বই। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে না। কেন হবে? যে লোকে মা গেছে, সেই লোকে আমিও যাচ্ছি। সেখানে হয়ত আরো কাছাকাছি থাকব দু'জনে— আয়ার্ল্যাণ্ড ইংলণ্ডের দূরত্ব আর থাকবে না। মনটা খারাপ লাগছে শুধু সেই দেহটা আর থাকবে না বলে।"

"দেহের কথাই যদি বলো", জবাবের জন্যে চ্যালেঞ্জার যেন তৈরী হয়েই ছিলেন—"তাহলে বলব তুমি কি হাত পায়ের নখ না মাথার চুল যে কাটবার পর দুঃখ করো? যার একখানা পা নেই, সে-ও কি হারানো পায়ের শোকে নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়? যত কষ্টের মূল এই শরীরটা। যত ক্লান্তি যত রোগ এই শরীরেই—ক্রমাগত মনে

ফুরিয়ে দেয় দৌড় আমাদের বেশী দূর নয়—হতে পারে না। সুতরাং সূক্ষ্ম দেহটা যদি এদেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, দুঃখ কিসের?”

“হলে নিশ্চয় দুঃখ কমত”, বাঁকা গলায় মন্তব্য করলেন সামারলি। “সে কথা থাক, বিশ্ব-মৃত্যু সত্যিই ভয়াবহ।”

“আগেই কিন্তু বলেছি”, চ্যালেঞ্জারও চুপ করে থাকার পাত্র নন—“বিশ্ব-মৃত্যু একক মৃত্যুর চেয়ে অনেক কম ভয়াবহ।”

“কথাটা যুদ্ধক্ষেত্রেও খাটে”, বললেন লর্ড জন—“ঘরের মধ্যে মাথায় গুলি আর বুকে ছোরাবেঁধা অবস্থায় একজনকেও দেখলে মানুষ চমকে ওঠে—বুক ধড়ফড় করে। কিন্তু ময়দানে হাজার হাজার লোককে ঐভাবে মরে পড়ে থাকতে দেখেও নির্বিকার থেকেছি। ইতিহাস রচনায় হাজার হাজার মানুষ মারা পড়ে—একজনের মৃত্যু নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আজকে তার চাইতেও বড় ঘটনা ঘটল। কোটি কোটি প্রাণ শেষ হয়ে গেল—তাই নিজের নিজের আত্মীয়ের জন্য প্রাণ আর কাঁদছে না।”

“ভগবান করুন আমরাও যেন ভালোভাবেই শেষ হয়ে যাই”, বললেন চ্যালেঞ্জার গৃহিণী। “জর্জ, এবার কিন্তু ভয় করছে।”

“সেই মুহূর্ত যখন আসবে, তখন আর ভয় থাকবে না—তোমার সাহস ছাপিয়ে উঠবে আমাদের সবার সাহসকে। দেখবে তোমার এই গলাবাজ স্বামীটি যা ছিল শেষ পর্যন্ত তাই থাকছে। অনেক জ্বালিয়েছি, এবার পাবে রেহাই। দোষটা কিন্তু আমার একার নয় - তোমারও। অন্য কোন পুরুষকে তো তুমি চাওনি।”

“চাইনি, চাই না, চাইব না—দুনিয়ায় তোমার জায়গায় বসবার যোগ্যতা আর কারো নেই,” বলতে বলতে পেলব কোমল বাহু দিয়ে স্বামীর বলীবর্দ-স্কন্ধ জড়িয়ে ধরলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। আমরা তিনজনে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। অবাক হয়ে গেলাম দূরের দৃশ্য দেখে।

অন্ধকারে ঢেকে গেছে দিগন্তব্যাপী ধূ-ধূ শূন্যতা। কিন্তু দক্ষিণ

দিগন্ত লাল হয়ে গেছে লকলকে অগ্নিশিখায়। রাঙা শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আকাশ পানে—মাঝে মাঝে কমে এসে জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে দিগন্ত রাঙিয়ে তুলছে। "লুইজ পুড়ছে।" অস্ফুট চীৎকারে বললাম আমি, "না, পুড়ছে ব্রাইটন", পেছন থেকে এসে পাশে দাঁড়ালেন চ্যালেঞ্জার। "আগুনের সামনে ঢেউ খেলানো মাঠ দেখা যাচ্ছে। অনেক পেছনে জ্বলছে আগুন। গোটা শহরটাই পুড়ছে মনে হচ্ছে।"

অন্ধকারে এখানে সেখানে দু চারটে আগুন দেখা যাচ্ছিল বটে, বিধ্বস্ত রেলকামরা থেকেও ধোঁয়া উঠছে এখনো, কিন্তু দক্ষিণ দিগন্তের দাবানলসম এই বিপুল অগ্নিকাণ্ডের তুলনায় সে সব জোনাকির আলো ছাড়া কিছুই নয়। এই দৃশ্যের বিবরণ যদি গেজেট কাগজে ছাপানো যেত, হৈ-হৈ পড়ে যেত সারা দেশে। এ-হেন চমকপ্রদ ঘটনার সাক্ষী থাকার সুযোগ কখনো কোন সাংবাদিকের বরাতে জুটেছে কি? সাংবাদিকতার পরাকাষ্ঠা দেখানোর সুযোগ সামনেই বর্তমান, অথচ তার আদর করার মানুষ আর পৃথিবীতে নেই। এই কথা ভাবতে ভাবতেই আচমকা ঘটনা দেখলেই তা টুকে রাখবার পুরোনো অভ্যাস মাথা চাড়া দিল মনের মধ্যে। হৃদপিণ্ডের শেষ স্পন্দন পর্যন্ত এই ক'জন বৈজ্ঞানিক যদি বিজ্ঞানের সাধনায় তন্ময় থাকতে পারেন, সাংবাদিক হিসেবে আমার নগণ্য কর্তব্যই বা অসম্পূর্ণ থাকে কেন? কেউ তা পড়বে না জানি, কিন্তু সারারাত একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো। চোখে ঘুম আসবেনা—আমি অন্ততঃ ঘুমোতে পারব না। কিন্তু লিখতে শুরু করলে সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলব।—নোট বুকের পাতায় পাতায় তাই এই কাহিনীই লিখছি হাঁটুর ওপর রেখে। ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসা টর্চের ম্লান আলোয় ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। সাহিত্যিক প্রতিভা থাকলে এ জিনিস সুখপাঠ্য হত। তবে ভয়ংকর সেই রাতের আবেগ-ঘন নিবিড় উৎকণ্ঠা বোধহয় সঞ্চারিত করতে পারব অন্যের অন্তরে।

৪। মরণ পথিকের দিনপঞ্জী

ডায়েরীর শূন্য পৃষ্ঠার মাথায় লেখা শব্দগুলো দেখে কিন্তু নিজেরই অদ্ভুত লাগছে! যত অদ্ভুতই হোক না কেন, কথাটা আমিই লিখেছি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি—এডোয়ার্ড ম্যালোন—মাত্র বারো ঘণ্টা আগে যে স্ট্রেটহ্যামের বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি কি ভয়ানক কাণ্ডকারখানার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চলেছে দিন ফুরোনোর আগেই। ছবির মত পরপর দৃশ্যগুলো ভেসে যাচ্ছে মনের চোখের সামনে দিয়ে। মিঃ ম্যাক আর্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকার চিঠিতে চ্যালেঞ্জারের সতর্কবাণী, ট্রেনে আসার সময়ে সৃষ্টিছাড়া আচরণ, মনের সুখে খাওয়া, বিশ্ব বিপর্যয়, এবং এখন নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে মাত্র পাঁচটি প্রাণীর সহাবস্থান। একটি মাত্র ঘরে মুখোমুখি বসে আমরা মৃত্যুর পথ চেয়ে আছি। মরণ আসবেই—কোন সন্দেহই নেই তাতে। তাই নিজেকে এখনই মনে হচ্ছে মৃত। এ যেন মৃতের জবানী। নিছক পেশাগত অভ্যাসের দরুন লিখে গেছে পাতার পর পাতা—মনুষ্যচক্ষু কোন দিনই সে লেখায় নিবদ্ধ হবে না জেনেও লিখেছে—জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সে জেনেছে প্রাণপ্রিয় এই কজন বন্ধুর বাইরে জীবিত মানুষ আর নেই—জেনেও লিখেছে। চ্যালেঞ্জারের কথাগুলো যে কতদূর খাঁটি, এখন তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। তিনি বলেছিলেন, প্রকৃত ভয়াবহতা সেই মুহূর্তেই মনকে পঙ্গু করে তুলবে যখন জানব পৃথিবীতে আমরা এই কজন ছাড়া কোন প্রাণী নেই। ধরনীর সব সুন্দর সৎ বস্তুই অর্থহীন জড়পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। হোক, আমরা এখনও বাঁচব। শেষ মিনিট পর্যন্ত নিঃশ্বেস নিয়ে যাব। অক্সিজেনের দ্বিতীয় সিলিণ্ডারটাও খালি হতে চলেছে—আয়ুষ্কালও ফুরিয়ে আসছে অতি দ্রুত।

এইমাত্র লেকচার শেষ করলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। ঝাড়া সোয়া ঘণ্টা গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে গেলেন। ভীষণ উত্তেজিত হয়েছেন। কুইন্স হলে বিজ্ঞানের দুরূহতত্ত্ব সতীর্থদের যে ভাবে ব্যাখ্যা করেন, অবিকল সেইভাবে কড়িকাঠ কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে গেলেন এক নাগাড়ে। জ্ঞানগর্ভ এই বক্তৃতার শ্রোতা কজন কিন্তু লক্ষ্য করার মত বিচিত্র: স্ত্রী ভদ্রমহিলা একেবারেই নির্বিকার—স্বামীদেবতা যা বলছেন তার বিন্দুবিসর্গও বুঝছেন না—বোঝার চেষ্টাও করছেন না, আলো আঁধারির মধ্যে চুপটি করে বসে, মহাকুঁতুলে সামারলি মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মন দিয়ে শুনলেও ছিদ্রান্বেষী স্বভাবটা উন্মুখ হয়ে রয়েছে বক্তৃতায় খুঁত ধরবার জন্যে; লর্ড জন এককোণে এমন মুখভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে আছেন যেন বক্তৃতা শেষ হলে বাঁচেন; আমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে উদাসভাবে দেখছি শুনছি সব কিছুই কিন্তু মনে দাগ পড়ছে না—যেন স্বপ্নের ঘোরে উপস্থিত রয়েছি, নিজস্ব আগ্রহ তিল-মাত্র নেই। মাঝের টেবিলে বসে চ্যালেঞ্জার। ড্রেসিং রুম থেকে একটা মাইক্রোস্কোপ এনে রেখেছেন পাশে। বৈদ্যুতিক আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তলার স্লাইডটা। ছোট্ট গোল আয়না থেকে প্রতিফলিত সাদা আলোয় দাড়িগোঁফে ঢাকা তেজী মুখের আধখানা হারিয়ে গেছে নিবিড়তম ছায়ায়। নিম্নতম প্রাণ নিয়ে সম্প্রতি তিনি গবেষণা করছিলেন এবং এই মুহূর্তে বিষম উত্তেজিত হয়েছেন কাঁচের স্লাইডে অ্যামিবাকে জীবিত থাকতে দেখে।

দারুণ উত্তেজনায় একই কথা বারবার বলে তিনি কান ঝালাপালা করে দিয়েছেন আমাদের। কথাটা এই অ্যামিবাকে নিয়ে—"দেখুন, দেখুন, নিজের চোখে দেখুন। সামারলি, দয়া করে এসে নিজের চোখে সন্দেহ ভঞ্জন করলে হয় না? ম্যালোন, এগিয়ে এস বাবা, এগিয়ে এস, সত্যি বলছি কিনা যাচাই করে যাও। মাঝের ছোট ছোট টেকোর মত দেখতে জিনিসগুলো ডায়াটম—যে হেতু ওরা বোধহয় উদ্ভিদ—প্রাণী নয়—সেই যুক্তিতে ওদের নিয়ে নিশ্চয় মাথা ঘামাবে

না। কিন্তু ডানদিকে ঐ যে জিনিসটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে, ঐ হল অ্যামিবা। ওপরের স্ক্রু ঘুরিয়ে ফোকাসিং করে নিজের চোখেই দেখে যাও না বাপু।"

সামারলি দেখে এলেন আগে। তারপরে আমি। অতি ক্ষুদে একটা প্রাণী, যেন ঘষা কাঁচ দিয়ে তৈরী, আলোকিত বৃত্তের মধ্যে চটচটে বস্তুর ওপর ভাসছে আর নড়ছে।

লর্ড জন বিশ্বাস করলেন চ্যালেঞ্জারের কথায়। বললেন—"অ্যামিবার মরণ বাঁচন নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাবো কেন? কেউ কাউকে চিনি না। আমার কুশল নিয়ে ও কি ভাববে? মোটেই না। কাজেই ওর কুশল নিয়ে আমি নাচতে যাব কেন?"

শুনে হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে গেল। চ্যালেঞ্জার তাকালেন আমার পানে—জীবনে বোধকরি এমন ঠাণ্ডা, কঠোর উদ্ধত চোখে তিনি তাকাননি। দেখেই হাওয়া হয়ে গেল হাসির বুদবুদ—মুখে চাবী দিয়ে বসে রইলাম কাঠের পুতুলের মত। চ্যালেঞ্জার বললেন—"অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী। অশিক্ষিতের স্থূলতার চাইতে অল্প শিক্ষিতের বাচালতা বিজ্ঞানের বেশী অন্তরায়। লর্ড জন রক্সটন যদি দয়া করে তাঁর অহমিকা বর্জন করে একটু মাথা হেঁট করতেন—"

"জর্জ, অত উগ্র হচ্ছ কেন?" মাইক্রোসকোপের ওপর ঝুলে পড়া স্বামীরত্নের কালো কুচকুচে কেশরে হাত বুলোতে বললেন চ্যালেঞ্জার গৃহিণী। "অ্যামিবা বাঁচলেই বা কি, মরলেই বা কি? তাতে কি এসে যায়?"

"অনেক কিছুই এসে যায়," কটু কর্কশ স্বরে বললেন চ্যালেঞ্জার।

মোলায়েম হেসে লর্ড জন বললেন—"তাহলে তা শোনা যাক। এত কথাই যখন শুনছি, এটাই বা শুনব না কেন। যদি বলেন, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ওকে অপমান করাটা খুবই গর্হিত কাজ হয়েছে, তাহলে ক্ষমা চাইছি।" তর্কের সুরে ক্যাটকেটে গলায় সামারলি

বলে উঠলেন—"অ্যামিবা নিয়ে এত নাচানাচি কেন বুঝিনা। বেঁচে আছে তো হয়েছে কি? যে আবহাওয়ায় আমরা রয়েছি, আপনার সাধের অ্যামিবাও রয়েছে সেই আবহাওয়ায়। তাই ব্যর্থ হয়েছে বিষ। ঘরের বাইরে থাকলে অন্যান্য প্রাণীর মতই কোনকালে অক্কা পেত।"

"মাই ডিয়ার সামারলি", চ্যালেঞ্জারের কথায় ভঙ্গিমায় যেন অসীম কৃপা এবং অধস্তন ব্যক্তির প্রতি অপরিসীম সৌজন্য উপচে উঠল (আহারে! যদি আঁকতে পারতাম, মাইক্রোসকোপ-আয়নার প্রতিফলিত আলোয় উদ্ভাসিত উদ্ধত প্রভুত্বব্যঞ্জক সেই মুখখানি ঝপাঝপ এঁকে ফেলতাম!)—আপনার বক্তব্য শুনে বোঝা গেল যে বিষয়টার গুরুত্ব সম্যকভাবে অবধাবন করতে পারেন নি। এই যে নমুনাটা দেখছেন, এটাকে গতকাল স্লাইডে চাপিয়ে বাতাস আসা যাওয়ার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এ ঘরের অক্সিজেন ওর মধ্যে ঢোকেনি। কিন্তু ইথার ঢুকেছে। বিশ্বের সর্বত্র তার অবাধ গতি—সব কিছু ফুঁড়ে সর্বত্র তার যাতায়াত। সুতরাং বিষের মধ্যেও অ্যামিবা বেঁচে আছে। এই থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, যেভাবে এই অ্যামিবাটি জীবিত, সেইভাবে এই মুহূর্তে এই ঘরের বাইরে বিশ্বের সব অ্যামিবাই জীবিত – বিশ্ব-বিপর্যয় তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি এবং আপনার বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল।"

লর্ড জন বললেন—"তা না হয় হল। কিন্তু তা নিয়ে এত হিপ-হিপ-হুররে করার কি দরকার?"

"দরকার এই কারণে যে পৃথিবীটা এখনও প্রাণময়—প্রাণশূন্য নয়। বৈজ্ঞানিক কল্পনা থাকলে এখন থেকে কয়েক লক্ষ বছর পরের দৃশ্য দেখতে পেতেন। মহাকালের চোখে সময়টা এক পলক ছাড়া কিছুই নয়। দেখতে পেতেন প্রাণের ছোট্ট এই শেকড় ফের মহীরুহ হয়ে পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে। দেখতে পেতেন পশু পাখী মানুষে আবার ভরে উঠেছে। দাবানল দেখেছেন আপনি? আগুন যেখানে যেখানে জিভ বুলিয়ে যায়, সেখানে সেখানে কালো ছাই ছাড়া কিছু

থাকে না। তখন কিন্তু মনে হয় ওসব জায়গায় বোধহয় আর কিছুই জন্মাবে না—চিরটা কাল উষর মরু হয়েই থাকবে। কিন্তু শেকড় থেকে যায় তলায় তলায়। বছর কয়েক পরে কালো দাগের চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাবেন না। ছোট্ট এই প্রাণকণার মধ্যেও নিহিত রয়েছে ভাবী যুগের প্রাণীজগতের শেকড়। বৃদ্ধি আর বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এরাই একদিন আজকের মহাবিপর্যয়ের সব চিহ্ন মুছে দেবে পৃথিবীর বুক থেকে।"

"ইন্টারেস্টিং! ইন্টারেস্টিং!" বলতে বলতে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এলেন লর্ড জন। চোখ রাখলেন মাইক্রোসকোপে। "পারিবারিক প্রতিকৃতির পয়লা নম্বর ছবি তাহলে তুমিই! বাঃ, তোমার পিঠে ওটা কিগো? সার্টের বোতাম?"

"নিউক্লিয়স।" শিশুকে বর্ণপরিচয় শেখানোর ঢঙে বললেন চ্যালেঞ্জার, "কালো মত দেখতে।"

"নিঃসঙ্গতার অভিশাপ থেকে তাহলে মুক্তি পেলাম বলুন", হেসে গড়িয়ে পড়লেন লর্ড জন—"পৃথিবীতে আর আমরা একা নই।"

"প্রফেসর চ্যালেঞ্জার," টিপ্পনী কাটলেন সামারলি—"আপনি যেন ধরেই নিয়েছেন পৃথিবী গ্রহটা তৈরীই হয়েছিল কেবল মানুষ জাতটার জন্ম আর বংশবৃদ্ধির জন্যে।"

কথার মাঝে বাধা আসছে টের পেয়েই ফুঁসে উঠলেন চ্যালেঞ্জার —"আর কিসের জন্যে তৈরী হয়েছিল মনে হয় আপনার?"

"মাঝে মাঝে আমার কিন্তু মনে হয় মানুষ জাতটার আসুরিক ভণ্ডামি হল পৃথিবীটাকে নিজেদের নর্তনকুর্দনের রঙ্গমঞ্চরূপে ভাবা।"

"প্রমাণ ব্যতিরেকে কোনো অনুমতি অত গায়ের জোরে না বলাই ভাল। আসুরিক ভণ্ডামি যাকে বলছেন, সেটুকু বাদ দিয়েও কিন্তু প্রকৃতির সেরা সন্তান আমরাই।"

"বলুন, জ্ঞানের দৌড় আমাদের যদ্দুর, সেইটুকুর মধ্যেই সেরা।"

"সেটা বলাই বাহুল্য।"

"মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ বছর, কোটি কোটি বছরও হতে পারে, শূন্য এই পৃথিবী পাক খেয়েছে—একেবারে শূন্য না থাকলেও মানুষের আবির্ভাবের কোনো চিহ্ন বা সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না। গণনাতীত বছর ধরে রোদে পুড়েছে পৃথিবী, বৃষ্টিতে ধুয়েছে, হাওয়ায় অস্থির হয়েছে। মানুষ তো এল এই সেদিন—ভূতাত্ত্বিকের হিসেবে। তা সত্ত্বেও এ ধারণা মাথায় আসে কি করে যে এই বিপুল প্রস্তুতি কেবল মানুষের জন্যেই?"

"তবে কার জন্যে?—কিসের জন্যে?"

কাঁধ ঝাঁকালেন সামারলি।

"কি করে বলি? আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত সে জবাব। মানুষ হয়ত একটা নিছক দুর্ঘটনার ফলশ্রুতি এক জিনিস গড়তে গিয়ে বিবর্তনের ধারাপথে হঠাৎ সৃষ্টি। সমুদ্রের ওপরে যে ফেণা বা গাঁজলা বা আবর্জনা-স্তূপ ভাসে, সেই গাঁজলা যদি মনে মনে ভাবে বিশাল মহাসমুদ্রের সৃষ্টি শুধু তাকে উৎপাদন এবং ধারণ করার জন্যে, অথবা গির্জের বাসিন্দা নেংটি ইঁদুর যদি মনে করে বাড়টা নির্মিত হয়েছে কেবল তারই থাকার জন্যে, তাহলে ব্যাপারটা যেমন হাস্যকর দাঁড়ায়—পৃথিবীর সৃষ্টি শুধু মানুষের জন্য মনে করাটাও তেমনি হাস্যকর।"

ঠিক যে শব্দগুলি যেভাবে আউড়ে গেছিলেন দুই পণ্ডিত, হুবহু সেই ভাবেই লিখলাম বটে, কিন্তু তারপরেই এমন সব দাঁতভাঙা বহু অক্ষরযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা শুরু করলেন দুজনে যে সব গোলমাল হয়ে গিয়ে ঝাঁঝর করতালের মত বাজতে লাগল কানের মধ্যে। দুজনেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত নামী পুরুষ এবং এরকম একটা জটিল সমস্যা নিয়ে দুইজনের বাদানুবাদ শোনবার সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু দুজনের প্রত্যেকেই যদি পরস্পরকে বাধা দিতে থাকেন, একে অপরের যুক্তি খণ্ডন করতে থাকেন এবং প্রতি কথাতেই মতের অনৈক্য প্রকাশ করতে থাকেন, তাহলে আমার আর লর্ড

জনের কানের ওপর তা একটা অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায়। জ্ঞানের কাটাকুটি নিয়ে তাই ব্যস্ত রইলেন দুই জ্ঞানী পুরুষ—আমরা রইলাম বাইরে। এখন অবশ্য বাগযুদ্ধ থেমেছে। চেয়ারে কুঁকড়ে বসে আছেন সামাবল্লি। চ্যালেঞ্জার মাইক্রোসকোপের স্ক্রু নাড়ছেন আর ঝড়ের পর সমুদ্রের চাপা গুরুগম্ভীর গজরানির মত অস্পষ্ট গলায় গজরাচ্ছেন। লর্ড জন এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে। দুজনে তাকালাম বাইরে—রাতের পৃথিবীর পানে।

চাঁদ উঠেছে মরা চাঁদ। মানুষের চোখে শেষ চাঁদ। অত্যধিক উজ্জ্বল কিন্তু তারাগুলো। দক্ষিণ আমেরিকার মালভূমিতে দাঁড়িয়েও তারার এত স্পষ্ট রূপ কখনো দেখিনি। ইথারের পরিবর্তন আলোক-ধারার মধ্যেও পরিবর্তন এনেছে মনে হচ্ছে। ব্রাইটনের চিতা এখনো দাউ দাউ করে জ্বলছে। পশ্চিম আকাশে অনেক দূরে একটা লাল আভা দেখা যাচ্ছে। অরুণডেল, চিকেস্টার অথবা পোর্টসমাউথে আগুন লেগেছে নিশ্চয়। চুপচাপ বসে এইসব দেখছি, ভাবছি আর লিখছি। বাতাসে ভাসছে মধুর বিষণ্ণতা। তারুণ্য, সৌন্দর্য, শৌর্য, প্রেম—সবই কি ফুরিয়ে গেল? নক্ষত্র আলোকিত মর্ত্যভূমিকে মনে হচ্ছে বুঝি স্নিগ্ধ শান্তির স্বর্গ। এ দৃশ্য দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না অপূর্ব এই ভূস্বর্গের পথে ঘাটে মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে আছে স্তূপীকৃত শব—পশু, পাখী, মানুষের। আচম্বিতে হেসে উঠলাম হো হো করে।

বিস্ফারিত চোখে সবিস্ময়ে চাইলেন লর্ড জন—"কি হে ছোকরা! দারুণ সংকটেই হাসিঠাট্টা জমে ভাল। তা, তোমার কিসে হাসি পেল শুনতে পারি?"

"মহাপ্রাণের অনেক সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। অনেক মেহনৎ করেছি, অনেক সময় ব্যয় করেছি, অনেক চিন্তা খরচ করেছি—কিন্তু সমস্যা সমস্যাই থেকে গিয়েছে। অ্যাংলো জার্মান প্রতিযোগিতার কথাই ধরুন না কেন—অথবা পার্সিয়ান গাল্ফ্-এর সমস্যা, যা নিয়ে

আমাদের নেতার ভাবনার অন্ত ছিল না। কেউ কি একবারও ভেবেছিল সব সমস্যারই সমাধান শেষকালে এইভাবে হবে?"

আবার নির্বাক দুজনেই। গতায়ু স্বজনদের কথাই বোধহয় ভাবছে প্রত্যেকেই। মিসেস চ্যালেঞ্জার নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছেন, ফিসফিস করে বোঝাচ্ছেন স্বামীদেবতা। যাদের কথা মনে পড়ার কথা নয়, তারাও মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে। অস্টিনের মত তারা প্রত্যেকেই নিষ্প্রাণ এই মুহূর্তে। মনে পড়ছে ম্যাকআর্ডলকে। টেলিফোনে শুনেছিলাম টিপ করে মাথা পড়ল টেবিলে, এখনো রয়েছেন সেইভাবেই—হাতে টেলিফোন, মাথা টেবিলে। সম্পাদক বিউমণ্টও নিশ্চয় নির্জন প্রকোষ্ঠের নীল-লাল তুর্কী কার্পেটে শুয়ে আছেন। একই হাল হয়েছে রিপোর্টার রুমে—ম্যাকডোনা, মুরে, বণ্ড কেউ আর বেঁচে নেই। মরেছে নিশ্চয় কাজ করতে করতেই। হাতে নোটবই, পাতায় পাতায় লেখা অদ্ভুত যত কাহিনী, মাথার মধ্যে ঠাসা আরও চাঞ্চল্যকর ব্যাপারের রিপোর্ট। দৈনিক কাগজের জমজমাট শিরোনাম হওয়ার মত রিপোর্ট—পৃথিবীর অন্তিম দৃশ্যের বিবরণ—কিন্তু কস্মিনকালেও ছাপাখানায় যাবে না কোন খবরই। দেখতে পাচ্ছি তিন রিপোর্টারকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে খবরের সন্ধানে। ডাক্তারদের মাঝে রয়েছে ম্যাকডোনা—'হার্লি স্ট্রীটে হতাশা।' ম্যাক আবার অনুপ্রাসের ভক্ত। 'মিঃ সলি উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সুবিখ্যাত বিশেষজ্ঞ বলছেন নিরাশ হবেন না। আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিককে ছাদে বসে থাকতে দেখেছেন—রুগীদের তাড়া খেয়ে ছাদে পালিয়েছেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেও বিখ্যাত চিকিৎসকের বিশ্বাস, আশার সব সড়ক এখনো রুদ্ধ হয়নি।' ম্যাক শুরু করত ঠিক এইভাবে—ওর লেখার ধরন আমার মুখস্ত।—আর আছে বণ্ড; ও বোধহয় সেণ্ট পলস্-য়েই যাবে। ওর লেখায় আবার সাহিত্যের ছোঁয়া থাকা চাই। সাহিত্য করার মতই বিষয়ও বটে! 'গম্বুজের তলায় ছোট্ট গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে

তাকিয়ে আছি নীচের অসীম নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন জনতার পানে—যে মহান শক্তিকে চিরকাল অবজ্ঞা করে এসেছে মানুষ—আজ শেষের এই মুহূর্তে সেই শক্তির পদানত হয়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে। ওরা কাঁদছে, ওদের আকুল প্রার্থনায় নিঃসীম আকুতি চরম আকারে মূর্ত হয়ে উঠছে—আতংক ওদের চোখের তারায়, গলার স্বরে, কান্নার আওয়াজে—অজ্ঞাত সেই মহাশক্তির উদ্দেশে মাথা খুঁড়ছে প্রাণের ভয়ে'—চলবে এইভাবে লাইনের পর লাইন।

রিপোর্টারদের সুবর্ণ সুযোগ ছিল এই বিপর্যয়—আত্মপ্রতিষ্ঠার এমন মওকা কদাচিৎ ভাগ্যে জোটে—কিন্তু বিপুল এই সম্পদ হাতে নিয়েই মরতে হয়েছে প্রত্যেককে। আহারে, এমন একটা খবরের শেষে নিজের নামের আদ্যাক্ষর 'জে. এইচ. বি.' দেখার জন্যে কি কাণ্ডই না করত বেচারী বণ্ড।

কিন্তু কি সব আবোল তাবোল লিখছি। আসলে সময় কাটানোর ফিকির। যা হয় কিছু লিখে মনকে ব্যস্ত রাখা। মিসেস চ্যালেঞ্জার ভেতরের সাজঘরে ঘুমিয়ে পড়েছেন—খবর দিলেন প্রফেসর। মাঝের টেবিলে বসে বই দেখছেন আর বিবিধ বৃত্তান্ত লিখে রাখছেন উনি। খুব শান্ত তন্ময় মূর্তি। যেন রাশি রাশি কাজ বাকী রয়েছে—বছর ঘুরে গেলেও সে কাজ ফুরোবে না—উনি শেষ না করেও উঠবেন না। লিখছেন পাখীর পালকের কলমে, ঝড়ের মত বেগে। কলমটায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছে। যেন তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষদের প্রতি বিরামবিহীনসরব ভৎর্সনা।

চেয়ারে বসেই ঘুমোচ্ছেন সামারলি এবং মাঝে মাঝে বিদঘুটে শব্দে নাক ডাকছেন। পকেটে হাত পুরে চোখ বুঁজে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন লর্ড জন। আশ্চর্য! এ অবস্থায় চোখে ঘুম আসে কি করে?

রাত তিনটে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছি। এগারোটা পাঁচে শেষবার ডাইরী লিখেছিলাম, ঘড়ি দেখে সময় বসিয়েছিলাম—তারপরেই নিজেই জানিনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। রাগ হয়ে গেল

নিজের ওপর। কতক্ষণই বা আর বাঁচব। সেইটুকু সময়ের পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নষ্ট করলাম। কেউ তা বিশ্বাস করবে না জানি। না বিশ্বাস করুক। একঘুম ঘুমিয়ে শরীরটা কিন্তু বেশ ঝরঝরে লাগছে। ভাগ্যে যা আছে তা হোক- ডরাই না কোন পরিণতিকেই। আসুক নিয়তি—আমি তৈরী। মানুষ যতই উচ্চে ওঠে, জীবনের জোয়ারে যত বেশী গা ভাসিয়ে দেয়, নিজেকে যত বলাযান মনে করে—মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে চায় ততই। পরম কারুণিক প্রকৃতি তাই এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যাতে মানুষ বুঝতেই পারবে না কখন কোন মুহূর্তে এই নশ্বর পার্থিব বন্দর ছেড়ে ভেসে পড়তে হবে মরণাতীত মহাসমুদ্রে।

মিসেস্ চ্যালেঞ্জার এখনো ড্রেসিংরুমে। চ্যালেঞ্জার চেয়ারে বসেই ঘুমোচ্ছেন। দেখবার মত সে দৃশ্য। ছবি তুলে বাঁধিয়ে রাখবার মত। প্রকাণ্ড কাঠামো হেলে পড়েছে চেয়ারে, রোমশ দুইহাত ন্যস্ত ওয়েস্টকোটের ওপর, মাথাটা এমন ভাবে পেছনে ঝুলছে যে মুখ দেখা যাচ্ছে না—ক্লাবের ওপর ঘন দাড়ির জটপাকানো চুলটুকুই কেবল নজরে আসছে। নাক ডাকার ঘন ঘন বিস্ফোরণে কেঁপে কেঁপে উঠছে নিজেরই শরীর। ওঁর নাসিকার ঐকতান খাদে নিবদ্ধ, কিন্তু সামারলির সবিরাম নাসিকা সঙ্গীত উদারা মুদারা ছাড়িয়ে তারায় পৌঁছে যাচ্ছে। ঝুড়ি-চেয়ারে পাশ ফিরে গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছেন লর্ড জন-ও। ভোরের শীতল আলো সবে ঢুকতে শুরু করেছে ধূসর বিষণ্ণ ঘরের মধ্যে।

চোখ তুলে তাকালাম সূর্যোদয়ের পানে—মানুষের চোখে শেষ সূর্যোদয় প্রাণহীন শূন্য পৃথিবীকে এখন থেকে প্রদক্ষিণ করবে প্রাণদায়িনী এই সূর্য। মানুষ প্রজাতি আর নেই, একদিনই শেষ হয়েছে। গ্রহরা তবুও আবর্তিত হবে, জোয়ার আসবে যাবে, বাতাস কানাকানি করবে, প্রকৃতির সব কিছুই আগের মতই ধরাবাঁধা নিয়মে অব্যাহত থকবে—শুধু অ্যামিবার ভোগের জন্যে। কিন্তু সব

সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি বলে যে প্রাণটি বড়াই করেছিল একদিন, নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠতম প্রাণীর সিংহাসনে বসিয়ে রাজত্ব করে গিয়েছিল সসাগরা ধরণীতে—ধরণীর ধুলোর মধ্যেও তার আর কোন চিহ্ন থাকবে না—বিশ্বপুরুষের আশীর্বাদেই হোক কি অভিশাপেই হোক নিঃশেষে মুছে যাবে বিশ্ব থেকে। নিচে উঠোনে অস্টিন সাদা পাংশুমুখ আকাশপানে তুলে শুয়ে আছে—হোস পাইপের নলটা রয়েছে হাতে। গোটা মানুষ জাতটার প্রতীক ঐ শবদেহ—হাস্যকর, কিন্তু করুণ—যে-যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল এতদিন—আজ অসহায় ভাবে লুণ্ঠিত সেই যন্ত্রেরই পাশে।

বসে লেখা শেষ এইখানেই। এরপর থেকেই ঘটনার স্রোত এত দ্রুত বয়ে গিয়েছে যে তক্ষুণি তা টুকে রাখবার ফুরসৎ পর্যন্ত পাইনি। তবে মনে ছিল। প্রতিটি ঘটনাই এখনো জ্বলজ্বল করছে স্মৃতির আকাশে—ভুলিনি কিছুই।

গলার কাছে হঠাৎ এমন যেন দম আটকানো অনুভূতি আসতেই অক্সিজেন সিলিণ্ডারের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। জীবন যদি একটা বালি ঘড়ি হয়, তাহলে তার বালুকা ফুরিয়ে আসছে অতি দ্রুত। ত্বরিৎ বেগে ধাবিত হচ্ছে অন্তিম মুহূর্ত অভিমুখে। রাত খন জানি তৃতীয় সিলিণ্ডার ফুরিয়ে যাওয়ায় চতুর্থ সিলিণ্ডার লাগিয়ে দিয়েছিলেন চ্যালেঞ্জার। এখন দেখি তার ভেতরও প্রায়-নিঃশেষিত। শ্বাসরোধ হয়ে আসায় ভয়ংকর অনুভূতিটা আরও চেপে বসেছে ফুসফুসের ওপর। ছুটে গিয়ে শেষ সিলিণ্ডারের মুখ খুলে দিলাম। স্ক্রুর প্যাঁচ খুলতে খুলতে বিবেকের দংশন অনুভব করছিলাম। ইচ্ছে করেই একটু দেরী যদি করি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই চারজনে স্বর্গধাম অভিমুখে রওনা হয়ে যাবেন। চিন্তাটা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলাম মগজ থেকে। ঠিক তখনি ভেতরের সাজঘর থেকে চ্যালেঞ্জার-জায়ার ককিয়ে ওঠা চীৎকার শুনলাম :

"জর্জ, জর্জ, আমার দম আটকে আসছে।"

"ভয় নেই, মিসেস চ্যালেঞ্জার।" চীৎকারের চোটে চারজনেরই ঘুম ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে জবাব দিলাম আমি—"নতুন টিউবের মুখ খুলে দিয়েছি।"

এ-হেন মুহূর্তেও চ্যালেঞ্জারকে দেখে হাসি পেল আমার। চোখ রগড়াতে রগড়াতে সেই মুহূর্তে উঠে বসেছেন ভদ্রলোক—চোখ তো নয় যেন এক জোড়া লোমশ মুষ্টি। চোখ রগড়াচ্ছেন কিন্তু একটা বিপুলকায় দাড়িগোঁফওলা বাচ্ছা শিশুর মত। সামারলি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে কাঁপছেন ঠকঠক করে—মানবিক ভীতির পালাজ্বর একেই বলে - বিজ্ঞান সাধকের সুখদুঃখের ঔদাসীন্য তিরোহিত হয়েছে সেই মুহূর্তে কি পরিস্থিতিতে আছেন উপলব্ধি করে।

ধাতস্থ রয়েছেন একা লর্ড জন—ভোর হয়েছে, মৃগয়ায় বেরোতে হবে যেন এখুনি—তাই ধীর, স্থির, হুঁশিয়ার।

টিউবটার দিকে তাকিয়ে উনিই বললেন—"পঞ্চম এবং এই শেষ। ওহে ছোকরা, হাঁটুর ওপর কাগজ রেখে লিখছিলে কি? শেষের সেদিন ভয়ংকর?"

"সময় কাটানের জন্যে যা মাথায় আসছিল টুকে রাখছিলাম।"

"আইরিশম্যান ছাড়া এমন কাজ আর কেউ করবে বলে মনে হয় না। লিখছো যখন রেখে দাও যত্ন করে। ছোট ভাই অ্যামিবা বড় হোক—তখন পড়বে। আপাতত: কোনদিকেই ওর নজর আছে বলে মনে হচ্ছে না। হেই প্রফেসর, গতিক কি বুঝছেন?"

ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন চ্যালেঞ্জার। উষা দ্রুত পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তব্যাপী নিসর্গের ওপর। হেথায় সেথায় জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে পশম-সমুদ্রের মাঝে শংকু-দ্বীপের মতন।

ড্রেসিং-গাউন পরে এ ঘরে এলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। বললেন—"একটা অধ্যায় ফুরিয়ে এল। জর্জ তোমার সেই গানটা মনে পড়ে? 'বাজাও ঘণ্টা, ভাগিয়ে দাও প্রাচীনকে—বাজাও ঘণ্টা, তলব করো

নবীনকে'? ভবিষ্যতের গানই গাইতে তুমি। কিন্তু একি! আপনারা সবাই সারারাত চেয়ারে শুয়ে শীতে কেঁপেছেন আর আমি আরামে গায়ে চাপা দিয়ে ঘুমিয়েছি। ঠিক আছে, এখনি ব্যবস্থা করছি।"

বলেই, সাঁ করে ভেতরের ঘরে উধাও হলেন ক্ষুদ্রকায়া বীরাঙ্গনা মহিলা। কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম ফোঁস ফোঁস আওয়াজ বেরোচ্ছে কেটলি থেকে। তারপরেই পাঁচ কাপ ধূমায়িত কোকো একটা ট্রে-র ওপর বসিয়ে সামনে এনে রাখলেন।

বললেন—"খেয়ে নিন। চাঙা হয়ে যাবেন।"

তাই হলাম। সামারলি অনুমতি চাইলেন তামাকের পাইপ ধরানোর। সিগারেট ছিল আমাদের কাছে। ধূমপান শুরু করলাম সবাই মিলে। অস্থির স্নায়ু ধাতস্থ হল বটে, কিন্তু দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল বদ্ধঘরে অত কটু ধোঁয়ায়। বাধ্য হয়ে ভেন্টিলেটর ফাঁক করলেন চ্যালেঞ্জার।

"আর কতক্ষণ, চ্যালেঞ্জার?" জানতে চাইলেন লর্ড জন।

"ঘণ্টাতিনেক," কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার।

গিন্নী বললেন—"আগে ভয়-ভয় করছিল। কিন্তু সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই বেশ ভাল লাগছে। এখন একটু প্রার্থনা করলে হয় না, জর্জ?"

খুব মৃদু কণ্ঠে চ্যালেঞ্জার বললেন—"নিশ্চয় করবে। তবে কি জানো, প্রার্থনার ধরন প্রত্যেকেরই আলাদা। আমি ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিই—সেই হল আমার প্রার্থনা। প্রসন্ন মনে আত্ম-সমর্পণ করি—আত্মনিবেদনই আমার প্রার্থনা। নিয়তি আমাকে যে ভাবে নিতে চায় নিক। সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান আর সবচেয়ে বড় ধর্মের সঙ্গম কিন্তু সেইখানেই।"

পাইপ থেকে ফুক-ফুক করে ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে কাটা কাটা গলায় সামারলি বলে উঠলেন—"আমার মনের অবস্থা ভাগ্যের

হাতে সঁপে দেওয়ার মত বা প্রসন্নচিত্তে আত্মনিবেদনের মত নয় মোটেই। নিরুপায় হয়েই হাল ছেড়ে দিচ্ছি। নইলে আর এক-বছর বাঁচার দরকার ছিল খড়ি জীবাশ্মগুলোকে শ্রেণী অনুযায়ী সাজিয়ে ফেলার জন্যে।"

"আমার 'জীবন-সোপান'য়ের তুলনায় আপনার খড়ি জীবাশ্ম কিছুই নয়" জাঁকাল গলায় শুনিয়ে দিলেন চ্যালেঞ্জার। "বইটা সবে শুরু করেছিলাম। সারা জীবনের পড়াশুনা, অভিজ্ঞতা এবং আমার ব্রেনখানার সার-সংকলন থাকত যুগান্তকারী সেই কেতাবের মধ্যে। তা সত্ত্বেও কিন্তু মৌনসম্মতি দিচ্ছি নিয়তির নির্দেশে।"

"ও রকম কাজ প্রত্যেকেই কিছু না কিছু রয়ে গেল," বললেন লর্ড জন। "ছোকরা, তোমার কি?"

"কবিতা সম্পর্কিত একটা বই লিখছিলাম—শেষ হল না।"

"বিশ্ব এখন কবিতার আওতার বাইরে," বললেন লর্ড জন।

"আপনি কি করে যেতে পারলেন না বলুন?" শুধোলাম আমি।

"আরে, আমি তো কাজকর্ম চুকিয়ে তৈরী হয়েই বসে আছি। বসন্ত এলে তিব্বতে একটা তুষার-চিতা মারতে যাওয়ার কথা দিয়েছিলাম অবশ্য মেরিভেলকে—সে যাক মিসেস চ্যালেঞ্জার, এত গোছগাছের সংসার ছেড়ে যেতে নিশ্চয় মন কেমন করছে আপনার?"

"জর্জ যেখানে, আমার সংসারও সেখানে। তবে একটা ইচ্ছে ছিল। দুজনে এই ভোরের বাতাসে সুন্দর ঐ সবুজ ময়দানে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে আসার বড্ড ইচ্ছে ছিল।"

কথাগুলো তীরের মত গিয়ে বিঁধল আমাদের প্রত্যেকের মর্মে—মোচড় দিয়ে উঠল বুকের ভেতরটা। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি হয়ে বারবার বাজতে লাগল মাথার মধ্যে। কুয়াশার পর্দা সরিয়ে রোদ নেমেছে। সোনা সোনা রোদে তরঙ্গায়িত সবুজ প্রান্তর অপরূপ

দেখাচ্ছে। বদ্ধ, বিষাক্ত পরিবেশে বসে বাইরের সেই মহান, নির্মল, সমীরণ-স্নিগ্ধ প্রান্তরের সুষমা দেখে মনে হল যেন একটা স্বপ্নের দেশ দেখছি। ব্যাকুলভাবে দুহাত সেইদিকে বাড়িয়ে ধরেছেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। চেয়ার টেনে নিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে সবাই বসলাম জানলার সামনে। বাতাস আবার ভারী হয়ে উঠেছে। আমি যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। কালান্তকের ছায়াপাত অনুভব করতে পারছি। একটা অদৃশ্য যবনিকা যেন পৃথিবী রঙ্গমঞ্চের শেষ ক'জন অভিনেতার সামনে নেমে আসছে।

সঘন নিঃশ্বাসে লর্ড জন বললেন—"সিলিণ্ডারটায় বেশী অক্সিজেন নেই মনে হচ্ছে।"

"হতে পারে", বললে চ্যালেঞ্জার। "সব সিলিণ্ডারে সমান পরিমাণ নাও থাকতে পারে। অল্প চাপে ভুল করে অনেক সময় কম অক্সিজেন ঠেসে দেওয়া হয়। রক্সটন, আমার বিশ্বাস এটার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।"

"তার মানে আয়ুর এই সামান্য পুঁজি থেকেও খানিক সময় ঠকিয়ে নেওয়া হল," তিরিক্ষে গলায় মন্তব্য করলেন সামারলি। "নিচ, হীন, আদর্শহীন এই যুগের চমৎকার চরম দৃষ্টান্তই বটে। মরুকগে, চ্যালেঞ্জার, নশ্বর দেহটা পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার সময়ে অধ্যাত্ম জগতে যে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটবে, এখনই কিন্তু তা পর্যবেক্ষণ করার উপযুক্ত সময়।"

স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন—"কাছে এসো। বসো এই টুলে। হাতে হাত দাও। বন্ধুগণ, আবহাওয়া এখনও তেমন বিষিয়ে ওঠেনি। আর দেরী করা সমীচীন হবে না। তুমিও নিশ্চয় তা চাওনা?"

গুড়িয়ে উঠলেন চ্যালেঞ্জার-গৃহিণী। মাথা রাখলেন স্বামীর দুই হাঁটুর ওপর।

লর্ড জন বললেন—"সার্পেন্টাইনে শীতকালে স্নানের দৃশ্য মনে

পড়ছে। সবাই যখন জলে, দু একজন ডাঙায় দাঁড়িয়ে শীতে আরো বেশী জড়সড় বোধ করে। শেষে যারা পড়ে থাকে, কষ্ট তাদেরই বেশী চ্যালেঞ্জার। আমি চাই এগিয়ে যেতে—পেছিয়ে থাকব কেন?"

"জানলা খুলে ইথারের সামনে দাঁড়াবেন?"

"দম আটকে মরার চেয়ে বিষিয়ে মরা অনেক ভাল।"

সামারলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি জানালেন মাথা কাৎ করে—হাত বাড়িয়ে দিলেন চ্যালেঞ্জারের পানে।

বললেন—"অনেক ঝগড়া করেছি—কিন্তু বন্ধুত্বকে ম্লান হতে দিইনি—কেউ কাউকে অসম্মানও করিনি। সব এখন শেষ। বিদায়!"

"বিদায় হে ছোকরা!" বললেন লর্ড জন। "জানলায় তো প্লাস্টার লাগানো। খোলা যাবে না।"

উঠে দাঁড়ালেন চ্যালেঞ্জার। বুকে টেনে নিলেন স্ত্রীকে। স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরলেন স্ত্রী।

"ম্যালোন, দূরবীনটা দাও", গম্ভীর গলায় বললেন চ্যালেঞ্জার।

আমি দিলাম।

"যে মহাশক্তির হাতে আমাদের সৃষ্টি, ফিরে চললাম তাঁরই হাতে", বজ্রকণ্ঠে ঘর কাঁপিয়ে চীৎকার করে বললেন চ্যালেঞ্জার এবং সবলে দূরবীনটা ছুঁড়ে মারলেন জানলার সার্সিতে।

ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল সার্সি। টুকরো ছিটকে গেল বাইরে। মাটিতে পড়ার আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের আরক্ত মুখে আছড়ে পড়ল বহির্জগতের তাজা হাওয়া। কি মিষ্টি সেই হাওয়া। তেজোময়, বেগবান, বলদায়ক।

অবাক বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়ে কতক্ষণ যে বসেছিলাম, খেয়াল নেই। তার পরেই যেন স্বপ্নের মধ্যে শুনলাম চ্যালেঞ্জারের মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর, "বন্ধুগণ! ইথারের বিষ-বলয় পেরিয়ে এসেছে পৃথিবী, ফিরে এসেছে আগের হাওয়া—তাই মানুষ জাতটার মধ্যে বেঁচে রইলাম শুধু আমরা পাঁচজন।"

৫। মৃত বসুন্ধরা

বেশ মনে আছে, মিষ্টি, ভিজে, দক্ষিণ-পশ্চিমে বাতাসের ঝাপটায় আমরা যেন খাবি খেতে খেতে জবুথবু হয়ে বসেই রইলাম যে-যার চেয়ারে। তাজা ফুরফুরে এই বাতাস এইমাত্র সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে, জোরালো হাওয়ায় উড়ছে মসলিন পর্দা, জুড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের আরক্ত মুখ। কতক্ষণ যে এইভাবে আচ্ছন্নের মত বসেছিলাম তা মনে নেই। কিংকর্তব্য-বিমূঢ়, স্তম্ভিত, অর্ধ-অচেতন অবস্থা প্রত্যেকেরই। মরবার জন্মে কোমর বেঁধে ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এল নতুন খবর—আবার বাঁচতে হবে, যদিও জাতভাইরা কেউ আর বেঁচে নেই। মর্মান্তিক এই সংবাদ দুরমুশের মত এক ঘায়ে আমাদের ধরাশায়ী করেছে। তাই জড়বৎ বসে রইলাম সময়ের হিসেব হারিয়ে। তারপর দেহমনের স্থগিত যন্ত্রগুলোর কাজ শুরু হয়ে গেল একটু একটু করে, চালু হয়ে গেল স্মৃতির মাকুর আনাগোনা—মনের মধ্যে বোনা হয়ে যেতে লাগল নানান ধারণা—তাঁতির মাকুর মতই। নিষ্ঠুর, নির্মম সত্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠল মনের পর্দায়—এ সত্য আমার অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নিয়ে—কিভাবে জীবন কাটিয়েছি এবং কি ভাবে তা নতুন করে কাটাতে হবে তাই নিয়ে। নীরব আতংকে পাশে তাকিয়ে দেখলাম সেই একই ভয়ংকর প্রশ্ন মূর্ত হবে, উঠেছে জোড়া জোড়া চোখে। বিশ্বের জীবিত প্রাণী মাত্র আমরা কজন—সেজন্মে আনন্দে আটখানা হতে পারছিনা—বিমর্ষের বন্যায় ভেসে যাচ্ছি, নিবিড় নৈরাশ্যে মুষড়ে পড়ছি। পৃথিবীতে যা কিছু ভালবেসেছি তার আর কিছুই নেই—ভেসে গেছে এক বিপুল, অনন্ত, অজ্ঞাত মহাসমুদ্রে—আমরা কজন পরিত্যক্ত হয়েছি বিশ্বের এমন এক মরুদ্বীপে যেখানে বন্ধু নেই, আশা

নেই, উচ্চশা নেই। মানুষ জাতটার মহাশ্মশানে শৃগালের মতই বছর কয়েক হন্যে হয়ে ঘোরবার পর আমাদের ললাটেও জুটবে বিলম্বিত মৃত্যু।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার—"জর্জ, জর্জ, কী ভয়ংকর! সবাই মিলে গেলে কি ভালই না হত। কেন বাঁচালে জর্জ? মরে গিয়ে ওরাই বরং বেঁচেছে—মরেছি আমরা।" বলতে বলতে দুহাত বাড়িয়ে ধরলেন স্বামীর পানে।

বিশাল ভুরু কুঁচকে চ্যালেঞ্জার তখন চিন্তামগ্ন—তার মধ্যেই প্রকাণ্ড লোমশ থাবা বাড়িয়ে স্ত্রীর হাত ধরলেন। বরাবর লক্ষ্য করেছি, বিপদে পড়লেই শিশু যেমন মায়ের কাছে ছুটে যায়, চ্যালেঞ্জার-গৃহিণীও অসহায়ভাবে হাত বাড়িয়ে আশ্রয় খোঁজেন শক্তিমান স্বামীর মধ্যে।

গুরুগম্ভীর মন্থর কণ্ঠে চ্যালেঞ্জার বললেন—"ভাগ্যের হাতে নিঃশেষে বিনাবাধায় নিজেকে যদি সঁপে না দেওয়াও হয়, বাস্তবকে মেনে নেওয়াই প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ।" উচ্চনিনাদী গম্ভীর কণ্ঠস্বর গমগম করে ফিরতে লাগল ঘরের মধ্যে।

"আমি মানতে পারছিনা," দৃঢ়কণ্ঠে বললেন সামারলি।

"তাতে ভারী বয়ে গেল," মন্তব্য করলেন লর্ড জন। "আপনি মানতে পারলেন কি না পারলেন, তাতে ঘটনার মোড় উল্টোদিকে ঘুরে যাবে না। আপনার মৌনসম্মতির কেউ ধার ধারছে না মশাই। যেখানে এসে পড়েছেন, সেখানে আসাটা কি আপনার ইচ্ছে কি অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করেছিল? এ কাণ্ড আরম্ভ হওয়ার আগে আপনার অনুমতি কি নেওয়া হয়েছিল? এখনও কেউ নিচ্ছে না। ঘটনার স্রোত আপনার মৌন সম্মতির অপেক্ষায় বসে নেই, ছিল না, থাকবেও না।"

স্ত্রীর হাত ছাড়েননি চ্যালেঞ্জার। মুখখানা দুর্বোধ্য করে তুলে বললেন—"সুখ আর দুঃখের মধ্যে যে প্রভেদ—আমরা এখন সেই

প্রভেদের মধ্যেই রয়েছি। জোয়ার এলে স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্যে শান্তি আছে—কিন্তু ঢেউয়ের সঙ্গে লড়তে গেলে ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত হতেই হবে। বর্তমান পরিস্থিতিও আমাদের হাতের বাইরে? সুতরাং বিনাপ্রতিবাদে ত মেনে নেওয়াই ভাল।"

সুনীল, শূন্য স্বর্গপানে মুখ তুলে যেন আকুল আর্তি পেশ করলাম আমি "কিন্তু এ জীবন নিয়ে করব কি? যে পৃথিবীতে খবরের কাগজ নেই, সেখানে আমিও নেই।"

লর্ড জন বললেন—"যে পৃথিবীতে শিকার করবার প্রাণী নেই, সেখানে আমিও নেই।"

সামারলি বললেন—"যে পৃথিবীতে ছাত্রছাত্রী নেই, সেখানে আমিও নেই।"

চ্যালেঞ্জার গৃহিণী বললেন—"কিন্তু আমার সব আছে—কেননা আমার স্বামী আছে, ঘর আছে, সংসার আছে। ঈশ্বরের দয়ায় তাই আমার সব আছে। এবং আমিও আছি।"

"আমিও," বজ্রকণ্ঠে ফের ধ্বনিত হল অতিনিনাদী কণ্ঠ—"আছি শুধু বিজ্ঞানের জন্যে—কেননা বিজ্ঞান তো মরেনি। বরঞ্চ এই বিপর্যয়ের পর আরও দুরূহ সমস্যায় ব্রেনকে ব্যাপৃত রাখার খোরাক নিরন্তর যুগিয়ে যাবে এই বিজ্ঞান। তাই আমি আছি এবং থাকব।"

বলতে বলতে জানলার পাল্লা খুলে দিলেন চ্যালেঞ্জার। নিস্পন্দ, নীরব নিসর্গ পানে নিষ্পলকে চেয়ে রইলাম আমরা।

বজ্রনাদে ফের বললেন চ্যালেঞ্জার—"কাল বিকেল তিনটের একটু পরেই পয়জন বেল্টে ঢুকেছিল পৃথিবী—পুরোপুরি ডুবে গিয়েছিল ইথারের বলয়ে। এখন নটা বাজে। কিন্তু ঠিক কখন পয়জন বেল্টে থেকে বেরিয়েছি, প্রশ্ন সেইটাই।"

"ভোরের দিকে বাতাস ভীষণ ভারী লাগছিল," বললাম আমি।

মিসেস চ্যালেঞ্জার বললেন—"তারও পরে আটটা নাগাদ দমবন্ধ হয়ে আসছিল ঠিক কালকের মত।"

"তাহলে ধরা যেতে পারে পয়জন বেল্ট থেকে বেরিয়ে এসেছি আটটার একটু পরেই। ঝাড়া সতেরো ঘণ্টা বিষাক্ত ইথারে ডুবেছিল পৃথিবী। সতেরোটা ঘণ্টা ধরে বিশ্ব-মালী ফলের পোকা মেরেছেন— ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা মানুষ জাতটাকে নির্মূল করেছেন— পৃথিবীকে প্রাণীশূন্য করেছেন। কিন্তু পুরোপুরি করতে পেরেছেন কি? আমাদের মত হতভাগ্য আর কেউ কি নেই পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে?"

লর্ড জন বললেন—"কথাটা আমার মাথাতেও এসেছে। সমুদ্র তীরে পরিত্যক্ত নুড়ি বলতে কি শুধু আমরা পাঁচজন?"

প্রত্যয়-কঠিন কণ্ঠে সামারলি বলে উঠলেন—"সম্ভাবনাটা অযৌক্তিক, উদ্ভট, হাস্যকর। কেউ আর বেঁচে নেই, থাকতে পারে না। ম্যালোনের মত শক্ত মানুষের হাল কি হয়েছিল ভাবতে পারেন? ইথারের প্রথম ধাক্কাতেই সিঁড়ি বেয়ে টলতে টলতে উঠে লুটিয়ে পড়েছিল অজ্ঞান হয়ে। দুনিয়ায় এমন কে আছে মশায় মারাত্মক ঐ ইথার বিষে সতেরো মিনিট আচ্ছন্ন থেকেও টিঁকে থাকতে পারে? সতেরো ঘণ্টার প্রশ্নই ওঠে না। ষাঁড়ের মত শক্তি আর লোহার মত স্নায়ু থাকলেও তা সম্ভব নয়।"

"সম্ভব হলেও হতে পারে যদি কেউ চ্যালেঞ্জারের মত আগে থেকেই আক্রমণটা আঁচ করে নিয়ে সেই ভাবে তৈরী হত।"

অমনি দর্প, আত্মশ্লাঘা, অহমিকা যেন দুম করে ফুটে বেরিয়ে এল চ্যালেঞ্জারের স্তিমিত চক্ষু এবং উদ্ধত দাড়ি থেকে। বললেন ভরাট গম্ভীর গলায়—"সেটা সম্ভব নয় কোন মতেই—কেন না যে পর্যবেক্ষণ শক্তি, সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতা এবং ভবিষ্য-দর্শনের মেধা নিয়ে আটঘাট বাঁধতে পেরেছি—তা এ-যুগে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে আশা করা যায় না।"

"আপনি তাহলে বলছেন মরেছে প্রত্যেকেই?"

"নিঃসন্দেহে। তবে একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার। বিষের

ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে তলার দিক থেকে—কাজেই আবহমণ্ডলের ওপর দিকে বিষের তীক্ষ্ণতা কম থাকাই সম্ভব। সম্ভাবনাটা বিচিত্র—কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে গবেষণার বিরাট ক্ষেত্র সামনে পড়ে। প্রাণের সন্ধানে তিব্বতের গ্রাম বা আল্পসের খামারে খোঁজ নেওয়াই উচিত—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বহু হাজার ফুট উঁচুতে কে জানে সবাই বহাল তবিয়তে এখনো বেঁচে আছে কিনা।"

লর্ড জন বললেন—"ও কথা যদি বলেন তাহলে বলব চাঁদেও মানুষ বেঁচে আছে—কারণ সেখানেও যাওয়ার রেলরাস্তা নেই, জাহাজ পথও নেই। আমি কিন্তু জানতে চাইছিলাম, এই কি সব শেষ—না ভোগান্তির আরও বাকী আছে।"

সারস পাখীর মত গলা বাড়িয়ে দিগন্ত দেখলেন সামারলি।

বললেন দ্বিধাজড়িত স্বরে—"আকাশ পরিষ্কার। কালও তাই ছিল। কিন্তু ভোগান্তির শেষ এইখানেই—একথা মানতে পারছিনা।"

"তাহলে ভাগ্যের কথাই আবার বলা যাক," দু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন চ্যালেঞ্জার—"যদি ধরে নেওয়া যায় ইথার বিষে নিমজ্জিত হওয়ার দুর্ভাগ্য এর আগেও পৃথিবীর হয়েছে, তাহলে তা হয়েছিল অনেক অনেক বছর আগে। অসম্ভব মোটেই নয়—মহাশূন্যে বিষাক্ত ইথার মাঝে মাঝে থাকবে এ আর আশ্চর্য কি। কিন্তু অতীতে যা ঘটেছে অনেক আগে—ভবিষ্যতেও তা ঘটবে অনেক পরে—এমন ভাবাটা কি অযৌক্তিক হবে?"

"মানলাম", বললেন লর্ড জন। কিন্তু দেখা গেছে ভূমিকম্পের একটা ধাক্কা যেতে না যেতেই আর একটা ধাক্কা এসে পড়ে। তাই বলি কি, হাত-পা ছড়িয়ে প্রাণ ভরে কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস নেওয়া যাক—অক্সিজেন সিলিণ্ডার যখন নেই তখন ফের শ্বাসকষ্ট শুরু হলে মরতে আর বেশী সময় লাগবে না।"

গত চব্বিশ ঘণ্টায় প্রচণ্ড আবেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে থেকেছি—তার পরেই যে এমন শৈথিল্য, এত অবসাদ, এত কুঁড়েমি নামবে

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তা ভাবতেও পারিনি। দেহ মন দুই যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে, যেন কিছুই আর করার নেই, যেন সৃষ্টি রসাতলে গেলেও এসে যায় না, যেন তিলমাত্র কিছু করাটাও একটা ভীষণ ক্লান্তিকর ব্যাপার। এমন কি মানুষ-ডায়নামো চ্যালেঞ্জার পর্যন্ত স্থবির দেহে গুটিসুটি মেরে বসে রইলেন চেয়ারে। দুহাতে মুখ ঢেকে আকাশ পাতাল কি চিন্তা যে করতে লাগলেন ঈশ্বর জানেন। বেশ বুঝলাম বিশ্বের কুঁড়েমি ওঁকেও আশ্রয় করেছে। শেষকালে আমি আর লর্ড জন দুপাশে দাঁড়িয়ে দুদিক থেকে হাত ধরে টেনে তুললাম চেয়ার থেকে। জ্বলন্ত চাহনি নিক্ষেপ করলেও শেষ পর্যন্ত সঙ্গ দিলেন আমাদের। ছোট্ট আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এলাম দৈনন্দিন জীবনের উদার বাতাসে—দেখতে দেখতে স্বাভাবিক শক্তি উৎসাহ ফিরে এল আগের মতই।

কিন্তু এ মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমাদের কি করা উচিত, তা ভেবে পেলাম না। সৃষ্টির শুরু থেকে এ-সমস্যার সম্মুখীন কেউ হয়নি। দেহের চাহিদা মেটাতে যা কিছু দরকার—ভবিষ্যতে তার কিছুই অভাব হবে না জানি। বিলাসবহুল পরিবেশেও জীবনটা কাটিয়ে দিত পারব। খাবার, বস্ত্র, মদের বোতল, শিল্পসামগ্রী—সবই তো আমাদের। কিন্তু তারপর? কি নিয়ে থাকব? কি কাজ করব? কিছু কাজ নাগালের মধ্যেই রয়েছে অবশ্য—এখুনি সেরে ফেলা দরকার। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি দুজনেই পড়ে মেঝের ওপর। একজন ডিস ধোবার ঘরে—আরেকজন আগুনের পাশে। দুজনকে তুলে এনে শুইয়ে দিলাম যার যার বিছানায়। এরপর অস্টিন বেচারীকে নিয়ে এলাম উঠোন থেকে। মৃত্যুর পর মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়। অস্টিনের ক্ষেত্রে তা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় হয়েছে। কাঠের মত শক্ত হাত-পা নাড়ায় কার সাধ্যি– মুখখানায় প্রকট হয়ে উঠেছে ব্যঙ্গবঙ্কিম শাণিত হাসি—মাংসপেশীতে টান ধরায় ও হাসি অম্লান থাকবে দেহটা পঞ্চভূতে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। মুখের

এই অবস্থা কিন্তু ইথার বিষে মৃত সব মড়ার মুখেই দেখেছি। যেখানে গেছি, সেখানেই দেখেছি মড়ার দল দাঁত খিঁচিয়ে ব্যঙ্গ করছে, নিঃশব্দে আমাদের টিটকিরি দিচ্ছে মানুষ জাতটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও শ্মশানভূমিতে বিচরণের জন্যে। ভাগ্যহীন পাঁচজনকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে পরিস্থিতির ভয়াবহতা।

অস্থির চরণে খাবার ঘরে পায়চারী করছিলেন লর্ড জন। আমরা ব্যস্ত আহারে। হঠাৎ উনি বললেন – 'দেখুন মশায়, জানিনা হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছেন কি করে, কিন্তু আমি আর পারছিনা।"

"কি করা উচিত বলে মনে হয় আপনার যদি দয়া করে বলেন…" বললেন চ্যালেঞ্জার।

"বেরিয়ে পড়ি চলুন—দেখা যাক অবস্থা কিরকম।"

"আমিও তাই চাই।"

"কিন্তু এ গ্রামে আর নয়। এখানকার যা কিছু দেখবার আছে, জানলায় দাঁড়িয়েই দেখা হয়ে গেছে।"

"তাহলে কোথায় যেতে চান?

"লণ্ডনে।"

"উত্তম প্রস্তাব", গজগজ করে বললেন সামারলি। "চল্লিশ মাইল হাঁটা আপনার কাছে কিছু নয়, কিন্তু কাটাগুঁড়ির মত ঐ বেঁটে পা নিয়ে চ্যালেঞ্জার পারবেন বলে মনে হয় না, আমি তো পারবই না।"

ভীষণ উত্যক্ত হলেন চ্যালেঞ্জার।

বললেন গগন-বিদারী কণ্ঠে "দেখুন মশায়, আপনার নিজের শারীরিক খুঁত নিয়ে ভাবতে বসলে ভাবনার অনেক খোরাক পেতেন।"

কৌশলবর্জিত সামারলি ঝটিতি বললেন—"আরে, আরে! আমি কি আপনাকে খোঁটা দিতে চেয়েছি? আপনার শরীরের

জন্য আপনাকে কে দায়ী করছে? ওরকম খাটো ভারী চেহারা নিয়ে জন্মালে পা দুখানা কাটাগুঁড়ির মত তো হবেই।"

রাগের চোটে কথা আটকে গেল চ্যালেঞ্জারের। গলা দিয়ে কেবল বেরোলো ঘড় ঘড় শব্দ, খাড়া হয়ে গেল মাথার চুল, ঘনঘন ওঠানামা করতে লাগল চোখের পাতা। কোঁদল চরমে পৌঁছোনোর আগেই মাঝে এসে পড়লেন লর্ড জন।

"হাঁটবার প্রশ্ন উঠছে কেন? হাঁটার দরকার কি?"

"তবে কি ট্রেনে চাপবেন?" ফুটন্ত জল ভর্তি কেটলির মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে বললেন চ্যালেঞ্জার।

"মোটরে গেলেই তো হয়।"

"ও ব্যাপারে আমি তেমন পোক্ত নই," চিন্তাগ্রস্তমুখে দাড়ি টানতে টানতে বললেন চ্যালেঞ্জার। "তবে একটা কথা আপনি ঠিকই বলেছেন। মানুষের মেধা যখন তুঙ্গে পৌঁছোয়, যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সে পেছপা হয় না। লর্ড জন, খাসা প্রস্তাব আপনার। গাড়ী আমিই চালাবো—চলুন সবাই লণ্ডনে!"

"আজ্ঞে না, ও কাজটি করবেন না," রুখে দাঁড়ালেন সামারলি।

বেঁকে বসলেন চ্যালেঞ্জার গৃহিণীও। গলা চড়িয়ে বললেন—"খবরদার জর্জ, একবারই তুমি ও চেষ্টা করেছিলে। গ্যারেজের গেট উড়িয়ে ছেড়েছিলে।"

"সেটা ঘটেছিল ক্ষণিকের অন্যমনস্কতার জন্যে", নির্লিপ্ত স্বর চ্যালেঞ্জারেব। "কিন্তু এ-নিয়ে আর কথা নয়। গাড়ী আমি চালাবো—যাবে সবাই।"

সংকট মোচন করলেন লর্ড জন।

বললেন—"কি গাড়ী?"

"হাম্বার—কুড়িটা ঘোড়ার সমান।"

"তাই বলুন। ও গাড়ী আমিই চালিয়েছি বেশ কয়েক বছর।

তখন কিন্তু ভাবিনি গোটা মানুষ জাতটাকে একদিন চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাকেই। পাঁচটাই সিট আছে, তাই না? গোছগাছ করে নিন। দশটায় গাড়ী নিয়ে আসছি।"

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দশটার সময়ে গর গর ঝন্‌ঝন্ শব্দে হাম্বার হাঁকিয়ে উঠোন থেকে বেরিয়ে এলেন লর্ড জন। আমি বসলাম ওঁর পাশে। মিসেস চ্যালেঞ্জার চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেলেন দুই রাগী পুরুষের ঠিক মাঝখানে—ঠিক যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তারপর ব্রেক ঢিলে দিলেন লর্ড জন, দ্রুত হাতে গীয়ার দিলেন ফার্স্ট থেকে থার্ডে। শুরু হল অত্যাশ্চর্য মোটর যাত্রা—সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ এই পৃথিবীতে মনুষ্য নামক জীবটির আবির্ভাব ঘটার পর আজ পর্যন্ত এ-হেন বিচিত্র অভিযান কখনো হয়নি।

অগাস্ট দিবসের সেই মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য মনে মনে কল্পনা করুন। ভোরের স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া, গ্রীষ্মের সোনাঝরা মোলায়েম রোদ, নির্মেঘ আকাশ, সাসেক্স বনানীর উচ্ছ্বস সবুজ বর্ণ, গুল্ম-ছাওয়া অনুর্বর ঢেউখেলানো প্রান্তরের গাঢ় রক্তবর্ণ এবং নিসর্গ সুন্দরীর অজস্র রঙীন রূপের ডালির পানে তাকালে মনেই হবে না পৃথিবী জুড়ে এমন এমন একটা মহাবিপর্যয় ঘটে গেছে। দিগন্তব্যাপী এই মহান সৌন্দর্যের মধ্যে কিন্তু একটি লক্ষণ প্রকট হয়ে থেকে বারংবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে এ পৃথিবী সে পৃথিবী নয়। সুন্দর সেই পৃথিবীতে শব্দ ছিল, গান ছিল, প্রকৃতির সঙ্গীত ছিল, জীবনের জয়গান ছিল—মৃত এই পৃথিবীতে তা নেই। একটা অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ গ্রাস করেছে শব্দময়, ধ্বনিময়, বাঙময় পৃথিবীর সব শব্দ, সব ধ্বনি, সব কথা। টুঁ টি-টেপা সর্বগ্রাসী সেই নীরবতার তুলনা দেওয়ার মত ভাষা আমার নেই। শহর ছেড়ে গ্রামে গেলে, জীবনের সাড়া কানে এসে বাজে এই শব্দের মধ্যে দিয়েই। এ শব্দের বিরাম নেই বিরতি নেই। সমুদ্র নির্ঘোষের যেমন শেষ নেই—গ্রামাঞ্চলের এই সম্মিলিত

শব্দলহরীরও শেষ নেই। পাখীর কলগুঞ্জন, পোকামাকড়ের গুন্‌গুনানি, দূরায়ত কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি, গরুভেড়ার ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, ট্রেনের গর্জন, গাভীর হাম্বা হাম্বা—সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত শ্রুতিমধুর শব্দ ঢেউয়ের পর ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ে কানের পর্দায়—ঠিক যেভাবে সাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে বালুকাবেলায়। কিন্তু সে শব্দ আর পাচ্ছি না। মৃত্যুপুরীর সেই ভয়াবহ নৈঃশব্দ নামহীন আতংকের মত চেপে বসতে লাগল বুকের মধ্যে। শব্দহীন প্রশান্ত এই জগতের মধ্যে আমাদের যন্ত্রযানের কর্কশ শব্দ যেন একটা উৎপাত—নিজেরাই শিউরে উঠলাম মহাশ্মশানের নীরবতা ভঙ্গ করার অপরাধে। শব্দহীন ভয়াবহতার মধ্যে হেথায় সেথায় হেলেদুলে মেঘলোকের দিকে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী—বাড়ী পুড়ছে এখনো। দেখে প্রাণের ভেতর যে কি রকম করে উঠল, তা কাউকে কোনদিনও বোঝাতে পারব না।

বিকট অনুভূতির এই কিন্তু শেষ নয়। এ ছাড়াও দেখলাম মড়ার পর মড়া! শেষ নেই মড়ার। দাঁত খিঁচিয়ে শাণিত বিদ্রূপের হাসি হেসে বীভৎস নীল মুখে ওরা সবাই তাকিয়ে যেন আমার পানে। প্রথম প্রথম কিন্তু গায়ের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল তাই দেখে। স্টেশন হিলের গা বেয়ে নামতে নামতে নতুন করে দেখলাম আয়া আর বাচ্চা দুটোকে, পায়ের ফাঁকে মুখ গুঁজে থাকা ঘোড়াটাকে। গাড়ীর পাশে আসতে মনে হল এই বুঝি ছাগলটা হা হা করে হেসে উঠে দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে পড়বে রাস্তায়। আরও নিচে নেমে এসে দেখলাম পায়ে পা জড়িয়ে হাতে হাত দিয়ে ছয় চাষী শুয়ে এক জায়গায়। প্রাণহীন স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ স্বর্গের দিকে। ঠিক যেন ফটোগ্রাফ দেখছি। দেখতে দেখতে কিন্তু সব সয়ে গেল। প্রকৃত নিঠুরা, আবার প্রকৃতি দয়াময়ীও বটে। তাঁরই করুণার প্রসাদে বিশ্বজোড়া মৃত্যুদৃশ্য একক মৃত্যুর ভয়াবহতা মুছে দিল অন্তর থেকে। অতি-উত্তেজিত স্নায়ু আর বিচলিত হল না এক আধটা মৃত্যু

দেখে—মৃত এ জগতের প্রত্যেকেই। তাই মনে আর সাড়া দিল না নতুন নতুন মৃত্যু দৃশ্যে—সব দৃশ্যই মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল বিশ্ব মৃত্যু-দৃশ্যের সাথে। আর কান্না কিসেব। মাঝে মাঝে মাঝে এক একটা বিশেষ রকমের বিদঘুটে মড়া দেখে অবশ্য চাবুকের ঘায়ে চমকে ওঠার মত আসাড় অবস্থা কাটিয়ে উঠল মন— তাব বেশী নয়।

প্রকৃতির অন্যায় অবিচারের প্রতি আমাদের প্রতিটি রক্তবিন্দু কিন্তু বিদ্রোহী হয়ে উঠল শিশুদের পরিণতি দেখে। চোখে জল এসে গিয়েছিল প্রত্যেকের। একটা স্কুলবাড়ীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। স্কুলের সামনে রাস্তা জুড়ে অনেকদূর পর্যন্ত খোকাখুকুদের ছোট ছোট মড়া। আতংকে দিশেহারা হয়ে নিশ্চয় বাচ্চাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষকরা। কিন্তু বাড়ী পর্যন্ত যেতে পারেনি বেচারীরা— অনেকে স্কুলের দরজাও পেরোতে পারেনি। রাস্তার দুপাশে প্রতিটি বাড়ীর প্রতিটি জানালায় দাঁড়িয়ে যেন হাসি হাসছে মড়ার দল। শেষ মুহূর্তে নিঃশ্বাস নেবার জন্য ছুটে এসেছিল জানালায় কিন্তু তাতেও রেহাই পায়নি। অনেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। ফুটপাতেই লুটিয়ে পড়েছে—মাথার টুপি বা কোট প্যান্ট পড়বার সময় পায়নি। কেউ কেউ আছড়ে পড়েছে রাস্তার [illegible]। লর্ড জনের হাত খুব পাকা। বলেই মড়াদের ভীড় কাটিয়ে গাড়ী চালিয়ে আনতে পারলেন। [illegible] মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে হেঁটে চলার গতিতে যেতে বাধ্য হয়েছি। টনব্রিজ স্কুলের উল্টোদিকে এসে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। আমরা নামলাম। ধরাধরি করে মড়া সরিয়ে রাস্তা সাফ করলাম। ফের চলল গাড়ী।

সাসেক্স আর কেন্টের হাই রোড দিয়ে সেদিন যাওয়ার সময়ে দেখেছি এমনি অনেক মর্মান্তিক দৃশ্য। কিন্তু বিশেষ কয়েকটি চিত্র মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। সাউথ বরো গ্রামে একটা সরাইখানার সামনে একটা ঝকঝকে গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বেশ

দামী, বড় গাড়ী। ব্রাইটন বা ইষ্টবোর্ন থেকে হৈ হুল্লোর করে জনকয়েক ফূর্তিবাজ মানুষ নিশ্চয় বাড়ী ফিরছিলেন সেই গাড়ীতে। ঝলমলে পোশাকে তিনজন রূপসী যুবতীকে দেখলাম পেছনে বসে থাকতে—একজনের কোলে একটা পিকিং স্প্যানিয়েল। পাশে বসে একজন প্রৌঢ় আর খানদানী চেহারায় এক সম্ভ্রান্ত যুবক—চোখের আইগ্লাস চোখেই লাগানো—দস্তানা পরা দু আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে নিভে গেছে। মৃত্যু অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ায় প্রত্যেকেই প্রস্তরমূর্তির মত বসে যে যার জায়গায়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক শেষ মুহূর্তেও কলার আলগা করার চেষ্টা করেছিলেন ভাল করে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে, কিন্তু পারেননি। গাড়ীর একপাশে ধরণীর ধুলোয় লুটিয়ে একজন ওয়েটার—ভাঙা গেলাস আর ট্রে পড়ে পাশে। আর একপাশে হাত বাড়িয়ে আছড়ে পড়েছে দুজন ভিখিরি—মৃত্যু কালেও চাইছে শেষ ভিক্ষা। মৃত্যু কিন্তু দয়া করেছে ওদের প্রত্যেককেই—এক ঝটকায় টেনে নিয়ে গেছে একই জায়গায়—উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র ইতর মহতের বাছবিচার সেখানে নেই। ভিখিরি, কুকুর, ওয়েটার, ধনবান—সবাইকেই প্রোটোপ্লাজম শূন্য অবস্থায় নিয়ে গেছে মোক্ষম চরম এক আঘাতেই।

আর একটা অসাধারণ ছবি দেখেছিলাম সেভেনোক্সে। রাস্তার বাঁ দিকে একটা মস্ত কনভেন্ট। সামনে অনেকখানি সবুজ মাঠ নেমে এসেছে ঢালু হয়ে। ঢালু এই মাঠের ওপর হাঁটু গেড়ে সারি সারি বসে স্কুলের ছেলেমেয়েরা। তাদের সামনে সারি দিয়ে বসে সন্ন্যাসিনীর দল। সবার ওপরে একটি মাত্র মূর্তি—নিশ্চয় মাদার সুপিরিয়র। ফূর্তিবাজ ঐ কজন মানুষের মত কিন্তু এরা ফূর্তি নিয়ে মশগুল থাকেনি—মৃত্যু আসছে টের পেয়ে মরণাতীত মহাপুরুষের চরণবন্দনায় নিমগ্ন হয়েছিল। তাই এমন সুন্দর ভাবে শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে শিক্ষিকারাও শেষ শিক্ষা নিয়েছে প্রকৃতির শিক্ষায়তনে বসে।

লোমহর্ষক অতি-ভয়ানক এমনি অনেক দৃশ্য সেদিন দেখেছি, অনেক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। কি মনের অবস্থা নিয়ে মাইলের পর মাইল গিয়েছি, কি শোচনীয় আবেগে মন প্রাণ বিষণ্ণ হয়ে থেকেছে—তার আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমার মধ্যেই থাক—যা ঘটেছে শুধু সেইটুকুই বলা যাক। চ্যালেঞ্জার আর সামারলির মত পোড় খাওয়া দুই পুরুষও থ হয়ে গিয়েছিলেন। পেছন থেকে কেবল মাঝে মাঝে শুনেছি মিসেস চ্যালেঞ্জারের কান্না জড়ানো হাহাকার। লর্ড জন মড়া ছড়ানো রাস্তায় নির্বিঘ্নে গাড়ী চালানো নিয়েই ব্যস্ত—কথা বলার সময় নেই। তবে এরই মাঝে যখনই অতি-বিকট দৃশ্যের পাশ দিয়ে গিয়েছি, উনি এমন একটা মন্তব্য বার বার ছুঁড়ে দিয়েছেন যা শুনে নিয়তির শেষ বিচারের দিনেও আমার হাসি পেয়েছে।

"নিখুঁত। কি!"

মৃত্যু আর ধ্বংস যতবার বিশেষ বিকট রূপ নিয়ে প্রকট হয়েছে আমাদের সামনে, ততবার উনি এই একটি বিশেষ মন্তব্য ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন মহাঘাতকের উদ্দেশে—"নিখুঁত। কি।" স্টেশন হিলের গা বেয়ে রোদারফিল্ডে যাওয়ার সময়ে সমানে চেঁচিয়ে গেছেন "নিখুঁত। কি।"—লুইসহ্যাম আর ওল্ডকেন্ট রোডের মৃত্যু সড়ক বেয়ে উধাও হওয়ার সময়েও একই বুকনি বেরিয়েছে ওঁর কণ্ঠ থেকে—"নিখুঁত। কি।'

এইখানে এসেই কিন্তু হঠাৎ একটা মজার চমক খেলাম। কোণের বাড়ীর জানালা থেকে সরু শীর্ণ হাতে কে যেন রুমাল ওড়াচ্ছে। মৃত্যু যেখানে ব্যাপক এবং নিখুঁত, সেখানে আচমকা জীবন্ত হাতে রুমালের উড়ন দেখে একযোগে সব কটা হৃদপিণ্ডই ধড়াস করে ডিগবাজি খেয়ে এসে ঠেকেছিল গলার কাছে। প্রথমে স্থাণু হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই ফের উত্তাল হল হৃদযন্ত্র। তারপরেই পলক ফেলতে যেটুকু সময় লাগে, তার মধ্যেই ফুটপাতে

ঘেঁসে গাড়ী ব্রেক কষলেন লর্ড জন, দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামলেন রাস্তায় এবং সবাইকে নিয়ে কোণের বাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে বেগে ভেতরে ঢুকে তিনলাফে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন তিনতলার সামনের ঘরে রুমাল সংকেত দেখা গিয়েছে যে ঘরে।

খোলা জানালার সামনে চেয়ারে বসে এক অতি বৃদ্ধা মহিলা—বয়সের গাছ পাথর নেই যেন। কাছেই আর একটা চেয়ারে একটা অক্সিজেনের সিলিণ্ডার। যে সিলিণ্ডার আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে, তার চাইতেও ছোট—কিন্তু দেখতে একই রকম। আমরা ঘরে ঢুকতেই চশমাপরা শীর্ণ মুখ ফিরিয়ে বললেন—"বাকী জীবনটা দেখছি এই ঘরেই কাটাতে হবে। আমি যে অথর্ব, চলতেও পারি না।"

চ্যালেঞ্জার বললেন—"ভাগ্যিস আমরা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব? খুব দরকারী কথা কিন্তু। মন খুলে উত্তর দিতে হবে—ঢেকেঢুকে বলবেন না যেন। এই যে ব্যাপারট ঘটল, এর ফলে লণ্ডন অ্যাণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ন রেলওয়ে শেয়ারের দর পড়ে যাবে না তো?"

প্রশ্ন শুনে অন্য সময় হলে হো হো করে উঠতাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে হাসতে পারলাম না। পারলাম না বুড়ির মর্মান্তিক ঐকান্তিকতা দেখে। উনি ঠাট্টা করেননি—অন্তরের আগ্রহ নিয়ে জবাব চাইছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেল, ওঁর নাম মিসেস বাসটন। বিধবা। রোজগার বলতে সামান্য কিছু শেয়ারের লভ্যাংশ। লভ্যাংশ বাড়লে ভালমন্দ খাওয়া জোটে, কমলে কায়ক্লেশে চালাতে হয়; শেয়ার আছে বলেই বেঁচে আছেন—ওটি না থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। বুড়িকে পই পই করে বুঝিয়েও পারলাম না যে এ পৃথিবীর সব টাকাই এখন তাঁর, কিন্তু সে টাকা থেকেও নেই—পকেটে পুরেও লাভ নেই। এ সব নতুন কথা তাঁর পুরানো মনে ঢুকবে কেন? হাপুস নয়নে কাঁদতে বসলেন বুড়ি। শেয়ার উধাও—এ যে ভাবাও যায় না।

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন "ওগো, আমার কি হবে গো! শেয়ার ছাড়া যে আমার কিছুই নেই গো!"

কান্নাকাটির মাঝ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উদ্ধার করা গেল কি ভাবে বনের সব মহীরুহ সাবাড় হয়ে যাবার পরেও তাঁর মত একটি জরাজীর্ণ শুঁটকে গাছ বেঁচে গিয়েছে। বুড়ির হাঁপানির ব্যারাম আছে। তার ওপর একেবারেই অথর্ব—চলৎশক্তিহীন। অক্সিজেন ছাড়া একদণ্ড চলে না। ডাক্তারের বিধান মত একটা টিউব সব সময়ে হাতের কাছে থাকে সংকট মুহূর্তে নাকে দেওয়ার জন্যে। নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হলেই অক্সিজেন শোঁকা তাঁর অভ্যেস। সেই অভ্যেসমত টিউব খুলে সমানে অক্সিজেন নিয়েছেন সারা রাত্রি—বেঁচেও গিয়েছেন। সকালের দিকে নিঃশ্বাসের কষ্ট আর না থাকায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আমাদের গাড়ীর আওয়াজে জেগেছেন। বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বুঝে খাবার দাবার এবং অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র এমনভাবে হাতের কাছে সাজিয়ে রাখলাম যাতে অসুবিধে না হয়। বলে এলাম, দিন দুয়েকের মধ্যে ফের আসব। বুড়ির কান্না কিন্তু থামল না। শেয়ার হারানোর শোকে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন আমরা পেছনে ফেরার পরেও।

টেম্স নদীর দিকে যতই এগিয়েছি, রাস্তায় মড়ার গাদা ততই বেড়েছে। বাধার পর বাধা পড়েছে। লণ্ডন ব্রিজ পেরোতে কালঘাম ছুটে গেছে। মিডলসেক্স যে দিকে, সেইদিকের রাস্তায় এত গাড়ীঘোড়া এলোপাতাড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে যে তার মধ্যে দিয়ে পথ বার করতে লর্ড জন বেচারী হিমসিম খেয়ে গেলেন। ব্রীজের কাছে জেটির পাশে একটা জাহাজ জ্বলছে—ভুষো আর ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার—কটুগন্ধে টেঁকা দায়। পার্লামেণ্ট হাউসের দিকেও ঘনকালো ধোঁয়া আকাশে উঠছে—কিন্তু এতদূর থেকে দেখা গেল না কি জ্বলছে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে লর্ড জন বললেন—"মরা লণ্ডনের চাইতে গ্রাম অনেক ভাল—অনেক ফুর্তিতে থাকা যাবে। জানিনা আপনাদের কি রকম লাগছে। আমি কিন্তু শুধু দেখতে এসেছি—দেখা শেষ হলেই বোদারফিল্ডে ফিরে যাবো।"

প্রফেসর সামারলিও সায় দিলেন—"খামোকা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কি আছে এখানে?"

চ্যালেঞ্জারের বিষম ভারী গলা গম গম করে উঠল ভীষণ নিস্তব্দতাকে খান খান করে দিয়ে—"কিন্তু সত্তর লক্ষ লোকের মধ্যে শুধু একজনই স্রেফ অথর্ব হওয়ার দরুন আর নাকে অক্সিজেন লাগিযে রাখার জন্যে বেঁচে গেল, এ কথা তো মানতে পারছি না। কে জানে আরো অনেকে ঐ ভাবে কপালজোরে বেঁচে গিয়েছে কিনা।"

"বেঁচে থাকলেও খুঁজে বার করবে কি করে শুনি?" বললেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। "তাহলেও যতক্ষণ পারি ঘুরে দেখা যাক—ফেরার কথা পরে।"

নেমে পড়লাম গাড়ী থেকে। কিং উইলিয়াম স্ট্রীটের ফুটপাতে কাতারে কাতারে লোক ধরাশায়ী—পা ফেলার জায়গা নেই। মানুষ টপকে, পাশ কাটিয়ে কোনমতে একটা মস্ত ইন্সিওরেন্স অফিসের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলাম ভেতরে। বাড়ীটা রাস্তার কোণে এবং লণ্ডন শহরটার সবদিক সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে একটা ঘরে দেখলাম মস্ত গোল টেবিলের চারধারে বসে আটজন প্রবীন পুরুষ। বোর্ডরুম নিশ্চয়—মিটিং চলছে ডিরেক্টরদের। পেল্লায় জানলা খোলাই রয়েছে। আমরা দাঁড়ালাম বারান্দায়। লণ্ডন শহর আজ যেন ফেটে পড়েছে লোকের ভীড়ে—যেদিকে দুচোখ যায়, সেই দিকেই ফুটপাতে, রাস্তায়, বারান্দায়, জানলায় কেবল মানুষ। টাটকা হাওয়ার প্রাণান্ত চাহিদা সবাইকেই টেনে এনেছে বাইরে। পায়ের নীচে রাস্তা কালো হয়ে গিয়েছে সারি সারি ট্যাক্সির ভীড়ে—কালো মাথাগুলোই কেবল

দেখতে পাচ্ছি। সব ট্যাক্সির মুখ কিন্তু শহরের বাইরের দিকে। মৃত্যুর মুহূর্তে শহরবাসীদের গ্রামের কথা মনে পড়েছিল। আতংকে দিশেহারা হয়ে আত্মীয় স্বজন নিয়ে পল্লী-অঞ্চলের উদার বাতাসে গিয়ে নিঃশ্বেস নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। ট্যাক্সির ভীড়ে গাড়ীঘোড়ার অবরুদ্ধস্রোতে মাঝে মাঝে সূর্যালোকে ঝকঝক করছে বিরাট বড়লোকদের অতি-মূল্যবান গাড়ীগুলো—অতবড় গাড়ী নিয়ে এক ইঞ্চিও পথ পায়নি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিয়তির মার খেয়েছে। বারান্দার ঠিক নিচেই একটা প্রকাণ্ড বিলাসবহুল গাড়ীর জানলা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে স্থূলকায় মালিকের আধখানা বপু—হীরের আংটি বসানো হাত নেড়ে শেষ মুহূর্তেও দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ড্রাইভারকে ধমকাচ্ছেন ভীড়ের ওপর দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।

বন্যার জলে জেগে থাকা দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে কয়েকটা বড় বাস—ছাদে পর্যন্ত উঠেছে যাত্রীরা। পরস্পরের কোলে শিশুর মত মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে শেষ ঘুম। যেন ছেলেদের খেলনা-ঘরের খেলনা। রাস্তার মাঝখানে ল্যাম্পপোষ্টের নিচে হেলান দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ—দেখে মনেই হয় না দেহে প্রাণ নেই। পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে ছেঁড়া পোশাক পরা একটা ছেলে—খবরের কাগজের ডাঁই পড়ে পাশে। কাগজ ফেরী করে গেছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। একটা কাগজের গাড়ী ভীড়ে পথ পায়নি—দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার ঠিক মাঝখানে। অত উঁচু থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম হলদের ওপর বড় বড় কালো হরফে লেখা—"লর্ডস-য়ের মাঠে ভীষণ দৃশ্য। প্রদেশ ম্যাচ স্থগিত।" শেষ শহর সংস্করণ এটা নয়। কেননা, তার পরেই দেখলাম অন্যান্য প্ল্যাকার্ডে কিংবদন্তীর মত সেই খবর—"এই কি শেষ? বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সতর্কবাণী।" অথবা—"চ্যালেঞ্জারের হুঁশিয়ারি কি যুক্তিযুক্ত? ভয়ংকর গুজব।"

জনবাহন-সমুদ্রে পতাকার মত নজর কেড়ে নেওয়া প্ল্যাকার্ড-গুলোর দিকে স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন চ্যালেঞ্জার। খুব তৃপ্তির সঙ্গেই আঙুল তুলে সহধর্মিনীকে দেখালেন তাঁর কীর্তি—অন্য হাতটা খেলা করতে লাগল দাড়ি আর বুকের ওপর। তখুন শহরটা যে মরণ কালে তাঁর নাম নিয়েছে এবং ঐ নাম জপ করতে করতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, বিকৃত সেই আত্মশ্লাঘায় যেন অপরিসীম উল্লসিত তাঁর জটিল মন। উল্লাসটা প্রকট হয়েছিল একটু বেশী মাত্রায়—তাই ঝটিতি বিদ্রূপতীক্ষ্ণ মন্তব্য ছুঁড়ে মারলেন কুঁচলে বন্ধু সামারলি।

শুধু বললেন—"চ্যালেঞ্জারের পাবলিসিটির শেষ চেহারা. চারিদিকেই জয়গান।"

"সেই রকমই মনে হচ্ছে", পরমনির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার। রশ্মিরেখার মত দিকে দিকে বিস্তৃত সুদীর্ঘ সড়ক বোঝাই মৃত্যুর পানে তাকিয়ে বললেন—"লণ্ডনে থেকে সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই। রোদারফিল্ডে গিয়ে বরং হাতের কাজ শেষ করা যাক।"

অনেক মর্মন্তুদ দৃশ্যই সেদিন মৃতের শহর থেকে বহন করে এনেছি স্মৃতির ভাঁড়ারে। একটা দৃশ্য না বলে থাকতে পারছি না। হাম্বার গাড়ী যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেণ্ট মেরীর গির্জে তার পাশেই। ওই গাড়ীতে ওঠার আগে ফুটপাতের মড়া ডিঙিয়ে ঢুকেছিলাম খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে। দেখেছিলাম এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। দেখেছিলাম কাতারে কাতারে মানুষ নতজানু হয়ে বসে অত বড় গির্জের সর্বত্র' এক ইঞ্চি জায়গাও বুঝি আর নেই কোথাও। আকুল আবেদন আর আত্যন্তিক আর্তির ভঙ্গিমা পরিস্ফুট প্রত্যেকে চোখে, মুখে, ভাবে, ভঙ্গিমায়। ভয়ংকর সেই মুহূর্তে, দলে দলে ভয়ার্ত মানুষ ছুটে এসেছে বহুদিনের পরিত্যক্ত এই গির্জের মধ্যে—নিষ্ঠুর বাস্তবকে প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে উপলব্ধি করেছে—কিন্তু এড়িয়ে যেতে পারেনি পরম পিতাকে স্মরণ করেও। উত্তেজনায় টুপী খুলতেও ভুলে গিয়েছে অনেকে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বোধহয় সান্ত্বনা বাক্য শোনাচ্ছিলেন

এক তরুণ বক্তা—বক্তৃতা শেষ করে যেতে পারেন নি। প্রচার বেদীতে ঝুলছে তাঁর দেহটা। মাথা সামনে, দুহাত দুপাশে। ধূলি ধূসরিত সেই পরিত্যক্ত গির্জের মধ্যে এতগুলি বেদনাবিধুর মানুষকে ঐভাবে শ্বাসরোধী স্তব্ধতার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে মনে হল যেন একটা বিকট ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখেছি—এ যেন একটা নিশার আতংক—অলীক, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। জোরে কথা বলতে পারলাম না। কানে কানে চুপিসারে ফিসফিস করতে করতে পা টিপে টিপে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম বাইরে।

বুদ্ধিটা মাথায় এল ঠিক তখনি। গির্জের এক কোণে পবিত্র প্রাচীন জলাধারের পেছনে অন্ধকার খাঁজের মধ্যে ঝুলছে ঘণ্টার দড়ি। এক আধটা নয়—অনেকগুলো। টানলেই বাজবে ঘণ্টা। টানলে হয় না? ঘণ্টা বাজিয়ে সারা লণ্ডন শহরকে জানিয়ে দিলে হয় না আমরা আছি? মানুষ এখনো আছে? কে আছো, ছুটে এসো গির্জেয়? তৎক্ষণাৎ পড়ি কি মরি করে দৌড়ে গেলাম কাপড়ের ফালি জড়ানো দড়ির সামনে। কিন্তু টানতে গিয়ে বুঝলাম কাজটা অত সোজা নয়। তিলমাত্র দোলাতে পারলাম না অতগুলো ঘণ্টার একটাকেও। দেখে, হন হন করে এগিয়ে এলেন লর্ড জন।

গায়ের কোট খুলতে খুলতে বললেন সোল্লাসে—"ছোকরার মাথা আছে বটে। এসো, আমিও হাত লাগাই।"

কিন্তু হার মানলেন লর্ড জনও। শেষকালে চ্যালেঞ্জার আর সামারলিও ঝুলে পড়লেন দড়ি ধরে। চারজনের সম্মিলিত হ্যাঁচকা টানে অবশেষে নড়ে উঠল প্রকাণ্ড ঘণ্টার জিভ—শুরু হল বাজনা। দূর হতে দূরে সৌধ শ্রেণীর মাথার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে গেল বেসুরো ঘণ্টাধ্বনি মারফৎ আমাদের আহ্বান—কে কোথায় আছো, বেঁচে যদি থাকো, ছুটে এসো জীবিত জাতভাইদের কাছে। ধাতব সঙ্গীতে নেচে উঠল আমাদের অন্তরও। তীক্ষ্ণ, গম্ভীর, প্রচণ্ড আওয়াজে লণ্ডন কাঁপছে। কাঁপছে আমাদের ভেতরটাও। আমরা

যেন পাগল হয়ে গেলাম। ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে দড়ি ধরে লাফ দিয়ে উঠলাম মাটি থেকে দু ফুট ওপরে, নেমে এলাম সর্বশক্তি দিয়ে দড়ি টানতে টানতে। সবচেয়ে খর্বকায় চ্যালেঞ্জারের আসুরিক নাচের সেই দৃশ্য ভোলবার নয়। "যেন একটা দানবিক কোলাব্যাঙ তেড়ে মেড়ে লাফিয়ে উঠেই ঝপাং করে ফেব ঝাঁপিয়ে পড়ছে মাটিতে। বিধাতার কি লীলা। আমরা চারজনে এর আগে কত ভয়ংকর অ্যাডভেঞ্চারেই না গা ভাসিয়েছি— কিন্তু বেঁচে ছিলাম কি শুধু এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যেই ? ঘণ্টার দাঁড ধরে ঝোলাব জন্যে ? মৃত লণ্ডনে প্রাণের সন্ধান করার জন্যে ? দড়ি ধরে চারজনের সেই উন্মত্ত তাণ্ডব নাচ কিন্তু ছবি তুলে রাখার মত। আধঘণ্টা এক নাগাড়ে দড়ি টেনে টেনে শেষকালে জিভ বেরিয়ে গেল। ঘেমে নেয়ে গেলাম। দড়ি ছেড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম থামওয়ালা বারান্দায়। সাগ্রহে চাইলাম মড়া-ছড়ানো নিস্তব্ধ রাস্তায়। কিন্তু কেউ এল না, কেউ সাড়া দিল না, কেউ নড়েও উঠল না।

নিঃসীম হতাশায় তাই হাহাকার করে উঠেছিলাম শেষকালে—"নেই। নেই। কেউ নেই। বৃথা চেষ্টা।"

মিসেস চ্যালেঞ্জারও বললেন—"আর কিছু করার নেই, জর্জ। চলো, ফিরে যাই রোদারফিল্ডে। এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে পাগল হয়ে যাব।"

নীরবে উঠে বসলাম গাড়ীতে। লর্ড জন গাড়ী পেছিয়ে এনে ঘুরিয়ে নিলেন দক্ষিণ দিকে। বেরিয়ে এলাম লণ্ডনের বাইরে। তখন মনে হয়েছিল ফুরিয়ে গেল বুঝি একটা অধ্যায়। স্বপ্নেও ভাবিনি শুরু হতে চলেছে আর একটি অধ্যায়—আরো বিচিত্র, আরো চমকপ্রদ।

৬। মহাজাগরণ

অত্যাশ্চর্য এই ঘটনার শেষটুকু এবার শুরু করি। এ ঘটনায় শুধু আমার জীবনটাই আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে বললে কম বলা হবে। মানুষ জাতটার ইতিহাসে এরকম গুরুত্বপূর্ণ আশ্চর্য ব্যাপার আর ঘটেনি। সে ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, দেখা যাবে পাহাড়ের সামনে উইঢিবির মতই পৃথিবীর আব সব বৃহৎ ঘটনাই নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর অসামান্য এই ঘটনার তুলনায়। এ শিক্ষার দরকার ছিল আমাদের। নিয়তি বক্র ক্রুর হেসে এই যুগটাকেই চিহ্নিত করেছিলেন চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। তবে ভবিষ্যতের কথা বলা ভার। মার খেয়েও মাথা হেঁট রাখার শিক্ষা আমরা কদ্দিন মনে রাখতে পারব, তা জানে শুধু ভাবীকালের মানুষরাই। তবে চিরকাল এভাবে আর যাবে না—দিনকাল পালটাবেই—আগের অবস্থাও আর থাকবে না। অদৃশ্য হাতের মার এত সহজে ভোলা যায় না। চোখের পলক ফেলার আগেই এই হাতের মারে আমরা শেষ হতে বসেছিলাম—হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম অদৃশ্য সেই শক্তির সামনে আমরা কতখানি অসহায়, অজ্ঞ, অর্বাচিন। মৃত্যু তো এসেই গিয়েছিল—যে কোনো মুহূর্তে আবার তা আসতে পারে। এখন থেকে পায়ে পায়ে ফিরবে ছায়াশরীরী ভযংকর মৃত্যু, পদে পদে মনে করিয়ে দেবে আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্তব্য, জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনের অর্থ; ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে সমাজ সংসারকে গড়ে তোমার যে চেষ্টা আমাদের রক্তে প্রবহমান সৃষ্টির শুরু থেকে—মৃত্যুর করাল ছায়ার মধ্যে থেকে তীব্র সেই কর্তব্যবোধই কি আরো তীব্র, আরো সক্রিয় হয়ে উঠবে না? বাঁধাধরা নীতি, আদর্শ, দায়িত্বর বুলি কপচে কখনোই তা সম্ভব নয়। দৃষ্টিভঙ্গী পালটাতে

হবে, আমাদের দৌড় যে বেশী দূর নয় তা বুঝতে হবে এবং অজানা মহাশক্তির পাদদেশে যে আমরা কতদূর অসহায় অক্ষম তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। যে শিক্ষায় বসুন্ধরায় জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়, সে শিক্ষায় মানুষের দুঃখ কখনো বাড়ে না—এমন ধারণাও যেন কেউ করবেন না। এককালে মানুষ হেসে খেলে খেয়ে দেয়ে বড় বড় বাড়ি বানিয়ে হৈচৈ করে জীবন কাটিয়ে গিয়েছে। কিন্তু একালে আমরা সংযম এনেছি আমোদ প্রমোদে, কিন্তু বাড়িয়ে চলেছি জ্ঞানের পরিধিকে। প্রগতি ঘটছে অনেক দ্রুততালে—আগের মত শূন্য জীবন কারোরই নয়। বাড়তি অর্থে বাড়ছে সমাজের শ্রী—উন্নতি ঘটছে সবার—মুষ্টিমেয় কজনের নয়। অনেক সংযত সুন্দর হয়ে উঠেছে এ-যুগের সামগ্রিক জীবন।

মহাজাগরণ শুরু হল ঠিক কখন, এ নিয়ে মতদ্বৈত আছে। এক এক দেশের সময় এক এক রকম। স্থানীয় পরিবেশের প্রভাবও এক রকম নয় ইথার বিষের ওপর, তবে প্রায় সব জেলাতেই মহাজাগরণ শুরু হয়েছিল প্রায় একই সময়ে। বিগবেনের কাটা নাকি তখন ছটা দশের ঘরে—সাক্ষী আছেন অনেকে। অ্যাসট্রনমার রয়ালের গ্রীনউইচ টাইম মতে ছটা বারো। লেয়ার্ড জনসনের মত পর্যবেক্ষকের মতে ছটা বিশ। হেব্রাইডের মতে সাতটা। চ্যালেঞ্জারের ভীষণ নিখুঁত ক্রনোমিটারের মতে সোয়া ছয়—সেই মুহূর্তে ঘড়ির পানে তাকিয়ে আমি বসেছিলাম চ্যালেঞ্জারের পড়ার ঘরে।

বসেছিলাম নিঝঝুম অন্তরে। বিষাদ পাহাড়ে যেন চাপা পড়েছিল আমার সত্তা। ফেরার পথে ভয়ংকর দৃশ্যগুলোর স্মৃতি একযোগে অসাড় করে তুলেছে আমার ভিতরটা। আমার শরীর মজবুত, এনার্জি অফুরন্ত—মন খারাপ করে বসে থাকা তাই আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি। আইরিশ চরিত্র তো—নৈরাশ্যের অন্ধকারেও মজা পাই, আশার আলো খুঁজি। সেই আমিই ভেঙে পড়েছি—মন থেকে

বিষাদের বোঝা নামাতে পারছি না কিছুতেই। আর সবাই এক তলায় বসে ভবিষ্যতের প্ল্যান আঁটছেন। খোলা জানলার পাশে হাতে চিবুক রেখে মুখ কালো করে আমি ভাবছি দুর্দৈবের কথা। বেঁচে থাকব কিনা, এই প্রশ্নটাই ঘুরে ফিরে আসছে মনের মধ্যে। মরা পৃথিবীতে বাঁচা কি আদৌ সম্ভব হবে? পদার্থ বিদ্যায় বলে, বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। মানুষ জাতটার বৃহৎ অংশটাই তো অজানা উজানে ভেসে গিয়েছে—পরিত্যক্ত এই ক্ষুদ্র অংশটাকেও কি টেনে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত? কিন্তু কিভাবে? এবারের মৃত্যু আসবে কোন পথে? কিরূপে? নতুন করে হানা দেবে না তো মহাবিষ? পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো মড়াগুলো পচে গলে নতুন কোন বিষ ছড়িয়ে দেবে না তো আকাশে বাতাসে—দূষিত সেই আবহাওয়ায় বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে না তো ধরিত্রী? অথবা আমরা পাগল হয়ে যেতে পারি। ভয়াবহ এই পৃথিবীতে মনের ভারসাম্য বজায় না রাখতেও পারি। মৃত পৃথিবীতে বিচরণ করবে তখন বিকৃত মস্তিষ্ক ক'টি মানুষ। রক্ত হিম করা এই সব চিন্তা নিয়ে মন যখন ব্যাপৃত, ঠিক সেই সময়ে খুটখাট কতকগুলো আওয়াজ শুনে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পাহাড় বেয়ে উঠে আসছে বুড়ো বেতো ঘোড়াটা।

পাখীদের কলতান কানে আছড়ে পড়ল একই সময়ে। শুনলাম নিচের উঠোনে কাশির শব্দ। চোখের কোন দিয়ে টের পেলাম, নিসর্গ-পটে সঞ্চরমান অনেক কিছুর অস্পষ্ট আভাস। চোখ আটকে রইল কিন্তু বুড়ো, বেতো, জরাজীর্ণ ঘোড়াটার দিকে—অসম্ভব সেই দৃশ্যই জুড়ে রইল আমার সমস্ত চেতনা। কষ্টে স্বষ্টে পা বেঁকিয়ে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে বৃদ্ধ অশ্ব—বহু আগেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল যার। মন্ত্রমুগ্ধের মত এবার তাকালাম ঘোড়ার পেছনে—বক্সে বসে চাবুক হাঁকড়াচ্ছে গাড়োয়ান। সঞ্চরমান দৃষ্টি নেমে এল জানলায়—আরোহী ছোকরা মুখ বাড়িয়ে ক্ষিপ্তের মত হাত নেড়ে

পথ নির্দেশ দিচ্ছে গাড়োয়ানকে। জীবিত ওরা প্রত্যেকেই—কোন সন্দেহই নেই তাতে এবং এই পরম সত্যটাই চরম আঘাতে পঙ্গু করে তুলেছে আমার দেহমনকে।

বেঁচে আছে, আবার বেঁচে আছে সবাই। তবে কি স্বপ্ন দেখছিলাম? মরীচিকা দেখে ভুল করেছিলাম? পয়জন বেল্টের আবির্ভাব কি তাহলে স্রেফ মনের ধোঁকা? নিশার দুঃস্বপ্ন? যা দেখছি সবই তাহলে মিথ্যে? চোখ নামিয়ে তাকালাম হাতের জলভরা ফোস্কার দিকে—ঘণ্টার দড়ি টানতে গিয়ে হাতের বারোটা বাজিয়ে বসে আছি। এটা তো মিথ্যে নয়! মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। পৃথিবী আবার বেঁচে উঠেছে। নবজাগরণের ঢেউ এসেছে ধরণীতে। শুরু হয়েছে পুনর্জীবন—গোটা পৃথিবী জুড়ে এসেছে প্রাণের জোয়ার। তাকালাম প্রকৃতির পশ্চাৎপটের পানে। ভীষণ অবাক হয়ে দেখলাম, যেখানে যেভাবে প্রাণ থেমে গিয়েছিল, ঠিক সেখান থেকেই অবিকল সেই ভাবেই প্রাণ আবার চলতে শুরু করেছে। গলফ খেলোয়াড়রা খেলা সুরু করে দিয়েছে—সবুজ মাঠে গর্তের দিকে বল গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চাষীরা ধুলোঝেড়ে উঠে চলেছে ক্ষেত অভিমুখে। আয়া মেয়েটা ঠাস করে চড় মারল একটা বাচ্চাকে—তারপর পেরামবুলেটর ঠেলে ঠেলে উঠে আসছে ওপরে। সকলেই যে যার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে ব্যস্ত—খেয়াল নেই মাঝখানে কি ঘটেছে।

দুপদাপ করে দৌড়ে নেমে গিয়ে দেখি হলঘরের দরজা খোলা। বন্ধুদের উচ্চ কণ্ঠের বিস্মিত চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছি বাইরের উঠানে। আমি ছুটে যেতেই হৈ হৈ করে সবাই করমর্দন করলেন। আনন্দের চোটে মিসেস চ্যালেঞ্জার আমাদের সবাইকে চুমো টুমো দিয়ে অস্থির করে তুলে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামী দেবতার ভালুক-আলিঙ্গনে?

তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে লর্ড জন বললেন—"ওরা কি তাহলে

ঘুমোচ্ছিল? ও মশাই চ্যালেঞ্জার, কি যে উল্টোপাল্টা বলেন মাথামুণ্ডু হয় না! প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে হাত পা শক্ত করে দাঁত খিঁচিয়ে হাসতে হাসতে কেউ ঘুমোয়? বললেই হল?"

"এ হল এক ধরনের মৃগী রোগ", বললেন চ্যালেঞ্জার। "এককালে অনেক জ্বালিয়েছে। মনে হত যেন রুগী পটল তুলেছে। টেম্পারেচার নেমে যায়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, নাড়ি এত ক্ষীণ হয়ে যায় যে ধরাই যায় না—মৃত্যুর সব লক্ষণই ফুটে ওঠে—ক্ষণস্থায়ী মৃত্যুর মতই আর কি। খুব ছুঁদে চোখেও—" বলতে বলতে চোখ বন্ধ করে মুখ টিপে হেসে উঠলেন—"বিশ্বব্যাপী ক্ষণস্থায়ী মৃত্যুর আসল চেহারা ধরা পড়ে না।"

সামারলি বললেন—"আপনি বলছেন মৃগী-রোগ—কিন্তু ইথারের বিষে আসলে কি হয়েছে কেউই তা জানি না। তার চাইতে ববং বলা যাক, বিষাক্ত ইথারে সাময়িক মৃত্যু হয়েছিল পৃথিবীর।"

গাড়ীর পাদানিতে জবুথবু হয়ে বসেছিল অস্টিন। ওপর থেকে ওরই কাশির শব্দ শুনেছিলাম। দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসেছিল এতক্ষণ। এখন ঘাড় ফিরিয়ে ঢুলঢেরা চোখে দেখছে গাড়ীর পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত, আর বকর বকর করছে আপন মনে।

"মাথামোটা পাজী বজ্জাত! ফের হাত দেওয়া।"

"কি হয়েছে, অস্টিন?"

"লুব্রিকেটর খুলে রেখে গেছে। মালির ছেলের কাজ নিশ্চয়! আবার হাত দিয়েছিল গাড়ীতে।"

অপরাধী চোখে তাকিয়ে রইলেন লর্ড জন।

অস্টিন অবশ্য তা দেখেনি। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"শরীরটা কেন এত ম্যাজম্যাজ করছে বুঝছি না। হোসপাইপ দিয়ে গাড়ী ধুতে ধুতে হঠাৎ কেন যে মাথা ঘুরে উঠল, তাও জানি না। মাথা ঘুরে পা দানিতে পড়েও গেছিলাম মনে হচ্ছে—অবশ্য সামলে

নিয়েছিলাম তখুনি। কিন্তু দিব্যি গেলে বলছি স্যার, লুব্রিকেটরের কল আমি খুলিনি।"

অস্টিনকে তখন অল্প কথায় সরলভাবে বুঝিয়ে বলা হল সমস্ত ব্যাপারটা। শুনে তো সে অবাক। সে কি কথা? পৃথিবীর সব প্রাণী এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল? সে-ও বাদ যায় নি? লুব্রিকেটরের কল খোলা কেন, শুনে বিশ্বাস করল না একবর্ণও। আনাড়ি হাতের ড্রাইভিংয়ে গাড়ী লণ্ডন ঘুরে এসেছে বললেই বিশ্বাস করতে হবে? ঘুমন্ত লণ্ডন নগরীর লোমহর্ষক বর্ণনাটা শুনল কিন্তু তন্ময় হয়ে। শোনবার পর যে মন্তব্যটা করেছিল, তা এখনও মনে আছে অক্ষরে অক্ষরে।

জিজ্ঞেস করেছিল—"ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের সামনে গিয়েছিলেন?"

"গেছিলাম বইকি।"

"দেখলেন নোটের পাহাড় নিয়ে ঘুমোচ্ছে ব্যাঙ্কের সবাই?"

"আরে হ্যাঁ।"

"ইস্। আমি যদি থাকতাম।" সত্যিই মুখখানা শুকিয়ে গেল বেচারীর। ফের হোসপাইপ নিয়ে জল ঢালতে লাগল গাড়ীর গায়ে। হঠাৎ কড়মড় আওয়াজ শুনলাম নুড়ি-ছাওয়া বাগানের পথে। ঝরঝরে ছ্যাকরা গাড়ীটা হুড়মুড় করে শেষকালে চ্যালেঞ্জারের বাড়ীতেই ঢুকে পড়েছে। একটু পরেই পরিচারিকা দারুণ এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠা উস্কখুস্ক, হতভম্ব মূর্তি নিয়ে দৌড়ে এসে ট্রে বাড়িয়ে ধরল চ্যালেঞ্জারের সামনে—ওপরে একটা কার্ড। কার্ডটা তুলে নিয়ে একবার মাত্র চোখ বুলিয়েই নাকের মধ্যে দিয়ে ক্রুদ্ধ হুংকার ছাড়লেন চ্যালেঞ্জার। রাগের চোটে দেখতে দেখতে যেন খাড়া হয়ে উঠল মাথার কালোচুল।

"আবার খবরের কাগজের লোক।" সে কি বাজখাঁই চীৎকার! তারপরেই অবশ্য আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটল ঠোঁটে—"তাতো

আসবেই। এতবড় একটা উপসংহার সম্পর্কে আমার মন্তব্য জানতে সারা পৃথিবী এখন তো আসবেই।"

সামারলির গা জ্বলে গেল যেন। বললেন—"আবোল তাবোল যা হয় একটা বললেই হল? ও-তো রাস্তায় পড়েছিল এতক্ষণ। জানবে কি করে?"

কার্ডটা তুলে নিয়ে পড়লাম—"জেমস বাক্সটার, লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা, নিউইয়র্ক মনিটর।"

জিজ্ঞেস করলাম চ্যালেঞ্জারকে—"দেখা করবেন?"

"না।"

"উফ্ জর্জ, এত কাণ্ডর পরেও কি শিক্ষা হল না? কবে আর শোধরাবে? মানুষ দেখলেই তেড়ে যাওয়া ছাড়ো—একটু ভাল ব্যবহার কর।"

ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে গোঁয়ারগোবিন্দর মত মাথা নাড়তে নাড়তে চ্যালেঞ্জার বললেন—"রিপোর্টার জাতটাই খারাপ—পেশাটাই বিষাক্ত—তাই না ম্যালোন? ভণ্ডতপস্বীদের হাতে আধুনিক সভ্যতার তৈরী ব্রহ্মাস্ত্র—আত্মসম্মানসম্পন্ন মানুষদের অন্তরায়। বলতে পারো কবে এরা আমার প্রশংসা করেছে?"

"আপনিও কি বলতে পারেন কবে ওদের প্রশংসা করেছেন? মুখে মুখে জবাব দিলাম আমি। "কেন মিছে চেঁচামেচি করছেন? ভদ্রলোক এতটা পথ এসেছেন দেখা করতে, দেখা না করে হাঁকিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে", গজরাতে গজরাতে বললেন চ্যালেঞ্জার। "তুমিও এসো সঙ্গে—কথা যা বলবার তুমিই বলবে। বাড়ী বয়ে এসে এই উপদ্রব কিন্তু সহ্য করব না—আগেই বলে রাখলাম।" বলে গজ গজ ফ্যাঁস ফ্যাঁস করতে করতে বদমেজাজী বেয়াড়া মাস্টিফ কুত্তার মত দুমদাম পদক্ষেপে এলেন পেছন পেছন।

অতি-তৎপর সাংবাদিক ছোকরা কিন্তু ওঁকে দেখেই নোট বই খুলে সরাসরি চলে এল কাজের কথায়।

"পৃথিবীর আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আমেরিকার মানুষ আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়, আমি তাদের প্রতিনিধি।"

"পৃথিবীর আর কোন আসন্ন বিপদ আছে বলে আমার জানা নেই," রুক্ষ, রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার।

ছোকরা হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে—"বিষাক্ত ইথারের মধ্যে পৃথিবীর গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম।"

"এরকম কোন বিপদ এখন আসছে বলে মনে হয় না আমার।"

শুনে আরো ঘাবড়ে গেল ছোকরা।

বললে—"আপনিই তো প্রফেসর চাঞ্জোর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম।"

"তাহলে কেন বলছেন এখন আর বিপদ নেই? আজকের টাইমস্ পত্রিকায় চিঠিখানা কিন্তু আপনারই লেখা।"

এবার অবাক হওয়ার পালা চ্যালেঞ্জারের।

চোখ কপালে তুলে বললেন—"আজকের টাইমস্? না তো, আজকে তো টাইম্‌স্ বেরোয় নি।"

মৃদু তিরস্কারের সুরে ছোকরা এবার বললে—"দেখুন মশায়, টাইম্‌স্ যে একটা দৈনিক কাগজ, সে খবর রাখেন?" বললে বলতে পকেট থেকে একখণ্ড টাইম্‌স্ বার করে চ্যালেঞ্জারের নাকের সামনে নাড়তে নাড়তে বললে—"এই সেই কাগজ।"

দুহাত ঘসে খক্ খক্ করে হেসে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। শুষ্ক নীরস ব্যাঙ্গের হাসি।

"তাই বলুন। এ কাগজ আজ সকালেই পড়েছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"পড়েই ছুটে এসেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আসবার পথে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছেন ?"

"তা করেছি। ইংরেজদের এ-রকম প্রাণবন্ত চেহারা এর আগে কখনো দেখিনি—যন্ত্র নয় মানুষ বলেই মনে হয়েছে। কুলিটা পর্যন্ত হাসিয়ে ছেড়েছে মজার গল্প শুনিয়ে।"

"আর কিছু ?"

"না তো। সে রকম কিছু মনে পড়ছে না।"

"ভিক্টোরিয়া থেকে বেরিয়েছিলেন কটায় ?"

মুচকি হেসে বললে মার্কিন তনয়—"আমি কিন্তু এসেছি কথা শুনতে—বলতে নয়। ঠিক উল্টোটা করে ছাড়ছেন আপনি।"

"ওতেই আমার মজা। সময়টা মনে আছে ?

"আলবৎ মনে আছে। সাড়ে বারোটা।"

"পৌঁছোলেন কখন ?"

"সোয়া তুটোয়।"

"ট্রেন থেকে নেমেই গাড়ী নিলেন ?

"হ্যাঁ।"

"এখান থেকে স্টেশন কদ্দূর মনে হয় ?"

"মাইল তুয়েক তো বটেই।"

"তু মাইল আসতো কতক্ষণ লেগেছে মনে হয় ?"

"আধঘন্টা তো বটেই—ঘোড়ার যা ছিরিছাঁদ—হেঁপো-রুগী কোথাকার।"

"তার মানে এখন তিনটে ?"

"আরও কয়েক মিনিট।"

"ঘড়ি বার করে সময়টা দেখুন।"

ঘড়ি বার করে চোখ বুলিয়েই চমকে উঠল মার্কিন-তনয়।

"কি আশ্চর্য! তিনটে কোনকালে পেরিয়ে গেছে। সূর্য ডুবু ডুবু—সন্ধ্যের আর দেরী নেই। এতো দেখছি আচ্ছা ঘোড়া! কি ব্যাপার বলুন তো ?"

"পাহাড়ে ওঠবার সময়ে অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করেছিলেন ?"

"করেছিলাম। এখন মনে পড়ছে, ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। গাড়োয়ানকে কি যেন বলতে গিয়েছিলাম—কালা কানে শুনতেও পাচ্ছিল না। গরমের জন্তেই বোধহয় মাথা ঘুরছিল—ঐ একবারই, আর হয় নি।"

"হ্যাঁ, ঐ একবারই—সারা পৃথিবীর তাবৎ মানুষ জাতটার মাথা-ঘুরে গিয়েছিল ঐ একবারই।" চ্যালেঞ্জার এবার বললেন আমাকে। "পলকের জন্তে চোখে ধোঁয়া দেখেছিল সব মানুষই। তারপর কি হয়েছে কারো মনে নেই। তাই যার যে কাজ যেখানে থমকে গিয়েছিল, ঠিক সেইখান থেকেই শুরু করেছে আগের মতই—যে ভাবে অস্টিন জল দিচ্ছে, গলফ খেলোয়াড়রা খেলা নিয়ে মেতেছে,—ঠিক সেই ভাবে ম্যালোন, তোমার কাগজের সম্পাদক মশাইও তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন দৈনিকের কাজ নিয়ে। হয়ত এতক্ষণে চমকেও উঠেছেন মাঝখানের এক দিনের সংখ্যা উধাও হতে দেখে।" বলেই আমাকে ছেড়ে ফের ধরলেন মার্কিন সাংবাদিককে এবং বললেন বেশ খোশ-মেজাজী গলায়—"বুঝলেন তো মহাসমুদ্রের মাঝে যেমন গাল্‌ফ ষ্ট্রীম, মহাকাশের মাঝেও তেমনি ইথারের স্রোত। পৃথিবী সেই স্রোত সাঁতরে পেরিয়ে এল এইমাত্র। খবর পাঠানোর সময়ে তারিখটাও খেয়াল রাখবেন। আজকে সাতাশে, শুক্রবার নয়- আটাশে, শনিবার। অর্থাৎ রোদারফিল্ড হিলে গাড়ীর মধ্যে বসে ছিলেন পাক্কা চব্বিশ ঘণ্টা।"

"আমার কথাটি মুড়োলো" বলে মার্কিন সংবাদিকের কায়দায় কাহিনীর ওপর যবনিকা টানছি এইখানেই। এরপর কি ঘটেছিল, তা নিশ্চয় অজানা নয় আপনার। সোমবারেই ডেলী গেজেটে আশ্চর্য এই উপাখ্যানের বিশদ বিবরণ বেরোতেই কাগজের কাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষে—সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিশ্ব—রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলাম আমি, শ্রীএডোয়ার্ড ম্যালোন। ক্রেমে

বাঁধিয়ে জাঁকালো শিরোণামাগুলো টাঙিয়ে রেখেছি ঘরের দেওয়ালে :

আটাশঘণ্টা ধরে দুনিয়া সংজ্ঞাহীন

অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা

চ্যালেঞ্জারের যুক্তিই অভ্রান্ত

আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার পরিত্রাণ

রোমাঞ্চকর বর্ণনা

অক্সিজেন কক্ষ

লোমহর্ষক মোটর চালনা

মৃত লণ্ডন

হারানো পৃষ্ঠার পুনরুদ্ধার

বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড এবং প্রাণহানি

আবার ঘটবে নাকি ?

সুদীর্ঘ এই নির্ঘণ্টের তলায় সাড়ে নয় কলম ঠাসা বর্ণন বেরিয়েছিল। সারা পৃথিবী যখন অচেতন, একজন কর্মনিষ্ঠ সাংবাদিক সারা দিনেরাতে যা দেখেছে শুনেছে—তার অনন্য-সাধারণ বিবরণ। পৃথিবী গ্রহের ইতিহাসে এই প্রথম, শেষ এবং একমাত্র বিবরণ হয়ে থাকবে তুলনাহীন এই উপাখ্যান। চ্যালেঞ্জার এবং সামারলি লিখেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে—কিন্তু আমি লিখেছি লোকপ্রিয় কাহিনী। লক্ষ লোকের অন্তরে জাগিয়েছি রোমাঞ্চ, বিস্ময়, শিহরণ ; প্রকৃত সাংবাদিকের কাজই তাই। অ্যান্টিক্লাইমাক্সই আমাদের উপজীব্য।

কিন্তু চটকদার শিরোনামা আর আত্মপ্রশস্তি দিয়ে এ কাহিনী শেষ করার অভিলাষ আমার নেই। শ্রেষ্ঠতম দৈনিকে অভাবনীয় এই কাণ্ড সম্পর্কে যে অতুলনীয় সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল, তা প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষকে ভাবিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। সম্পাদকীয়টি উচ্চনিনাদী—কিন্তু তারিফ করার মত।

পত্রিকাটি টাইমস্। সম্পাদকীয়টি এই:

"এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে অসংখ্য, অনন্ত, সুপ্ত শক্তি পরিবৃত অবস্থায় আমরা এই মানুষ জাতটা রয়েছি নেহাৎই সঙ্গীন অবস্থায়। সেকালের দূরদর্শী এবং একালের দার্শনিকরা বারবার এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন আমাদের। কিন্তু যে কোনো সত্যই বারবার আওড়ালে তার যাথার্থ এবং অকাট্যতা ম্লান হয়ে আসে—মনে আর দাগ কাটে না—এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। সত্যটা নতুন করে মর্মে ঢোকানোর জন্যে একটা জোরালো শিক্ষার, সত্যিকারের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অতি কঠোর, অতি ভয়ংকর, কিন্তু অতি হিতকর সেই মহাপরীক্ষা থেকে সদ্য নিষ্ক্রান্ত হয়েছি আমরা; মন এখনও আঘাতের আকস্মিকতায় পঙ্গু, কিন্তু চরিত্র শুধরেছে—প্রায়শ্চিত্তে ওষুধ ধরেছে—সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেছি আমাদের অক্ষমতা, আমাদের সীমিত ক্ষমতা। যে অদূরদর্শী অবিচক্ষণ ধ্যান ধারণা নিয়ে মূর্খের মত এ-যাবৎ থেকেছে পৃথিবী, কড়ায়-গণ্ডায় তার মাশুল গুনতে হয়েছে—সাংঘাতিক সেই মাশুলের স্বরূপ দেখে সারা দুনিয়া আজ স্তম্ভিত ভীত, সন্ত্রস্ত। মহাবিপর্যয়ের বিশদ বিবরণ এখনো সম্যক অবগত নই, কিন্তু ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসপ্রাপ্ত নিউ ইয়র্ক, অর্লিয়েন্স এবং ব্রাইটন মানুষ জাতটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অজ্ঞাত মহাশক্তির সামনে আমাদের অসহায়তা। মানব জাতির ইতিহাসে এবম্বিধ বিয়োগান্তক দুর্ঘটনা অপিচ ঘটেনি। জাহাজে জাহাজে এবং ট্রেনে ট্রেনে সংঘর্ষের সংবাদ-সংগ্রহ সম্পূর্ণ হলে পাঠক শিহরিত হবেন সেই বিবরণ পড়ে। তবে এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবরে দেখা যাচ্ছে, ইথারের বিষে চেতনা অসাড় হওয়ার আগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ট্রেনের ড্রাইভার এবং স্টীমারের ইঞ্জিনীয়াররা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ কিন্তু আমরা মোটেই ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ নিয়ে বিষণ্ণ নই—প্রাণহানি বা বিষয় সম্পত্তি নাশ জনিত যে শোক, একদিন তা

ম্লান হয়ে আসবেই চিত্তপটে। বিস্মৃত হব সবকিছুই। কিন্তু যা কোন দিনই ভুলব না এবং যা চিরকাল আমাদের কল্পনাকে ক্লিষ্ট, আচ্ছন্ন করে রাখবে, তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের এই মর্মন্তুদ কাহিনী। কোনদিনই আমরা ভুলতে পারব না সেই শিক্ষা, ভুলতে পারব না আমাদের দৌড় কত সামান্য। নশ্বর দেহে এই পার্থিব অস্তিত্ব পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দুর মতই যে টলটলায়মান—তা হাতে কলমে দেখিয়ে দিলেন সৃষ্টিকর্তা এবং আত্মপ্রসাদ চুরমার করে দিয়ে সজাগ করে দিলেন অবিবেচক মানুষ জাতটাকে। সংকটাকীর্ণ যাত্রা পথের সামনে পেছনে অতল রহস্যের মারাত্মক খাদ—ভবিষ্যৎ অনিশ্চিৎ। তাই আজ অন্তর্হিত আমাদের ঔদ্ধত্য—বিনয় আর ভাব-গাম্ভীর্যে রচিত চরিত্রের ভিত্তি-প্রস্তর। এবং এই ভিতের ওপরেই মহান মন্দিরের উপযুক্ত সেবক হওয়ার মত অধিকতর শ্রদ্ধাবনত, আন্তরিক আগ্রহী, উন্নততর জাতি গড়ে উঠুক, এই কামনাই করি—অন্তর দিয়ে।

ডিসইনটিগ্রেসন মেশিন

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মেজাজ আজ একেবারেই ঠিক নেই। পড়ার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, দরজার হাতলে হাত রেখেই শুনতে পেলাম তাঁর উচ্চনিনাদী কণ্ঠের সারা বাড়ী কাঁপানো স্বগত-ভাষণ:

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই নিয়ে দুবার রঙ নাম্বার বলতে হয়েছে। দ্বিতীয় ফোনটা এসেছে আজ সকালে। কি ভেবেছেন আপনি? টেলিফোন হাতে নিয়ে কোথাকার কে এক ইডিয়ট আমার মত একজন বিজ্ঞান সাধকের সাধনায় সমানে বিঘ্ন ঘটিয়ে চলবে? আর যেই বরদাস্ত করুক, আমি করব না। ম্যানেজারকে ডাকুন—এখুনি। কি বললেন! আপনিই ম্যানেজার? ম্যানেজার হয়েছেন ত। ম্যানেজ করেন না কেন? একটা জিনিস তো খুব ভালই ম্যানেজ করেছেন দেখছি—আপনার মাথায় যে বস্তু কস্মিনকালেও ঢুকবে না সেই রকম একটা দরকারী কাজ থেকে আমার মনটাকে সরিয়ে আনতে পেরেছেন। সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দিন। নেই? তা তো থাকবেনই না। ফের যদি অন্যের টেলিফোন এখানে আসে, আদালতে টেনে নিয়ে যাব আপনাকে—এই বলে দিলাম। মুরগীর কোঁকর কোঁ কানের ওপর একটা অত্যাচার - এই মর্মে এর আগে রায় দিয়েছে আদালত। আমি নিজে একবার সে মামলা জিতেছি। মুরগীর কোঁকর-কোঁ যদি অত্যাচার হতে পারে—টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং-ই বা হবে না কেন? পরিষ্কার মামলা। লিখে ক্ষমা চাইতে হবে। ঠিক আছে। ভেবে দেখব। গুড মর্নিং।"

ঠিক এই মুহূর্তে বুক ঠুকে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। খুবই খারাপ সময়ে ঢুকলাম। কপালে আজ অনেক দুর্গতি আছে দেখছি। রিসিভার নামিয়ে সেই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন প্রফেসর—আমি

গিয়ে পড়লাম একদম সামনে—রেগে আগুন সিংহের খপ্পরেই পড়লাম বলতে পারেন। প্রকাণ্ড দাড়ির চুল-টুল খাড়া হয়ে গিয়েছে, হাপরের মত বুকটা উঠছে আর নামছে নিদারুণ রাগে। কটমটে, ক্রুদ্ধ, উদ্ধত, ধূসর চোখে আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করলেন এমন ভাবে যে দেখেই প্রমাদ গণলাম। বুঝলাম, সামনে পেয়ে ঝালটা ঝাড়বেন আমার ওপরেই।

"হদ্দকুঁড়ে শয়তানের দল! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা মাইনে নিচ্ছে, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা!" শুরু হয়ে গেল কড়িকাঠ কাঁপানো তর্জন গর্জন—"নালিশ করছি, তখনও কিনা হাসি! কান আমার খাড়'—সব শুনেছি। ষড় করে আমাকে উত্যক্ত করার মতলব। গোদের ওপর বিষ ফোড়ার মত তুমিও এসে গেছো সকালটা নষ্ট করতে। কি দরকারে আসা হয়েছে জানতে পারি? নিজের দরকারে, না, আবার ইন্টারভিউ নেওয়ার মতলবে? মাথামোটা বস্‌টা আবার পাঠিয়েছে বুঝি? ত্যাখো ছোকরা, বন্ধুর মত এ বাড়ীতে একশ বার এসো—কিছু বলব না। কিন্তু খবরের কাগজের কাজ নিয়ে এলে তাড়িয়ে দেব দূর দূর করে।"

আমি শুনছি আর পাগলের মত পকেট হাতড়াচ্ছি। ম্যাকআর্ডলের চিঠি আর হাতে ঠেকছে না। আচমকা আবার কি যেন মনে পড়ে গেল চ্যালেঞ্জারের। মেজাজ আরো খারাপ করার মত ব্যাপার নিশ্চয়। ভীষণ ভ্রূকুটি করে টেবিলের কাগজ ঘাঁটকে টেনে বার করলেন খবরের কাগজ থেকে কাটা একট খবর।

আমার নাকের ডগায় নাড়তে নাড়তে বললেন বজ্রনাদ কণ্ঠে—"রাতজেগে লেখা তোমার ঐ ছাইপাঁশের মধ্যে কষ্ট করে আমার নামটা ঢুকিয়ে অশেষ উপকারের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। সোলেন-হোফেন স্লেটস-য়ে সম্প্রতি আবিষ্কৃত সরীসৃপদের জীবাশ্ম সম্পর্কে নির্বোধের মত উল্টোপাল্টা অনেক কিছুই লিখেছ। একটা প্যারাগ্রাফ শুরু

করেছ এইভাবে : প্রফেসর জি. ই. চ্যালেঞ্জার যিনি কিনা এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম—"

"হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে ?"

"কি হয়েছে ?" চোখমুখ ভয়ংকর হয়ে উঠল চ্যালেঞ্জারের। "কি হয়েছে মানে ? আমি যা, তার চাইতে খাটো করে দেখানোর অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে ? বিশেষণগুলোর মধ্যে ঈর্ষার গন্ধ পাচ্ছি কেন ? নামযশে সেরা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের নামগুলো শুনতে পারি ? ফলাও করে খুব তো লিখেছো তারা নাকি আমার সমান—ক্ষেত্রবিশেষে আমার চাইতেও বড় !"

"শব্দ-চয়ন খুবই ভুল হয়েছে। ও ভাবে না লিখে লেখা উচিত ছিল—এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।" সঙ্গে সঙ্গে ঘাট মানলাম আমি। বললাম মন থেকেই, মন যোগাবার জন্যে নয়। ওষুধ ধরল সঙ্গে সঙ্গে। পালটে গেল পট। গেল শীত, এল বসন্ত।

"মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেণ্ড, সম্মানটা গায়ের জোরে আদায় করছি, তা যেন ভেব না। তবে কি জানো, কুঁদুলে লড়াকু সতীর্থরা ঘিরে আছে আমাকে—বাধ্য হয়ে তৈরী থাকতে হয় পাল্টা মার মারবার জন্যে। নিজেকে জাহির করা আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি। কিন্তু কেউ আমার পিণ্ডি চটকে সরে পড়বে, সেটি হতে দিচ্ছি না। যাকগে। বসো, বলো, কেন এসেছ ?"

সন্তর্পণে এলাম কাজের কথায়। জানি তো চ্যালেঞ্জারকে। সিংহমূর্তি ধরতে পারেন যে কোন মুহূর্তে—আবার সিংহনাদ শুরু হলেই গেছি। কাজটা আর হবে না।

তাই ম্যাকআর্ডলের চিঠিটা বার করে খুলতে খুলতে বললাম—"পড়ে শোনাবো ? সম্পাদক ম্যাকআর্ডলের চিঠি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লোক খুব খারাপ না—জাতটা খারাপ হলেও লোকটা ভাল।"

"আপনার সম্পর্কে ওঁর ধারণা খুব উঁচু। ভীষণ শ্রদ্ধা করেন।

গোলমেলে তদন্তে দুর্লভ জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন হলেই আপনার শরণ নিয়েছেন একাধিকবার। এটাও সেই ধরনের একটা ব্যাপার।"

মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে। তোষামোদে বরফও গলে। চ্যালেঞ্জার তো কোন ছার! মেজাজটা ভিজে তুলতুলে হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। টেবিলে কনুই রেখে, গরিলা হাতদুটি যুক্ত করে, উদ্গত দাড়ি উর্ধ্বে তুলে, বিশাল দুই চোখের ওপব চোখের পাতা আধখানা নামিয়ে এমনভাবে চাইলেন আমার পানে যে নিমেষ মধ্যে নতুন করে প্রমাণিত হয়ে গেল মানুষটার মহৎ গুণের শেষ নেই। উনি বর্বর, কিন্তু ঢের বেশী বদান্য।

"পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠিখানা লিখেছেন আমাকেই :

'শ্রদ্ধেয় সুহৃদ প্রফেসর চ্যালেঞ্জারেব সঙ্গে এখুনি দেখা করে নিম্নলিখিত ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা কর। হ্যাম্পসটেডেব হোয়াইট ফ্রায়ার্স ম্যানসনে থিয়ডোর নেমর নামে একজন লাটভিয়ান ভদ্রলোক থাকেন। একটা অদ্ভুত মেশিন আবিষ্কারের কথা বলে বেড়াচ্ছেন ভদ্রলোক। মেশিনটা সত্যিই নাকি অসাধারণ। আওতার মধ্যে থাকলে যে কোন বস্তুকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। যে কোন পদার্থ অনুপরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়ে যেতে পারে। পদ্ধতিটা উল্টো দিকে চালিয়ে আবার তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতেও পারে। শুনে মনে হতে পারে বাড়িয়ে বলছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে মিথ্যে নয়, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সত্যিই একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন ভদ্রলোক।

'মেশিনটা যে এ-যুগের চেহারা পালটে দিতে পারে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তা না বললেও চলে। সাময়িকভাবে যুদ্ধ-জাহাজ বা সৈন্যদলকে অ্যাটম বানিয়ে রাখতে পারবে যে রাষ্ট্র, পৃথিবীটা পদানত থাকবে তারই। তাই এ ব্যাপারের শেষ পর্যন্ত এখুনি দেখা দরকার সামাজিক স্বার্থে—রাজনৈতিক স্বার্থে। লোকটা আবিষ্কারটা বিক্রি করতে ব্যগ্র, তাই

প্রচার-পাগল। কাজেই সাক্ষাত পেতে অসুবিধে হবে না। এই সঙ্গে একটা কার্ড দিলাম—দেখালেই দরজা খুলে যাবে। আমার ইচ্ছে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে নিয়ে তুমিই যাও লোকটার বাড়ী। আবিষ্কারটা খুঁটিয়ে দেখ। তারপর মেশিনটার গুরুত্ব নিয়ে চিন্তা-উন্মেষক প্রবন্ধ লেখো গেজেটে। আজ রাতেই খবর চাই। —আর ম্যাকআর্ডল।"

চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে বললাম—"হুকুম হয়েছে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার। সত্যিই তো, আমার দৌড় আর কদ্দুর বলুন? এ ব্যাপারে আমি একা গেলে হালে পানি পাব না: আপনাকে আসতেই হবে।"

প্রসন্ন কণ্ঠে চ্যালেঞ্জার বললেন—"খাঁটি কথাই বলেছো, ম্যালোন। বুদ্ধির ঘাটতি যদিও তোমার নেই, তাহলেও যা বললে তা যদি সত্যি হয় তাহলে এ তদন্ত তোমাকে দিয়ে হবে না। সকালটা এমনিতেই মাটি হয়েছে টেলিফোনের ঐ জঘন্য লোকগুলোর অত্যাচারে—কাজটা শেষ করতেও পারলাম না। কি কাজ জানো? ইটালির ঐ জোচ্চোর মাজোটিকে মুখের মত জবাব দিচ্ছিলাম—নিরক্ষীয় উইপোকার শূককীট বৃদ্ধি নিয়ে গালগল্প ছাড়া বার করে দিচ্ছিলাম—বাগড়া দিল টেলিফোনের উৎপাত। যাকগে, ভণ্ডটার মুখোশ রাত্রে খুলব' খন। আপাততঃ বলো কি করতে হবে।"

এইভাবেই শুরু হল আমার আশ্চর্য জীবনের আর একটি অত্যন্ত অসামান্য অভিজ্ঞতা। অক্টোবরের সেই সকালে চ্যালেঞ্জারকে নিয়ে চেপে বসলাম পাতাল রেলে—নক্ষত্রবেগে ধাবিত হলাম উত্তর লণ্ডন অভিমুখে।

এন্‌মোর গার্ডেন্স অভিমুখে রওনা হওয়ার আগেই শাপশাপান্ত-জর্জরিত টেলিফোন মারফৎ জেনে নিয়েছিলাম ভদ্রলোক বাড়ীতেই আছেন এবং জানিয়ে দিয়েছিলাম—আমরা আসছি। শুধু জানিয়ে দিয়েছিলাম না বলে বলা উচিত সাবধান করে দিয়েছিলাম—কেননা

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মত মানুষ গরিলাকে নিয়ে কোথাও যাওয়া মানেই তো কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটানো। যাই হোক, গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেখলাম ভদ্রলোক থাকেন হ্যাম্পস্টেডের একটা পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাটে। কার্ড পাঠানোর পরেও আমাদের বসতে হল আধঘণ্টা। পেছনের ছোট্ট একটা ঘরে শুনলাম তাঁকে অনর্গল কথা বলতে। কথা বলছেন একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে। তাদের গলা শুনে বুঝলাম, রাশিয়ান। আধ ঘণ্টা পরে দর্শনার্থীদের হল-ঘরে নিয়ে গিয়ে বিদায় দিলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ঝলকে দেখে নিলাম চেহারাগুলো। কৃতকর্ম কমুনিস্টদের মতই খানদানি বুর্জোয়া চেহারা। চকচকে টপ-হ্যাট, ঘন কুঁচকোনো ভেড়ার লোমের অ্যাসট্রাকেন কোটকলার, রীতিমত সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান চেহারা। হল-ঘরের দরজা বন্ধ হতেই হন হন করে আমাদের ঘরে ঢুকলেন থিওডোর নেমোর। চোখের সামনে এখনো ভাসছে সেই মূর্তি। রোদ্দুর পড়েছে মুখে। শীর্ণ লম্বা দুহাত ঘসতে ঘসতে কান এঁটো-করা হাসি হেসে ধূর্ত হলুদ চোখে নিরীক্ষণ করছেন আমাদের দুজনকে।

লোকটা মাথায় খাটো, ভারী চেহারা। দেহের কোথায় একটা বিকৃতি আছে, কিন্তু ঠিক কোনখানে তা বলা মুস্কিল। কুঁজহীন কুঁজো বলাও চলে। মুখটা বড়, নরম তুলতুলে—যেন একতাল জলমাখা ময়দা। রঙটাও সেইরকম। চামড়া ভিজে-ভিজে। মুখ বোঝাই বিস্তর ব্রণ, ফুসকুড়ি এবং মেচেতার দাগ—পাণ্ডুর পটভূমিকায় আরও কদাকার দেখাচ্ছে। চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মত এবং বেড়ালের ঝাঁট। গোঁফের মতই সরু লম্বা গোঁফ রাখা হয়েছে ভিজে-ভিজে, লালা-গড়ানো, শিথিল মুখবিবরের ঠিক ওপরে। দেখলে গা ঘিন ঘিন করে—অতি নীচ মনোবৃত্তির সব লক্ষণই সেখানে পরিস্ফুট। কিন্তু বালি রঙের ভুরুজোড়ার পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে অত্যাশ্চর্য করোটির খিলেন। এরকম উন্নত ললাট আমি খুব একটা দেখিনি। চমকপ্রদ সেই মাথায় খাপ খেতে পারে শুধু একজনেরই টুপি—

চ্যালেঞ্জারের। থিওডোর নেমোরের মুখের নিচের দিকে নীচ, হীন, ষড়যন্ত্রকারীর ছাপ—কিন্তু ওপরে দিকটা দেখলেই প্রত্যয় হয় যে বিশ্বের তাবৎ চিন্তাশীল, দার্শনিকদের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য পুরুষ।

মখমল-মসৃণ কণ্ঠে ক্ষীণ বিদেশী উচ্চারণে বললেন—"জেণ্টেলমেন, আপনারাই টেলিফোন করেছিলেন? নেমোর ডিসইনটিগ্রেটর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে চান?"

"হ্যাঁ।"

"বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে আসছেন না তো?"

"মোটেই না, আমি গেজেট পত্রিকার সংবাদদাতা। ইনি প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।"

"নামটা বিখ্যাত—ইউরোপের সবাই জানে," বলতে বলতে বৈষ্ণব-বিনয়ে ঝলসে উঠল হলদে শ্বদন্ত। "কথাটা জিজ্ঞেস করার কারণ আছে। বৃটিশ সরকারের হাত ফস্কে আমার আবিষ্কার এখন অন্য হাতে চলে গেছে। ঠিক করেছিলাম, আগে যে আসবে তাকে দেব। দেরী করেছে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। পস্তাতে হবে শীগগিরই। পস্তাবে গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্য। নিচ্ছে যারা তাদের আপনারা পছন্দ করবেন না জানি—কিন্তু দোষটা আপনাদেরই।"

"সিক্রেট বিক্রি করে দিয়েছেন?"

"যে দাম হেঁকেছি, সেই দামেই বেচেছি।"

"যারা কিনছে, যন্ত্রটার সর্বস্বত্ব একা তারাই ভোগ করবে?"

"বলা বাহুল্য।"

"কিন্তু অন্যেও তো জানে আবিষ্কারের গুপ্ততত্ত্ব?"

"আজ্ঞে না, কেউ জানে না," বলে বিশাল ললাটে টুসকি মারলেন থিওডোর নেমোর। "আবিষ্কারের মূল চাবিকাঠি লুকানো আছে এই সিন্দুকে—ইস্পাতের সিন্দুকের চাইতেও তা নির্ভরযোগ্য। ইয়েল চাবির চাইতেও অনেক দামী চাবি দিয়ে এ সিন্দুক বন্ধ থাকে— সিক্রেট

খোয়া যাবে কি করে? অন্যে যা জানে তা ভাসা ভাসা। পুরো সিক্রেটটা কেউই জানে না—আমি ছাড়া। দুনিয়ায় শুধু একজনই বিরাট এই আবিষ্কারের আসল সিক্রেট মাথার মধ্যে নিয়ে বসে আছে—ছিটেফোঁটাও পড়ে নেই কোথাও।"

"যাদের বিক্রি করলেন—তারা কিন্তু জানে।"

"মোটেই না। টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত গুপ্ত রহস্য ফাঁস করে দেব, অত বোকা ভাববেন না। টাকা পেলেই এ সিন্দুক তাদের।" বলে ফের টুসকি মারলেন ললাটে—"যা খুশী করুক—আমার তা নিয়ে চিন্তা নেই। পৃথিবীর ইতিহাস নতুন করে তৈরী হবে তারপর থেকেই। আমি কিন্তু পয়সা নিয়ে খালাস—নিষ্ঠুর, নির্মম, নির্দয়ভাবেই শেষ হবে আমার দায়িত্ব।" কান-এঁটো-করা হাসি এবার যেন নেকড়ের হাসিতে পরিণত হল। পরম তৃপ্তিতে দুহাত ঘসতে লাগলেন থিওডোর নেমোর।

এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। কথা না বললেও মুখে ফুটে উঠেছিল থিওডোরের প্রতি অপরিসীম বিতৃষ্ণা। চ্যালেঞ্জারের মুখটা এমন ধাতু দিয়ে গড়া যে মুখের কোন ভাবই সেখানে গোপন থাকে না। থিওডোর নেমোরকে দেখেই যে তাঁর হাড়পিত্তি জ্বলে গিয়েছে, মুখের রেখায় তাই তা পরিস্ফুট।

এবার বাড়ী কাঁপানো গলায় বললেন—"মাপ করবেন। জিনিসটা আদৌ আলোচনা করার মত বিশ্বাসযোগ্য কিনা, সেটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এ-নিয়ে কথা বলার কোনো দরকার আছে কি? এই তো সেদিন একজন ইটালিয়ান জোচ্চোর খুব লম্বা লম্বা কথা বলেছিল। অনেক দূর থেকে মাইনস্ ফাটিয়ে দেওয়ার কলকব্জা নাকি তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল লোকটা পয়লা নম্বরের ঠগ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। বিজ্ঞানের সাধনায় আমার কিছু অবদান আছে, সে তত্ত্ব আপনার অজ্ঞাত নয়। একটু আগেই তাই বললেন, ইউরোপের

সবাই চেনে আমাকে—যদিও আমেরিকাতেও এরকম সুনাম আর একখানা নামের মধ্যে পাবেন কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি বলেই বলছি, পদে পদে হুঁশিয়ার থাকাটাই প্রকৃত বিজ্ঞানীর লক্ষণ। আগে প্রমাণ দেখান, তারপর লম্বা লম্বা কথা বলুন।"

হলুদ চোখে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন নেমোর। কিন্তু বিনয় ক্ষরিত চটচটে হাসিটা আরো ছড়িয়ে পড়ল এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত --"আপনার নাম যশের উপযুক্ত কথাই বলেছেন, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। শুনেছি আপনাকে ঠকানো যায় না। দুনিয়ার সবাই ঠকতে পারে - আপনি বাদে। কাজেই যন্ত্রের কার্যকারিতা হাতে কলমে দেখিয়ে দেব। তার আগে মূলসূত্র সম্পর্কে দু'চার কথা বলে নিই।

"বুঝতেই পারছেন এক্সপেরিমেন্টের খাতিরে যা বানিয়েছি, তা একটা নিছক মডেল। আকারে ছোট হলেও স্বল্প আওতার মধ্যেই কাজ দেয় চমৎকার। আপনাকে অ্যাটমে বিশ্লিষ্ট করে ফেলে আবার সেই অ্যাটমের সংশ্লেষণ ঘটিয়ে আপনাকে ফিরিয়ে আনা নেহাতই ছেলেখেলা এই মডেল যন্ত্রের কাছে। অবশ্য যন্ত্র যারা কিনেছে, তাদের উদ্দেশ্য অন্য। কোটি কোটি মুদ্রা ঢালছে বিদেশী রাষ্ট্র—নিশ্চয় আপনাকে ভেঙেচুরে অ্যাটম বানানোর জন্যে নয়। ছোট্ট খেলনার মত এই মডেলকেই যখন বড় আকারে বানানো হবে—তখন আর তা খেলনা থাকবে না। একই শক্তিকে বিরাট আকারে প্রয়োগ করলে যে ঘটনা ঘটবে তা দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।"

"মডেলটা দেখতে পারি?"

"শুধু দেখতেই পাবেন না, আপনার নিজের শরীরের ওপরেই অকাট্য প্রমাণ হাতে হাতে পাবেন—যদি সে সাহস আপনার থাকে।"

"যদি মানে?" সিংহনাদ করলেন চ্যালেঞ্জার। "ঘোর আপত্তি

জানাচ্ছি আপনার 'যদি' কথাটায়। বাজে কথা একদম বলবেন না।"

"আরে, আরে, আমি কি একবারও বলেছি আপনার সাহস নেই? নিজের শরীরের ওপর দিয়েই যন্ত্রটার ক্ষমতা যাচাই করে নেওয়ার একটা সুযোগ আপনি পাচ্ছেন—তার আগে কয়েকটা কথা বলব। সব বস্তুই যে সব নিয়মের অধীন—কথাটা সেই নিয়ম নিয়ে।

"কিছু কৃস্ট্যাল আর নুনজাতীয় জিনিস আছে যাদের জলে রাখলে গুলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন, চিনি। তখন জল দেখে বোঝাও যায় না যে তার মধ্যে কিছু আছে। আবার যদি সেই জলটাকে ফুটিয়ে বাষ্প করে উড়িয়ে দেওয়া হয়—গুলে থাকা বস্তুগুলো ফের দেখা যায়। ঠিক এইভাবে আপনার ঐ জীবন্ত দেহটাকে বিশেষ কোন পদ্ধতি দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মিশিয়ে দেওয়া কি যায় না? পদ্ধতিটাকে উল্টো দিক শুরু করলে আবার কি আপনাকে ফিরিয়ে আনা যায় না?"

"আদর্শ শিখ্যে হিসেবে দৃষ্টান্তটা মন্দ নয়," বেশ জোর দিয়ে বললেন চ্যালেঞ্জার "দেহের পরমাণুকে ব্রহ্মাণ্ডে মিলিয়ে দেওয়ার মত ভাওচোর করার শক্তি থাকলেও থাকতে পারে, একথা তর্কের খাতিরে মেনে নিয়েও বলব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়া সেই পরমাণুগুলোকে ফের এক জায়গায় বসিয়ে আস্ত দেহটাকে আবার খাড়া করার কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই।"

"আপত্তি যুক্তিযুক্ত। জবাব একটাই—প্রতিটা অ্যাটমকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় যার-যার জায়গায়। অদৃশ্য কাঠামোর মধ্যে যার যেখানে জায়গা—ঠিক খাপে খাপে বসে যায় সেই খানেই। ইট দিয়ে কাঠামো ভরাট করার মত। হাসছেন, হাসুন। কিন্তু হাসি এখুনি মিলিয়ে যাবে, প্রফেসর। পালাবার পথ পাবে না আপনার অবিশ্বাস।"

চ্যালেঞ্জার বৃষস্কন্ধ ঝাঁকিয়ে বললেন—“টেস্টের জন্যে আমি তৈরী।”

“আর একটা ব্যাপার শুনুন। প্রাচ্যের জাদুবিদ্যা আর প্রতীচ্যের গুপ্তবিদ্যায় ‘অ্যাপোর্ট’ বলে একটা শব্দ আছে। অলৌকিক ভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় যে কোন জিনিস। ব্যাখ্যা একটাই—জিনিসটা অণুপরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়ে ইথারের মধ্যে দিয়ে আসে নতুন জায়গায়—খাপে খাপে বসে যায় অদৃশ্য কাঠামোর নিজের নিজের জায়গায়। যে দুর্দমনীয় নিয়মের তাড়নায় এ কাণ্ড ঘটে, সেই নিয়মের অধীনে থেকে মেশিন দিয়ে একই কাণ্ড ঘটানো যায়।”

“একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপারকে আর একটা অবিশ্বাস্য ঘটনার উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মিঃ নেমোর, আপনার ‘অ্যাপোর্ট’ তত্ত্ব আমি মানি না, আপনাব যন্ত্র আবিষ্কারও বিশ্বাস করি না। আমার সময়ের দাম আছে। হাতে-নাতে যন্ত্রের ক্ষমতা যদি দেখাতে চান, তাহলে ভূমিকা রেখে লেগে পড়ুন।”

‘তাহলে আসুন পেছনে পেছন,” বলে পেছনের দরজা দিয়ে সিঁড়িতে পা দিলেন থিওডোর নেমোর। কয়েক ধাপ নেমেই একটা বাগান। তারপর একটা বার-বাড়ী। দরজায় তালা ঝোলানো। তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন থিওডোর।

দেখলাম, একটা মস্ত ঘর। সাদা চুনকাম করা। কড়িকাঠ দেখা যাচ্ছে না তামার তারে। ঝালরের মত ঝুলছে অসংখ্য তার। এককোণে থামের ওপর বসানো একটা প্রকাণ্ড চুম্বকের সামনে একটা মস্ত তিনপলা কাঁচ—প্রিজ্‌ম্‌। চওড়ায় এক ফুট, লম্বায় তিনফুট। ডানদিকে একটা চেয়ার—দস্তার মঞ্চে বসানো—মাথায় ভার্নিশ করা তামার টুপি। অগুন্তি তার বেরিয়ে এসেছে টুপি আর চেয়ার থেকে। পাশে একটা খাঁজকাটা চাকার মত বস্তু। প্রতিটি খাঁজে একটি করে সংখ্যা লেখা। শূন্য চিহ্নিত খাঁজে আটকে রয়েছে একটা হাতল—রবার দিয়ে মোড়া।

হস্ত সঞ্চালনে আজব যন্ত্র দেখিয়ে বললেন অদ্ভুত আবিষ্কারক—"এই সেই নেমোর ডিসইনটিগ্রেটর। নিলয় যন্ত্র ভুবনবিখ্যাত হতে চলেছে দুদিন পরেই—কাঁপিয়ে ছাড়বে বহু সিংহাসন—পতন ঘটবে বহু সরকারের—শক্তির ভারসাম্য উল্টে যাবে সারা দুনিয়ায়। বিপুল সেই শক্তির ধারক এই মেশিন এবং আমিই তার স্রষ্টা। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, একটু আগেই বেশ অশোভন ভাবে মেশিন সম্পর্কে অনেক কটূক্তি করেছেন—সৌজন্যের ধার ধারেন নি। নতুন শক্তির ক্ষমতাটা কি নিজের শরীরের ওপর যাচাই করবেন? চেয়ারে বসবেন? সাহস থাকলে বসুন।"

সাহসের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জার সিংহ বিশেষ—খোঁচা খেলে ক্ষিপ্ত। উল্কাবেগে ধেয়ে গেলেন চেয়ারে বসবার জন্যে। ঝাপটে ধরলাম আমি।

"না। আপনার যাওয়া হবে না। আপনার জীবনের দাম অনেক। ভয়ংকর ঝুঁকি নিচ্ছেন। ফিরে যে আসবেন তার গ্যারান্টি কি? চেয়ার দেখে তো মনে হচ্ছে সিঙ-সিঙের ইলেকট্রিক চেয়ার—মৃত্যুদণ্ডের যন্ত্র।"

"তুমি সাক্ষী রইলে—সেই আমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি। বেচাল দেখলেই ক্যাঁক করে চেপে ধরবে। মরে-টরে গেলে নরহত্যার দায়ে কোর্টে টেনে নিয়ে যাবে।"

"তাতে বিজ্ঞানী-মহল কি খুশী হবে? অনেক কাজ এখনো বাকী—সে কাজ আপনি ছাড়া কেউ পারবে না। না, আমি আগে যাব। যদি দেখেন সব ঠিক—গায়ে আঁচড়টি লাগে নি—আপনি যাবেন।"

নিজের বিপদে সন্ত্রস্ত হন না চ্যালেঞ্জার, কিন্তু টনক নড়ে হাতের কাজ অসমাপ্ত থাকবে শুনলে। তাই দ্বিধায় পড়লেন। সেই ফাঁকে পাশ কাটিয়ে দৌড়ে গেলাম, ঝপ করে বসে পড়লাম ভয়ংকর সেই চেয়ারে। দেখলাম, হাতলে হাত দিলেন থিওডোর

ক্লিক আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে গেল মুহূর্তের জন্য, চোখের সামনে দেখলাম কুয়াশা। পরক্ষণেই অপসৃত হল কুয়াশা যবনিকা। দেখলাম, থিওডোরের স্পর্ধিত হাসি আর পাশেই চ্যালেঞ্জারের ব্যাদিত বদন—আপেলের মতন লাল গাল দুটোয় রক্ত একদম নেই—ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন আমার পানে।

"কি হল, চালান ?" বললাম আমি।

"চালানো হয়ে গেছে," অমায়িক কণ্ঠ থিওডোরের। "খুব ভাল ফল দেখা গেছে আপনার ওপর, এবার প্রফেসরের পালা—যদি রাজী থাকেন।"

বৃদ্ধ বন্ধুকে এভাবে বিচলিত হতে কখনো দেখিনি। লৌহ-কঠিন স্নায়ু যেন গুঁড়িয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে আমার হাত ধরে বললেন—"কি সাংঘাতিক কাণ্ড! ম্যালোন, সত্যিই তুমি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলে! কুয়াশার মত কি একটা ভাসছিল কিছুক্ষণ।"

"কতক্ষণ ? মানে, অদৃশ্য হয়েছিলাম কতক্ষণ ?

"দু' তিন মিনিট তো বটেই। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম—লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, ভয়ের চোটে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, আর বুঝি তোমায় দেখব না। তারপর কট্ করে আবার একটা আওয়াজ হল—নতুন খাঁজে হাতল লাগাতেই ফিরে এলে তুমি। অবিকল আগের তুমি—খালি যা একটু ঘাবড়ে গেছো। ও গড, কি আহ্লাদই না হচ্ছে দেখে!" রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন চ্যালেঞ্জার।

ত্যাঁদোড় আবিষ্কারক কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—"কি হল ? ধাত ছেড়ে গেল নাকি ? বসবেন না ?"

শুনে জোর করে মন থেকে ভয় তাড়ালেন চ্যালেঞ্জার এবং প্রচেষ্টাটা প্রকট হল চোখে মুখে। পা বাড়ালেন সামনে, আমি হাত দিয়ে আটকালাম। হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গিয়ে বসলেন

চেয়ারে। হাতলটা ঠেলে দিলেন থিওডোর—ফট করে তিন নম্বর খাঁজে আটকাতেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন চ্যালেঞ্জার।

নির্ঘাত আঁৎকে উঠতাম—কিন্তু সামলে নিলাম অপারেটর ভদ্রলোক তিলমাত্র বিচলিত হন।ন দেখে।

"ইণ্টারেস্টিং," বললেন থিওডের। "ভাবুন দিকি এই মুহূর্তে এই বিল্ডিংয়ের কোন এক জায়গায় প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব পরমাণবিক মেঘ হয়ে শূন্যে ভাসছে। উনি এখন আমার খপ্পরে। জীবন নির্ভর করছে আমার করুণার ওপর। ইচ্ছে করলে ঐ অবস্থাতেই রেখে দিতে পারি অনন্তকাল—পৃথিবীর কোন শক্তিই ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

"আমি বাধা দেব।"

বিনয়ক্ষরিত হাসিটা আবার নেকড়ের হাসি হয়ে গেল—"আপনি কি ভাবেন আমি তা ভাবিনি? কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার বলুন তো। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার গলে মিলিয়ে গেছেন শূন্যে—ভাবতে পারেন? ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন হয়েছেন চিরকালের মত—চিহ্নটি পর্যন্ত রেখে যান নি! কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর! যাবার সময়ে একটু ভাল ব্যবহার যদি করে যেতেন! একটু ভদ্রতাও যদি দেখাতেন! তাই একটু শিক্ষার দরকার ওঁর—"

"খবরদার—"

"আরে মশায়, মেশিনের আর একটা ক্ষমতা হাতেনাতে দেখে যান আমি দেখেছি, চুলের কম্পনতরঙ্গ জ্যান্তদেহের অন্য সব কিছুর কম্পনতরঙ্গ থেকে একেবারে আলাদা। তাই ইচ্ছে করলে জ্যান্ত দেহে চুল নতুন করে লাগাতে পারি, বাদ দিতেও পারি। বুঝলেন ব্যাপারটা? কাগজে চুটিয়ে প্রবন্ধ লেখবার মালমসলা পেয়ে যাবেন এখুনি। আমি দেখতে চাই, রোঁয়া ছাড়া ভালুকটাকে দেখায় কেমন। এই দেখুন!"

কট্ করে শব্দ হল হাতলের। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন চ্যালেঞ্জার।

কিন্তু এ কোন্ চ্যালেঞ্জারকে দেখছি। এ যে কেশর-কাটা পশুরাজ। দেখেই রাগের চোটে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল তিড়বিড়িয়ে—একি বাঁদরামি প্রফেসরকে নিয়ে। সেই সঙ্গে পেল প্রচণ্ড হাসি। সেকি হাসি। দুর্লভ সেই দৃশ্য দেখে পেট ফেটে হাসি এল আমার—হাসির ধাক্কায় জল এসে গেল চোখে।

চ্যালেঞ্জারের প্রকাণ্ড মাথা এখন আঁতুড়ে শিশুর মত কেশহীন—চিবুক মেয়েদের মত মোলায়েম। গুচ্ছ গুচ্ছ দাড়ি উধাও হওয়ায় ঝুলে-পড়া ভীষণ চওড়া মাংসল চোয়ালটাকে মনে হচ্ছে বুলডগের চোয়াল। মল্লবীরের মত মারকুটে চেহারা—শুওরের মত থ্যাবড়া চওড়া চোয়ালটা মার খেয়ে খেয়ে থেঁৎলে, তেউড়ে, বেঢপ।

আমার অট্টহাসি অথবা থিওডোরের কুচুটে হাসি দেখে কিনা জানি না, মাথায় হাত দিলেন চ্যালেঞ্জার। পরমুহূর্তেই বুঝলেন মাথা মুখের কি দশা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হুংকার ছেড়ে এক লাফে গিয়ে পড়লেন থিওডোরের ওপর এবং টুঁটি টিপে ধরে ছুড়ে ফেলে দিলেন মেঝের ওপর। প্রফেসরের আসুরিক শক্তির খবর রাখি বলেই আঁৎকে উঠলাম—আর রক্ষে নেই। নির্ঘাৎ খুন হয়ে যাবেন থিওডোর।

গলা ফাটিয়ে বললাম—"করছেন কি। মেরে ফেললে আপনার চুল-দাড়ি যে জীবনে ফিরে পাবেন না।"

যুক্তি মনে ধরল চ্যালেঞ্জারের। রেগে উন্মাদ হয়ে গেলেও যুক্তি বিচারের ক্ষমতা উনি কখনো হারান না। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে গলা টিপে ধরে টেনে তুললেন বেচারী থিওডোরকে। বাজের মত চেঁচিয়ে বললেন—"পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি চুল-দাড়ি না ফিরে পাই, টুঁটি টিপে ধরে বিট্‌কেল বডি থেকে প্রাণটাকে বার করে ছাড়ব বলে দিলাম।"

চ্যালেঞ্জার যখন রেগে ফুটতে থাকেন, তখন তাঁর সঙ্গে তর্ক করা নিরাপদ নয়। বুকের পাটা যার অসীম, তাকেও কেঁচোর মত কুঁচকে

সরে আসতে দেখেছি ঐ মূর্তির সামনে। থিওডোর নেমোর সে তুলনায় কিছুই নয়। পক্ষান্তরে, বুকের পাটা বলে কোন বস্তুর তিলমাত্র লক্ষণ এসে পর্যন্ত চোখে পড়েনি। কিন্তু এখন যা দেখলাম, তা আরো শোচনীয়। লোকটার মুখের রঙ এমনিতে পাণ্ডুর—এই মুহূর্তে তা মাছের পেটের মত ফ্যাকাসে—তার ওপর ব্রণ, ফুস্কুরি পর্যন্ত রঙ পাল্টানোয় দেখাচ্ছে অতি কদাকার। হাত পা কাঁপছে থরথরিয়ে, অঁ-অঁ চীৎকার ছাড়া আওয়াজ বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে।

গলায় হাত বুলোতে বুলোতে অবশ্য বললেন অতি কষ্টে—"আপনি যেন কি প্রফেসর। ঠাট্টাও বোঝেন না। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এ রকম নির্দোষ ঠাট্টা-ইয়ার্কি কি খুবই দোষের? তার জন্যে মারধরের দরকার ছিল কি? আপনি চেয়েছিলেন মেশিনটার ক্ষমতা পুরোপুরি যাচাই করবেন—আপনার ওপর দিয়েই দেখাচ্ছিলাম ক্ষমতাটা। বিশ্বাস করুন, জব্দ করার মতলব আমার নেই।"

উত্তরে চেয়ারে গিয়ে বসলেন চ্যালেঞ্জার।

বললেন—"ম্যালোন, নজর রেখো—বেচাল দেখলেই ধরবে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"দেরী কেন? ফিরিয়ে দিন দাড়ি গোঁফ। ঠিক আগের মত।"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন বেচারী আবিষ্কারক। পুরোদমে চালু হয়ে গেল যথাস্থানে চুল ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি। এক মুহূর্ত পরে দেখলাম চ্যালেঞ্জার আবার আগের অবস্থায় ফিরে এসেছেন। আবার দাড়ির জঙ্গলে আর চুলের বোঝায় গাল আর মাথা ভরে উঠেছে। সস্নেহে দাড়িতে হাত বুলোলেন চ্যালেঞ্জার। নিশ্চিন্ত হবার জন্যে মাথাতেও হাত দিলেন। সব ঠিক আছে দেখে প্রসন্ন মুখে ধীর পদে নেমে এলেন চেয়ার থেকে।

"মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে আপনার নিজের জীবনটাই যে যেতে বসেছিল মশায়। বড্ড বেশী ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলেন। যাই হোক, আপনার কথা বিশ্বাস করলাম—ইয়ার্কি করেন নি, যন্ত্রের

শক্তি দেখাচ্ছিলেন। এখন কয়েকটা সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর চাই। প্রশ্নগুলো যন্ত্রের শক্তি সম্পর্কে।"

"শক্তির উৎস কি, সেই প্রশ্ন বাদে সব প্রশ্নের উত্তর দেব। ওটাই আমার সিক্রেট।"

"এ সিক্রেট আপনি ছাড়া কেউ জানে না বলছিলেন—সত্যি?"

"আঁচ করতেও পারবে না—জানা তো দূরের কথা।"

"আপনার অ্যাসিস্ট্যাণ্টরা জানে নিশ্চয়?"

"অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-ফ্যাসিণ্ট্যাণ্ট আমার নেই। কাজের সময়ে আমি একা।"

"বলেন কি! শক্তিটার সত্যতা সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ আর নেই। কিন্তু এর বাস্তব প্রয়োগ কিরকম হতে পারে বুঝতে পারছি না।"

"বললাম তো এটা একটা মডেল। একই নক্সায় বড় প্লাণ্ট বানানো কঠিন কিছু নয়। দেখেই বুঝেছেন নিশ্চয়, মডেলের শক্তি বইছে ওপর থেকে নিচে—নিচ থেকে ওপরে। কারেণ্ট ওপরে যাচ্ছে—নিচে নামছে—মাঝখানে এমন একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে যার মধ্যে গিয়ে আপনি অ্যাটমে ভেঙে যাচ্ছেন, আবার সেই অ্যাটম আগের মত জোড়া লেগে যাচ্ছে। ওপর নিচে না করে পাশাপাশি শক্তি প্রবাহও সম্ভব। ফলাফল একই হবে। জমির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায় কারেণ্ট ছুটবে—কারেণ্টের তীব্রতার অনুপাতে মাঝখানের ব্যবধান ঠিক করতে হবে।"

"যেমন? উদাহরণ দিন।"

"ধরুন, যন্ত্রের মেরুদুটো রাখা হয়েছে দুটো জাহাজে। মানে, দু'জাহাজে রইল বিপরীতধর্মী দুই শক্তি। মাঝখানের অক্ষরেখা বরাবর ফাঁকা জায়গাটায় যুদ্ধ-জাহাজ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে অণু হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এক দঙ্গল সৈন্যের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখা যাবে।"

"এই সিক্রেটই আপনি ইউরোপের একটিমাত্র রাষ্ট্রকে বেচেছেন? যন্ত্র প্রয়োগের ক্ষমতা কেবল তাদেরই থাকবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা থাকবে। কথা দেওয়া হয়ে গেছে, এখন টাকা হাতে পেলেই এমন ক্ষমতা তারা হাতে পাবে যা কল্পনা করার ক্ষমতাও অন্য রাষ্ট্রের নেই। যোগ্য হাতে পড়লে এ যন্ত্র যে কি ভেল্কি দেখাবে তা ভাবতেও পারছেন না। দরকার মত অস্ত্র ধরতে পেছপা যাঁরা হন না—এমনি শক্তিমান রাষ্ট্রের হাতেই থাকা চাই এ যন্ত্র। ফলটা হবে সাংঘাতিক। অপূর্ব!" বলতে বলতে ক্রুর তৃপ্তিতে চকচক করে উঠল হলুদ চক্ষু—কুটিল হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখময়— "কল্পনা করুন, লণ্ডন শহরের দুদিকে বসানো হয়েছে যন্ত্রের দুই অংশ। বিপুল হারে কারেন্ট প্রবাহর ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছে। তারপরের দৃশ্যটা ভাবতে পারেন?" অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন নেমোর— "টেমস উপত্যকায় ক্ষুর দিয়ে চেঁচে কামালে যা হয়—ঠিক সেই দৃশ্য! অপূর্ব! অপূর্ব! পিঁপড়ের মত লাখ লাখ মেয়ে, পুরুষ, শিশু পিল পিল করছে যে শহরে—নেই তাদের একজনও! হাঃ হাঃ হাঃ!"

আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। সবচেয়ে ভয় পেলাম লোকটার উল্লাস দেখে—পৈশাচিক আনন্দ যেন বিমূর্ত হচ্ছে বলার ধরনে। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের মধ্যে প্রকট হয় উঠছে বিকট মনোবৃত্তি। আমি আঁৎকে উঠলেও প্রফেসর চ্যালেঞ্জার দেখলাম নির্বিকার। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, বরং যেন মজাই পেলেন। মুচকি মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন থিওডোর নেমোরের।

বললেন—"অভিনন্দন রইল। সত্যিই প্রকৃতির একটা আশ্চর্য শক্তিকে মানুষের সেবায় লাগানোর পদ্ধতি আপনি আবিষ্কার করেছেন। কোন আবিষ্কার যদি ধ্বংসের জন্যে ব্যবহার করা হয়, তার জন্যে বিজ্ঞানী দায়ী নন। তাঁর কাজ অজানাকে জানা, জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা। নতুন জ্ঞানকে সমাজ কি কাজে লাগাবে, সে ভাবনার ভার তাঁর নয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হলে ব্যাপারটা শোচনীয়

দাঁড়াবে ঠিকই, কিন্তু কিছু করার নেই। যন্ত্রের সূত্র বুঝলাম। গঠন-কৌশল দেখবার ইচ্ছে আছে। আপত্তি আছে কি?"

"একদম না। যন্ত্র দেখে কি ওর আত্মাকে বুঝতে পারবেন? যন্ত্র তো একটা বডি—দেহ। প্রাণটা কোথায়, তা আঁচ করবার ক্ষমতা আপনার নেই।"

"তা ঠিক। তাহলেও এত সূক্ষ্ম যন্ত্র কখনো দেখিনি। মৌলিক আবিষ্কারের চূড়ান্ত নিদর্শন," বলে তারের গোলক-ধাঁধার মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন প্রফেসর। কয়েকটা অংশে হাত দিলেন। তারপর বিপুল বপু টেনে তুললেন চেয়ারে।

"ফের ব্রহ্মাণ্ড পর্যটনের ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?" থিওডোর জিজ্ঞেস করলেন।

"পরে, একটু পরে। কিন্তু ইলেকট্রিসিটি লীক করছে মনে হচ্ছে? —হ্যাঁ, বেশ টের পাচ্ছি। খুব ক্ষীণ একটা কারেন্ট বইছে শরীরের মধ্যে দিয়ে —আপনিও জানেন, তাই না?"

"অসম্ভব! ইনস্যুলেটর দিয়ে পুরোপুরি মোড়া—কারেন্ট আসবে কোত্থেকে?"

"কিন্তু আসছে—আমি বলছি," বলে আসন থেকে গুরুভার দেহ নামিয়ে আনলেন চ্যালেঞ্জার। ত্রস্তে সে জায়গায় গিয়ে বসলেন থিওডোর।

"কই, আমি তো টের পাচ্ছি না।"

"শিরদাঁড়াটা কি রকম শিরশির করছে না?"

"আজ্ঞে না। আমার করছে না।"

খুব জোরে কট্ করে একটা আওয়াজ হতেই ফুস্ করে মিলিয়ে গেলেন আবিষ্কারক। সচমকে ফিরে চাইলাম চ্যালেঞ্জারের পানে—"কী সর্বনাশ! মেশিনে হাত দিয়েছিলেন নাকি?"

যেন একটু অবাক হয়ে গিয়েই মিটিমিটি হাসতে লাগলেন চ্যালেঞ্জার।

"আরে তাই তো। কি কাণ্ড করলাম বলো তো। কখন জানি হাত লেগে গেছে হাতলে। এ রকম খসড়া মডেলে অ্যাকসিডেণ্ট তো ঘটবেই। চারদিকে খোঁচা আর তার ঝুলছে। হাতলটাকে ঢেকে রাখবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।"

"তিন নম্বর খাঁজে আটকেছে হাতল। ডিসইনটিগ্রেট করার খাঁজ কিন্তু ঐটাই।"

"তোমাকে করার সময়ে আমিও তাই দেখেছি।"

"কিন্তু আপনাকে ফিরিয়ে আনার সময়ে ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম। কোন খাঁজে হাতল ছিল দেখিনি। আপনি দেখেছেন?"

"দেখে থাকতে পারি, তবে কি জানো ছোকরা, ছোটখাট ব্যাপার মনে রাখার চেষ্টা আমি করি না। খাঁজ তো দেখছি অনেকগুলো—কোনটারই উদ্দেশ্য জানা নেই। যা জানি না, তা নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করা সমীচীন নয়। সুতরাং যে অবস্থায় মেশিন রয়েছে, থাকুক ঐ অবস্থায়।"

"আপনি—"

"ধরেছো ঠিক। থিওডোর নেমোরের কৌতূহল-জাগানো ব্যক্তিত্ব এই মুহূর্তে ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। মেশিনটা তাঁর অপদার্থ। বিশেষ একটা রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়েছে মেশিনের অধিকার থেকে—ফলে, পৃথিবী রক্ষে পেয়েছে অনেক ধ্বংসের খপ্পর থেকে। কাজটা মন্দ হয়নি, ম্যালোন। সকালটা শেষ পর্যন্ত কাজে লাগল। তোমার বস্ ভদ্রলোকও একটা জবর প্রবন্ধ পেয়ে গেলেন। লাটভিয়ান আবিষ্কারকের সঙ্গে তাঁর সংবাদদাতার সাক্ষাৎকারের পরেই ভদ্রলোকের রহস্যজনক অন্তর্ধানের ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে যাবে—কিন্তু কাগজে তোমার প্রবন্ধটা সাড়া জাগাবে দেশে বিদেশে। লাভ হল তোমাদের দুজনেরই। আর আমার লাভের মধ্যে পেলাম অভিনব এক অভিজ্ঞতা। কাঠখোট্টা লেখাপড়া নিয়ে অষ্টপ্রহর থাকি। মাঝে মাঝে হাল্কা মুহূর্ত এলে মন্দ

লাগে না। নীরস দৈনিক রুটিনে এইটুকুই আমার মজা। কিন্তু শুধু মজা নিয়ে থাকলে তো চলবে না, জীবনে কর্তব্য অনেক। আমিও চললাম আমার কর্তব্য করতে। নিরক্ষীয় উইপোকার শূককীট বৃদ্ধি সম্পর্কিত ধাপ্পাবাজি ফাঁস করে ইটালিয়ান ম্যাজোটির মুখোশ না খোলা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।"

পেছন ফিরে দেখলাম চেয়ারের ধারে ধারে তখনও যেন একটা স্বচ্ছ কুয়াশার মত কি ভাসছে।

বললাম—"আপনি কিন্তু—"

"আইনভক্ত নাগরিকের প্রথম কর্তব্য নরহত্যা নিবারণ। আমিও তাই করেছি। এ নিয়ে আর কোন কথা নয়, ম্যালোন, যথেষ্ট হয়েছে। অনেক দরকারী কাজ এখনো বাকী—অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম এখানে," বললেন প্রফেসব চ্যালেঞ্জার।

হোয়েন দি ওয়ার্ল্ড স্ক্রীম্‌ড্‌

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে অনেক কথাই বন্ধুবর এডোয়ার্ড ম্যালোনের মুখে শুনেছি। সব কথা মনে নেই—যা মনে আছে তাও স্পষ্ট নয়। ম্যালোন কাজ করে 'গেজেট' পত্রিকায়। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের অত্যাশ্চর্য কয়েকটা অ্যাডভেঞ্চারে সঙ্গী হয়েছিল। আমি আমার কাজকর্ম ব্যবসাপত্র নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে বাইরের জগতের খবর বিশেষ রাখতে পারি না। নিজের কোম্পানী তো, বেশী খাটতে হয়। তার ওপর এত বেশী অর্ডার আসছে যে নিজের স্বার্থ দেখা ছাড়া অন্যের খবর নেওয়ার ফুরসৎ নেই। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সম্বন্ধে ভাসা ভাসা ভাবে মনে ছিল, ভদ্রলোক মহাপণ্ডিত, কিন্তু বুনো টাইপের, ব্যবহার ভারী খারাপ—সহ্যাতীত দুর্দান্ত মেজাজ—রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—দর্শনার্থীকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেও দ্বিধা করেন না। তাই এই রকম একটা লোকের কাছ থেকে ব্যবসা সম্পর্কিত পত্র পেয়ে ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম।

চিঠিখানা এই :

"১৪ (বিস), এনমোর গার্ডেন্স"
কেনসিংটন

"মহাশয়,—

"কূপখননে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে কাজ দেওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি। আপনাকে গোপন করে লাভ নেই—বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব একটা ভাল নয়। আমি দেখেছি, আমার মত সুসংবদ্ধ চৌকস ব্রেনের অধিকারী হলে যে কোন মানুষই যে কোনো বিশেষজ্ঞের বিশেষ জ্ঞান সম্বন্ধে আরো গভীর, আরো উদার জ্ঞানদান করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বিশেষ জ্ঞান বলতে যা বোঝায়, আসলে

কিন্তু তা সীমিত জ্ঞান—নিজের ক্ষেত্রেই সঙ্কুচিত। বিশেষ জ্ঞানটাও একটা বিশেষ পেশা। দৃষ্টিভঙ্গী তাই অনুদার।

"যাই হোক, আপনাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। বাজিয়ে দেখতে চাই। কূপখননে বিশেষজ্ঞদের লিস্টে আপনার নাম দেখলাম। (কুয়ো খোঁড়াও আবার একটা বিশেষ জ্ঞান! অদ্ভুত! হাস্যকর!) নামটা চোখে লাগল। খোঁজ নিয়ে জানলাম আমার এক তরুণ বন্ধু এডোয়ার্ড ম্যালোনের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে। কাজেই, আপনার সঙ্গে দেখা হলে খুব খুশী হব। আমার কাজের ধরনটা উঁচুদরের। যদি বুঝি আপনি কাজের লোক, তাহলে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার আপনি পাবেন। এখন এর বেশী আর বলব না—কেননা জিনিসটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং যা কিছু বলবার মুখে বলব। আগামী শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় উপরোক্ত ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করুন—অন্য কোথাও যাবার কথা থাকলে তা বাতিল করুন। খাবার ব্যবস্থা ভালই আছে, মিসেস চ্যালেঞ্জার না খাইয়ে কাউকে ছাড়েন না।

"জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার

চীফ ক্লার্ককে চিঠিখানার জবাব দিতে বললাম। জবাব চলে গেল এই মর্মে যে কথামত মিঃ পিয়ারলেস জোন্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে যথাসময়ে হাজির হবেন। ক্লার্কের চিঠিতে সৌজন্যর অভাব ছিল না। কিন্তু গোড়াতেই ছিল একটা বাঁধাধরা গৎ—আপনার তারিখ-হীন চিঠি পেলাম। ফলে, আর একখানা চিঠি লিখলেন প্রফেসর :

"মহাশয়",—চ্যালেঞ্জারের এবারের হাতের লেখা যেন কাঁটাতারের বেড়া বিশেষ—"লক্ষ্য করলাম, আমার চিঠিতে তারিখ না দেওয়ার তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে আপনি মন্তব্য করেছেন। মহাশয়ের কি খেয়াল নেই সাংঘাতিক শুল্কের বিনিময়ে সরকার বাহাদুর একটা ছোট্ট গোলাকৃতি ছাপ দেন সব খামের ওপরেই? চিঠি কবে ডাকে ফেলা হল—তারিখের বিজ্ঞপ্তি থাকে সেই ছাপের মধ্যে। এ চিহ্নটা না

থাকলে, অথবা অস্পষ্ট মনে হলে আপনার উচিত ডাক বিভাগের কর্তাদের চিঠি লেখা। ইত্যবসরে একটা কথা বলে রাখি ; আপনাকে যে ব্যাপারে ডাকা হয়েছে, কথা বলবেন কেবল সেই ব্যাপারেই। আমার চিঠি লেখার কায়দা নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।"

বেশ বুঝলাম বদ্ধ উন্মাদের পাল্লায় পড়েছি। তাই এ ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার আগে বন্ধুবর ম্যালোনের সঙ্গে একটু পরামর্শ করা মনস্থ করলাম। এককালে রিচমণ্ডের হয়ে দুজনে রাগার খেলেছিলাম। ম্যালোন দেখি ঠিক আগের মতই রয়েছে—ফুর্তিবাজ আইরিশম্যান। চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে আমার প্রথম টক্করের বিবরণ শুনে গড়িয়ে পড়ল হাসতে হাসতে।

বললে--"ও আর এমন কি। ছালটা তো ছাড়িয়ে নেন নি। মিনিট পাঁচেক সঙ্গে থাকলে সত্যিই জ্যান্ত ছাল-ছাড়ানো গোছের অবস্থা দাঁড়াবে তোমার। পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাঁধানোর ব্যাপারে দুনিয়ায় ওঁর জুড়ি নেই।"

"কিন্তু দুনিয়া ওঁকে মেনে নেয় কেন ?"

"কে বললে নিয়েছে ? মামলা মোকদ্দমার ফর্দ দেখলে তোমার মুণ্ডু ঘুরে যাবে। কে কোথায় কোন কাগজে ওঁর নিন্দে করেছে, অমনি দিয়েছেন মামলা ঠুকে। ঝগড়াঝাঁটির মামলাই কি কম। তার ওপর আছে পুলিশ আদালতে মারধরের—"

"মারধর।"

"আরে গেল যা। তুমি কি ভাব ওঁর কথায় সায় দিতে না পারলে উনি তোমাকে জামাই আদর করবেন ? মাথার ওপর তুলে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দেবেন। কোট-প্যাণ্ট পরা আদিম গুহামানব বলতে যা বোঝায়, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আসলে তাই। কেউ কেউ এক আধ শতাব্দী আগে পরে জন্মায়—উনি জন্মেছেন লক্ষ লক্ষ বছর পরে। নিওলিথিক যুগ বা কাছাকাছি কোন যুগের বর্বর বলা চলে।"

"এর পরেও উনি প্রফেসর হয়েছেন ?"

"সেইটাই তো আশ্চর্য। ইউরোপে এরকম ব্রেন দ্বিতীয় কারো নেই। ও ব্রেনের কাছে কোন স্বপ্নই স্বপ্ন নয়—বাস্তব রূপায়ণ করবেনই। সতীর্থরা ওঁকে তুচক্ষে দেখতে পারেন না—কিন্তু ওঁর প্রগতিকে টেনে ধরে রাখতেও পারেন না। উনি এগিয়ে যান নিজের শক্তিতে—ফোঁস ফোঁস করতে করতে তেড়েফুঁড়ে হিংসুটে সতীর্থদের ঠেলে ফেলে দিয়ে চলেন নিজের পথে—কারও ধার ধারেন না, তোয়াক্কা রাখেন না। হাত দিয়ে যেমন হাতী ধরে রাখা যায় না—প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকেও তাঁর লক্ষ্য থেকে সরিয়ে আনা যায় না।"

"বুঝলাম। ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। এ লোকের সঙ্গে কারবারের ইচ্ছে আমার নেই। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করব।"

"মোটেই করবে না। বরঞ্চ কাঁটায় কাঁটায় যথাসময়ে দেখা করবে, ঘড়ি ধরে শেষ মিনিট পর্যন্ত যা-যা বলবেন মন দিয়ে শুনবে।"

"কেন ? কোন তুঃখে ? চুরির দায়ে বাঁধা পড়েছি নাকি ?"

"কেন শুনবে তা বলছি। তার আগে একটা কথা বলে রাখি। বুড়ো চ্যালেঞ্জার সম্বন্ধে যা বললাম, তা সত্যি—কিন্তু ঘাবড়াবার কিছু নেই। কাছে গেলে মানুষটাকে না ভালোবেসে পারা যায় না। উনি মন থেকে কারো ক্ষতি চান না। বুড়ো ভালুকের মহত্ত্ব সেইখানেই। পক্ষান্তরে, ওঁর মত নরম দরাজ মনও বড় একটা দেখা যায় না। মদিরা নদীর পাড় বরাবর একশ মাইল হেঁটে এসেছিলেন গুটি বসন্তে ভর্তি ইণ্ডিয়ান শিশুকে কোলে নিয়ে। ভাবতে পারো ? মানিয়ে নিতে পারলে মারধরের ধার দিয়েও যাবেন না উনি।"

"সে সুযোগই দেব না। যাবই না।"

"না গেলে তুমিই পস্তাবে। হেংগিস্ট ডাউন রহস্য সম্পর্কে কিছু শুনেছো কি ? দক্ষিণ উপকূলে মাটির মধ্যে ডাণ্ডা পোঁতা হচ্ছে কেন জানো ?"

"গোপনে কয়লার খনি আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে শুনেছি।"

চোখ টিপে ম্যালোন বললে—"যা শুনেছো, তাই শুনে রাখো। বুড়ো চ্যালেঞ্জারের সব কথাই আমি জানি—পাঁচকান করব না কথা দিয়েছি, তাই বলতে পারছি না। কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা যেটুকু জেনেছে, তা বলতে বাধা নেই। বেটারটন নামে এক ভদ্রলোক বেশ দুপয়সা কামিয়েছিলেন রবারের ব্যবসায়। স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি উনি চ্যালেঞ্জারকে দান করেন। সর্ত একটাই—বিজ্ঞানের কাজে লাগাতে হবে। সম্পত্তির মোট দাম নেহাৎ কম নয়—কয়েক কোটি পাউণ্ড তো বটেই। সাসেক্সের হেংগিস্ট ডাউনে বেশ কিছু জমিজমা কিনলেন চ্যালেঞ্জার। জায়গাটা পতিত জমি—খড়ি অঞ্চলের একদম উত্তর দিকে। পুরো জায়গাটা ঘিরে ফেললেন কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। জমির ঠিক মাঝখানে একটা গভীর খাদ ছিল—বৃষ্টির জলে খড়িমাটি ধুয়ে আপনা থেকেই গর্ত বেরিয়ে পড়েছিল। সেইখানে মাটি খোঁড়া আরম্ভ করলেন চ্যালেঞ্জার। পাঁচজনকে বললেন—" বলে ফের চোখ টিপল ম্যালোন—"ইংল্যাণ্ডে যে পেট্রল আছে, তা তিনি প্রমাণ করবেন। ছোট্ট অথচ আদর্শ একটা গ্রামও গড়লেন। মোটা মাইনে দিয়ে শ্রমিকদের এনে রাখলেন সেই গ্রামে—টাকার টনিকে মুখ বন্ধ রাখলেন প্রত্যেকের—ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের পেটে বোমা মারলেও মুখ থেকে কথা বার করা সম্ভব নয়। পুরো জমিটা যেমন কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা— খাদটাও তেমনি কাঁটাতারের বেড়ায় সুরক্ষিত। দিনরাত বাঘের মত এক দঙ্গল ব্লাডহাউণ্ড ছাড়া থাকে ভেতরে। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে বেশ কয়েকজন খবরের কাগজের রিপোর্টার, প্যাণ্টের পাছা আস্ত থাকেনি কারোরই—অনেকেই মরতে বসেছিল—আয়ু ছিল বলে বেঁচে গিয়েছে। কাজটা বিরাট-- ভার নিয়েছেন স্যার টমাস মর্ডেনের কোম্পানী। ওদের মুখেও কুলুপ আঁটা--কি কাজ হচ্ছে ফাঁস করেনি আজও। এবার কুয়ো খোঁড়ার দরকার। বোকামি কোরো না। কাজ করব না বললে শুধু যে একটা মোটা টাকার চেকই

হারাবে তা নয়—জীবনে যে লোকের সংস্পর্শে তুমি আসতে পারোনি, তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে—বিশ্বের বিচিত্রতম মানুষের সঙ্গে দহরম মহরম কি চাট্টিখানি কথা? সে সুযোগ কে পায় হে?"

ম্যালোনের যুক্তিই শেষ পর্যন্ত ধোপে টিঁকল। শুক্রবার সকালে চললাম এনমোর গার্ডেন্স অভিমুখে। সময়ের ব্যাপারে একটু বেশী হুঁশিয়ার হয়েছিলাম বলে দোরগোড়ায় পৌঁছোলাম বিশ মিনিট আগে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সময় কাটাচ্ছি, এমন সময়ে ফুটপাত ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড রোলসরয়েস গাড়ীটা দেখেই খটকা লাগল। দরজার গায়ে রুপোর তীর। আরে! এ গাড়ী যে জ্যাক ডিভন-শায়ারের—সুবিখ্যাত মর্ডেন কোম্পানীর ছোটকর্তা। ভদ্রলোক শিষ্টাচারের অবতার বললেই চলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই যে অবস্থায় দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল জ্যাক, তাতে আমার পিলে পর্যন্ত গেল চমকে।

বেগে ছিটকে এল জ্যাক—দরজায় দাঁড়িয়ে শূন্যে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চ্যাঁচাতে লাগল তারস্বরে—"নিপাত যা! জাহান্নমে যা! বেল্লিক বুড়ো তুই গোল্লায় যা!"

"কি ব্যাপার জ্যাক? সাতসকালেই মেজাজ খারাপ কেন?"

"আরে পিয়ারলেস যে! তুমিও কি এ কাজে নেমেছো?"

"নামতে পারি—সুযোগ এসেছে।"

"ঠেলা বুঝবে'খন।"

"তোমার চাইতে বেশী নাকি?"

"আশ্চর্য কিছু নয়। খাস চাকর এসে বলে কিনা: স্যার, প্রফেসর বলে পাঠালেন তিনি এখন একটা ডিম খেতে ব্যস্ত আছেন, আপনি যদি সুবিধেমত অন্য কোন সময়ে আসেন উনি নিশ্চয় দেখা করবেন। একটা চাকরের মারফৎ কিনা এই কথা বলা! আরে, আমি এসেছি বিয়াল্লিশ হাজার পাউণ্ডের চেক নিতে, পাওনাদারের সঙ্গে এমনি ব্যাভার।"

শিস্ দিয়ে উঠলাম।

"টাকা তাহলে পাচ্ছ না?"

"সে কথা না, টাকাকড়ির ব্যাপারে উনি খাঁটি লোক। দরাজ হাত—বুড়ো গরিলার এ গুণটা অন্তত আছে। কিন্তু কখন দেবেন, কিভাবে দেবেন—সেটা তাঁর খুশী এবং সে ব্যাপারে কারও তোয়াক্কা রাখেন না। মরুক গে, যাও তুমি—ছাখো তোমার কপালে কি জোটে," বলেই ছিটকে গিয়ে মোটরে বসে গাড়ী হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল জ্যাক।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ফুটপাতে এবং ঘন ঘন তাকাতে লাগলাম ঘড়ির দিকে। ঠিক সময় না হলে কড়া নাড়ব না। একটা কথা এই ফাঁকে বলে রাখি। খেলাধুলোর অভ্যেস আমার আছে। গায়ে মোটামুটি জোর আছে, শরীরটাও মজবুত। তা সত্ত্বেও কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কখনো এরকম সন্ত্রস্তবোধ করিনি। ভয়টা মারধরের নয়। বদ্ধ উন্মাদ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যদি মারতে আসেন, নিজেকে বাঁচানোর শক্তি আমার আছে। কিন্তু ভয় পাচ্ছি কেলেংকারীর - সেইসঙ্গে অমন শাঁসালো একটা পার্টিকে হারানোর আশংকাও আছে। এই মিশ্র অনুভূতির জন্যেই গুরগুর করছে বুকের ভেতরটা। যত ভয় তো কল্পনার মধ্যেই—আসল কাজ শুরু হয়ে গেলেই ভয়ভাবনারও অবসান ঘটে।—তাই কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় ধাক্কা দিলাম দরজায়।

দরজা খুলল খাস-চাকর। মুখখানা যেন কাঠ কুঁদে তৈরী। ভাবলেশহীন। অনেক ধাক্কা সয়ে যেন নির্বিকার। অষ্টম আশ্চর্য দেখলেও অবাক হবার পাত্র নয়।

"অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?"

"অবশ্যই আছে।"

হাতের ফর্দের পানে তাকিয়ে বললে—"কি নাম আপনার?... ঠিক আছে, মিঃ পিয়ারলেস জোন্স...সাড়ে দশটা। সব মিলে

যাচ্ছে। কিছু মনে করবেন না মিঃ জোন্স, খবরের কাগজওয়ালাদের উৎপাতে সাবধান থাকতে হয়। এত কড়াকড়ি ওদের জন্যেই— প্রফেসর দুচক্ষে দেখতে পারেন না কাগজের লোকদের। এইদিকে আসুন। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বসে আছেন আপনার পথ চেয়ে।"

পরমুহূর্তেই সম্মুখীন হলাম প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের। "লস্টওয়ার্ল্ড" গ্রন্থে বন্ধুবর ম্যালোন প্রফেসরের ভাল বর্ণনাই দিয়েছে। আমার কলমের জোর ওর মত নয়। কাজেই সে চেষ্টা করব না। সেই মুহূর্তে আমি শুধু দেখলাম মেহগনী টেবিলের ওদিকে এক বিরাট ব্যক্তির ধড়—মাঝখানে কোদালের মত প্রকাণ্ড কালো দাড়ি, ওপরে একজোড়া বিশাল ধূসর চোখ—উদ্ধত চোখের পাতা অর্ধেক নামানো। মস্ত মাথাটা পেছনে হেলিয়ে কোদাল-দাড়ি সামনে ঠেলে সারা দেহে যেন একটা অসহ্য ঔদ্ধত্যকে ফুটিযে তোলা হয়েছে। সারা গায়ে যেন লেখা রযেছে "এটা আবার কোন ঘাটেব মড়া? মতলবটা কি?" আমার কার্ড বার করে রাখলাম টেবিলে।

"হ্যা! আপনিই মিঃ পিযাবলেস জোন্স—তথাকথিত বিশেষজ্ঞ", কার্ডখানা এমনভাবে কোণ ধরে ঝুলিযে রেখে কথাগুলো বললেন প্রফেসর যেন কার্ডের গন্ধে তাঁর গা ঘিন ঘিন করছে। "আপনার ধর্মপিতার দৌলতেই কিন্তু আপনার নামটা আমার চোখে পড়ল। কি নামই দিযেছিলেন ভদ্রলোক। পিয়াবলেস—অতুলনীয়। দেখলেই হাসি পায।"

মুখখানা ভীষণ গম্ভীর করে বললাম—"আমি কিন্তু এসেছি স্যার, ব্যবসার কথা বলতে, নাম নিয়ে কথা বলতে নয।"

"আরে সর্বনাশ! আপনি তো দেখছি আচ্ছা লোক—একটুতেই গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। স্নায়ুর অবস্থা ভাল নয়—মেজাজ তাই সপ্তমে। সাবধানে কথা বলা বলা দরকার। বসুন, মাথাটা ঠাণ্ডা করুন। সিনাই পেনিনসুলার পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে আপনার লেখাটা পড়লাম। আপনিই লিখেছেন তো?"

"তাই তো মনে হয়। লেখার ওপরে আমার নামই ছাপা হয়েছে।"

"ঠিক কথা। ঠিক কথা। তবে কি জানেন, নামের তলায় লেখাটা সব সময়ে সেই নামের লোককেই লিখতে হবে—তার কোন মানে নেই। ঠিক কিনা? সে যাই হোক, আপনার কথা বিশ্বাস করলাম। লেখাটায় উৎকর্ষের অভাব নেই। বলার ধরনটা একঘেয়ে হলেও মাঝে মাঝে অভিনব আইডিয়ার চমক আছে। নতুন চিন্তার বীজ আছে। বিয়ে করেছেন?"

"আজ্ঞে না।"

"তাহলে পেটে কথা রাখতে পারবেন বলে মনে হয়।"

"কথা দিলে সে কথা আমি রাখি।"

"বেশ, বেশ, ম্যালোন ছেলেটা," এমন ভাবে বললেন যেন টেডের বয়স মোটে দশ বছর "আপনার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। আপনাকে নাকি বিশ্বাস করা যায়। এই বিশ্বাসটাই এ-কাজের সবচেয়ে বড় মূলধন। কেন না, পৃথিবীর বড় বড় সব এক্সপেরিমেন্টের মত এটাও—না, না, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচাইতে বড় এক্সপেরিমেন্ট বলতে এইটাই—আর কিছু নেই—কাজেই মুখে চাবি দিয়ে থাকতে হবে এর মধ্যে থাকলে। আমি চাই আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।"

"সে তো অনেক সম্মানের কথা।"

"সম্মান তো বটেই। এ সম্মানের ভাগ আর কাউকেই দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু উঁচুদরের কারিগরি দক্ষতার দরকার হয়ে পড়ায় ডাকতে হচ্ছে আপনাকে। যাক, কথা যখন দিয়েছেন মরে গেলেও পেটে কথা রাখবেন, তখন আসা যাক আসল কাজের কথায়। মিঃ জোন্স, এই যে পৃথিবীটার ওপরে আমরা সংসার পেতে বসে আছি, একে আমি জ্যান্ত প্রাণী বলেই মনে করি। এর শরীরে নিঃশ্বেস নেওয়ার যন্ত্র আছে, রক্তবহা শিরা উপশিরা ধমনী আছে, এমন কি নিজস্ব স্নায়ুমণ্ডলীও আছে।"

এ যে দেখছি একেবারেই উন্মাদ

প্রফেসর বললেন—"তত্ত্বটা আপনার মাথায় ঢুকল না লক্ষ্য করছি। ঢুকবে—আস্তে আস্তে। দানব জন্তুর লোমশ গায়ের সঙ্গে জল বা বাদার দারুণ মিল আছে। অনুরূপ মিল আরো রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে। অনেকদিন ধরে সারা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও জমি ঠেলে উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে। ঠিক যেন দানব জন্তু নিঃশ্বেস নিচ্ছে আস্তে আস্তে। ভূমিকম্প হচ্ছে, জমি পাহাড় হঠাৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে—দানব-জন্তু যেন আঙুল মটকাচ্ছে আর গা চুলকোচ্ছে। পরিষ্কার?"

"আগ্নেয়গিরির ব্যাপারটা বললেন না তো?"

"আরে, ওরকম বেশী তেতে থাকা জায়গা তো আমাদের দেহেও রয়েছে।"

কি সাংঘাতিক সব কথাবার্তা! কল্পনার একি ভয়ংকর উন্মত্ততা! জবাব দেব কি, বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল মাথা।

ঐ অবস্থাতেই বলে ফেললাম কোনমতে—"টেম্পারেচারের মানেটা কি এবার বলুন? পাতালে যত নামা যায়, তাপমাত্রা ততই বেড়ে যায়। তার মানে কি? পৃথিবীর জঠরটা টগবগে তরল অবস্থায় রয়েছে, তাইতো?"

হাত দিয়ে যেন আমার যুক্তিটাকে ঠেলে ফেলে দিলেন প্রফেসর।

"স্কুলে পড়াটা আজকাল বাধ্যতামূলক। কাজেই মহাশয়ের জানা থাকতে পারে যে ভূগোলকের দুপাশ কমলালেবুর মত চাপা—অর্থাৎ দুই মেরু অঞ্চল অনেকখানি এগিয়ে আছে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে। কেন্দ্রে যদি তরল উত্তাপ থাকত তাহলে সুমেরু আর কুমেরু সব চাইতে বেশী তেতে লাল হয়ে থাকত। কিন্তু বারোমাস বরফ জমে রয়েছে সেখানে। গরম একদম নেই। ঠিক কি না?"

"নতুন কথা শুনছি।"

"নতুন তো বটেই। মৌলিক চিন্তা করতে গেলে অনেক ঝক্কির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সাধারণ মানুষ নতুন ব্যাপার বুঝতেই পারে না—মাথাতেও নিতে চায় না। বলুন দিকি এটা কি?" বলে টেবিল থেকে একটা ছোট্ট বস্তু তুলে নিয়ে দেখালেন প্রফেসর।

"কাঁটাওয়ালা সামুদ্রিক জন্তু।"

"একেবারে ঠিক!" একটু বেশীরকম অবাক হয়ে বললেন প্রফেসর—দুধের বাচ্চা দারুণ কিছু করে ফেললে প্রাপ্তবয়স্ক যেমন চমকে ওঠে—সেই ভাবেই চোখ গোল গোল করে বললেন—'কাঁটাওয়ালা সামুদ্রিক জন্তুই বটে। ইকিনাস—আহা মরি কিছু নয়। ইকিনাসের মত ছোট বড় বিস্তর প্রাণী প্রকৃতির খেয়ালে ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে—কেউ বড়, কেউ ছোট। ইকিনাস তাহলে একটা মডেল—পৃথিবীর ক্ষুদে সংস্করণ। ভাল করে দেখুন, এর দুপাশ চাপা—আকারেও মোটামুটি গোল—ভূগোলকের মতই। তাহলে বলা যাক, পৃথিবী গ্রহটা আসলে একটা সুবৃহৎ ইকিনাস।—কি? আপত্তি আছে নাকি?"

আপত্তি আমার একটাই। পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর। যুক্তিটুক্তির মাথামুণ্ডু নেই। কিন্তু মুখের ওপর তা বলবার সাহস হল না। তাই ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মত নিরীহ ভাবে জিজ্ঞেস করলাম:

"জ্যান্ত প্রাণীর খাবার দরকার। পৃথিবীর খাবার আসে কোত্থেকে?"

"চমৎকার পয়েন্ট! অত্যন্ত চমৎকার পয়েন্ট!" যেন আমাকে কৃতার্থ করে ছাড়লেন, এই রকম একখানা ভাব করে বললেন প্রফেসর—"আপনার চোখ আছে। চট করে আসল জায়গায় নজর যায়। তবে সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো চোখ এড়িয়ে যায়। আপনার প্রশ্ন তাহলে পৃথিবীর পুষ্টি নিয়ে। পৃথিবী বেঁচে আছে কি খেয়ে—এই তো? বেশ, বেশ, দেখাই যাকনা ইকিনাসরা কি ভাবে বেঁচে

আছে। ইকিনাস থাকে জলের মধ্যে—সারা গায়ের ছোট ছোট নল দিয়ে সেই জল যায় শরীরের মধ্যে—যোগায় পুষ্টি।"

"তাহলে কি বলতে চান, জল খেয়ে পৃথিবী—"

"আজ্ঞে না। পৃথিবীকে পুষ্টি জোগাচ্ছে ইথার। চক্রাকার কক্ষ-পথে পৃথিবী ছুটছে। ইথারের মধ্যে ডুবে থাকার ফলে অনবরত শুষে নিচ্ছে সেই ইথার—ইথারের মধ্যে দিয়ে পুষ্টি গিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে পৃথিবীকে। ঠিক এইভাবে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-ইকিনাসরাও ইথার শুষে প্রাণটাকে রেখেছে টিঁকিয়ে। শুক্রগ্রহ, মঙ্গলগ্রহরাও দল বেঁধে ছুটছে ইথার সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে—পুষ্টি সংগ্রহও চলছে বিরামবিহীনভাবে।"

নাঃ, একেবারেই মাথা বিগড়েছে লোকটার। তর্ক করাও বাতুলতা। তাই চুপ করে রইলাম। প্রফেসর কিন্তু আমার মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিলেন। অনুকম্পার হাসি হেসে যেন জীবন ধন্য করে দিলেন।

বললেন—"এই তো মাথায় আস্তে আস্তে ঢুকছে। প্রথম প্রথম ধাঁধা লাগছে ঠিকই, সব ঠিক হয়ে যাবে এখুনি। ছোট্ট ইকিনাসকে সামনে রেখে এবার যা বলব কান পেতে শুনুন।

"ইকিনাস মহাপ্রভুর গা-টা কি রকম শক্ত দেখেছেন? আচ্ছা, এই শক্ত খোলার ওপর ক্ষুদে ক্ষুদে অনেক পোকা কি নেই? চোখে দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু আছে নিশ্চয়। ইকিনাস কি তা টের পাচ্ছে?"

"মনে হয় না।"

"তাহলেই দেখুন, ভাঙা জাহাজ বহুদিন সমুদ্রে ভেসে থাকলে গায়ে যেমন ছ্যাতলা পড়ে, মহাশূন্য দিয়ে সূর্যের চারধারে বাঁই বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর ওপরেও যদি শ্যাওলা পড়ার মত গাছপালা জন্মায়, বিবর্তনের পথে পোকা মাকড়ের মত মানুষ আর প্রাণী কিলবিল করতে থাকে, পৃথিবীর পক্ষে কি তা জানা সম্ভব?

পৃথিবীর খেয়ালই নেই জীবাণুর মত তার সারা গায়ে আমরা সংসার পেতে বসে আছি।

"এই অবস্থাই চলছে যুগযুগান্তর ধরে—কিন্তু একই পরিস্থিতি চিরকাল চলুক—আমার তা ইচ্ছে নয়। তাই ঠিক করেছি, পরিস্থিতিটাকে একটু পালটাব।"

"পরিস্থিতি পালটাবেন মানে?" প্রশ্ন করলাম বিমূঢ়ের মত।

"মানে, পৃথিবীকে জানিয়ে দেব যে আমরা আছি। সে জানুক যে আমরা নেহাৎ ফ্যালনা নই—অত উপেক্ষার বস্তু নই। অন্ততঃ একজন লোকও আছে তার খোলার ওপর, নাম যার জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার, যে ইচ্ছে করলে ব্যোমভোলা পৃথিবীকেও খুঁচিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে পারে। এমন খোঁচা তাকে মারব যা সে জীবনে খায়নি—হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে ছাড়ব জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার যে সে লোক নয়।"

"কিন্তু কিভাবে, প্রফেসর, কিভাবে?"

"এই তো পথে এসেছেন। আবার ফিরে আসা যাক কাজের কথায়। তাকান আমার ইকিনাসের দিকে। সারা গায়ে শক্ত খোলার নিচে রয়েছে স্নায়ুমণ্ডলী—নরম সংবেদনশীল দেহ। ধরুন, খোলার ওপরে বাসা বেঁধে থাকা কোন পরদেহী জন্তু ঠিক করল ইকিনাসের টনক নড়াতে হবে। কি করবে সে? নিশ্চয় খোলা ফুটো করে নরম জায়গায় হাত দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাই না?"

"তা তো বটেই।"

"এবার আসা যাক মশা কামড়ানোর উদাহরণে। মশা যখন গায়ে বসে, টের পাই না। কিন্তু যেই হুল ফোটায়, মানে, চামড়া অর্থাৎ নরদেহের খোলা ছ্যাঁদা করে ভেতরে শলাকা ঢুকিয়ে দেয়—যন্ত্রণার মাধ্যমে টের পাই গায়ের ওপর এক উৎপাত বসেছে। আমি কি করতে চাই, এবার নিশ্চয় তা মাথায় ঢুকছে। অন্ধকারে আলো দেখা যাচ্ছে।"

"কী সর্বনাশ। পৃথিবীর খোলা ফুটো করে ভেতর পর্যন্ত শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়ার প্ল্যান এঁটেছেন।"

পরম নির্লিপ্তের মত ভুই চোখ মুদলেন প্রফেসর।

বললেন—"না বলতেই আঁচ করে ফেললেন। শুধু প্ল্যানই আঁটিনি, বৎস, কাজও এগিয়েছে। পৃথিবীর খোলা-ফুটো কোনকালে হয়ে গেছে।"

"বলেন কি।"

"মর্ডেন কোম্পানী বড় ভাল কাজ করছে—রাশি রাশি বারুদ, শাবল, গাঁইতি, কোদাল, তুরপুন নিয়ে বছরের পর বছর দিবারাত্র হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কাজ শেষ করে এনেছে। আমি যা চাই তা এখন হাতের মুঠোয়।"

"আপনি কি বলতে চান ভূ-ত্বক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে?"

"ভড়কে যাওয়ার জন্যে কথার সুরটা যদি ঐ রকম হয়ে থাকে, গায়ে মাখব না। কিন্তু যদি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না মনে করে থাকেন—"

"আজ্ঞে না, ও সব কিছু নয়।"

"তাহলে যা বলব, বিনা প্রশ্নে মেনে নেবেন। ভূ-ত্বক এফোঁড় ওফোঁড় করা হয়ে গেছে। চোদ্দ হাজার চারশ বিয়াল্লিশ গজ অর্থাৎ প্রায় আট মাইল পুরু ভূ-ত্বক ফুটো করতে গিয়ে একটা মস্ত লাভও হয়েছে। দারুণ সমৃদ্ধ একটা কয়লার খনির সন্ধান পেয়েছি—যার দৌলতে এক্সপেরিমেন্টের পুরো খরচাটাই উঠে আসবে। বেগ পেতে হয়েছিল খড়িস্তরের জলের ঝর্ণা আর হেস্টিংস-বালি নিয়ে। সে বাধাও পেরিয়ে গিয়েছি—পৌঁছেছি শেষ স্তরে—মিঃ পিয়ারলেস জোন্সের স্তরে। মশার ভূমিকায় অবতীর্ণ হোন। কুয়োছেঁদার শলাকা হোক মশার হুল। চিন্তার কাজ শেষ—প্রস্থান ঘটুক চিন্তাবিদের। যন্ত্রের কাজ শুরু—প্রবেশ ঘটুক যন্ত্রবিদের। সঙ্গে থাকুক ধাতুর ডাণ্ডা—অতুলনীয়, নাকি বলেন? মাথায় ঢুকেছে?"

"আট মাইল। বলছেন কি আপনি? কুয়োখোঁড়ার শেষ সীমা পাঁচ হাজার ফুটের বেশী নয়। সিলেসিয়ায় ছ হাজার দু'শ ফুট পর্যন্ত কুয়োর অভিজ্ঞতা আমার আছে—লোকে বলে সেটাই নাকি একটা আশ্চর্য ব্যাপার।"

"মিঃ পিয়ারলেস, সব গুলিয়ে ফেললেন। হয় আমার কথায়, না হয় আপনার ব্রেনে গলদ আছে। ঠিক কোথায়, তা নিয়ে আপাততঃ আলোচনা করতে চাইনা। কুয়োখোঁড়ার শেষ সীমা কদ্দুর। সে জ্ঞান আমার টনটনে। ছ ইঞ্চি ছেঁদায় কাজ চলে গেলে নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করে বিরাট সুরঙ্গ খুঁড়তে যেতাম না। আপনাকে যা বলি তা করুন। একটা একশ ফুট লম্বা ভীষণ ধারালো ড্রিল তৈরী রাখুন—চালানো হবে ইলেকট্রিক মোটরে।"

"ইলেকট্রিক মোটর কেন?"

"মিঃ জোন্স, আমি হুকুম দিতে ডেকেছি আপনাকে—হুকুমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্যে নয়। , এমনও হতে পারে যে দূর থেকে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে ড্রিল চালানোর ফলে প্রাণে বেঁচে যেতে পারেন আপনি। —কি, পারবেন তো?"

"কেন পারবো না?"

"তাহলে শুরু করে দিন। যন্ত্রপাতি নিয়ে এখুনি চলে আসার মত অবস্থা এখনো হয়নি—কিন্তু আপনি প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আর কিছু বলার নেই আমার।"

"কিন্তু কি ধরনের মাটি ছেঁদা করতে হবে, তা বলবেন তো? বালি, না, কাদামাটি, না, খড়ি? মাটির ধরন অনুসারে কাজের রকমফের আছে যে।"

"জেলী" বললেন প্রফেসর। "ধরে নিন জেলীর মধ্যে দিয়ে ড্রিল ঢোকাতে হবে আপনাকে। আজ আর না। হাতে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। গুড মর্নিং জানাচ্ছি। আপনি এখন আসুন।

অফিসে গিয়ে কনট্রাক্ট তৈরী করে ফেলুন—আপনার দক্ষিণা তাতে লিখুন—পাঠিয়ে দিন কারখানার বড় কর্তাকে।"

মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করে পেছন ফিরলাম। কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। কৌতূহলে ফেটে পড়তে চাইছে ভেতরটা। দেখি, এইটুকু সময়ের মধ্যেই ঘাড় হেঁট করে ভীষণ বেগে পালকেব কলম দিয়ে লিখে চলেছেন প্রফেসর—ক্যাঁচ কঁ্যাচ শব্দে যেন আর্তনাদ করছে বেচারী কলম। বাধা পড়ায় রেগে মেগে তাকালেন আমার পানে।

"আবার কি? আমি তো ভাবলাম বিদেয় হয়েছেন।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস কবা হয় নি। এক্সপেরিমেণ্টটা অসাধারণ, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি?"

"বেরোন! এখুনি বেরোন!" রুদ্রমুখে উগ্রকণ্ঠে বললেন প্রফেসর—"ব্যবসাদারি মনোবৃত্তি একটু ছাড়ুন। সব কিছুই কাজে লাগানোর দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করুন। জঘন্য বাণিজ্যিক পঙ্ক থেকে নিজেকে উর্ধ্বে তুলুন। বিজ্ঞান চায় জ্ঞানের উদঘাটন। জ্ঞান আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক যেখানে খুশী—তবুও চাইব আরো জ্ঞান। আমবা কি, কেন, কোথায়—চিরন্তন এই প্রশ্নের জবাব খোঁজাই মানব মনের শ্রেষ্ঠ উচ্চাশা নয় কি? যান, ভাগুন, পালান।"

আমি পেছনে ফেরার আগেই দেখলাম অসাধারণ মানুষটা কালো চুলে বোঝাই প্রকাণ্ড মাথা গুঁজরে ফের লিখতে শুরু করে দিয়েছেন ত্বরিৎ বেগে—মাথা, চুল, দাড়ি একাকাব হয়ে গিয়েছে—কলম আবার কাতরাছে—মানুষটা যেন ইহজগৎ ছাড়িয়ে মুহূর্ত মধ্যে অন্য জগতে চলে গিয়েছেন। পেছন ফিরে এই দৃশ্যই দেখতে দেখতে চৌকাঠ পেরিয়ে এলাম—মনের চোখে তবুও ভেসে রইল আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব—মাথায় চেপে রইল তার চাইতেও আশ্চর্য এক অভিযানের দায়িত্ব।

ঘূর্ণিত মস্তকে অফিসে ফিরে এসে দেখি টেড ম্যালোন বত্রিশ

পাটি দাঁত বার করে বসে রয়েছে আমার ঘরে। সাক্ষাৎকারের বর্ণনা শোনার লোভে আগে ভাগেই চলে এসেছে বন্ধুবর।

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বলল সোল্লাসে—"কি হে, মারধর খাওনি দেখছি! চ্যাঁচামেচিও খুব একটা হয় নি। মানে, বুড়োকে কব্জায় এনে ফেলেছো। বলো দিকি কেমন লাগল বুড়ো খোকাকে?"

"জীবনে এরকম দাম্ভিক, উদ্ধত, আত্ম সিদ্ধান্তে স্ফীত মানুষ আমি দেখিনি, তা সত্ত্বেও—"

"ঠিক! ঠিক!" উল্লসিত মুখে সায় দিল ম্যালোন—"সব ক্ষাকেরই এক রা। লোকটাকে দাম্ভিক, উদ্বত, অসহ্য ইত্যাদি ইত্যাদি বলবার পরেও বলতে হবে—'তা সত্ত্বেও'। তুমি যা বললে, উনি তার চাইতেও অনেকগুণ বেশী বদ্। কিন্তু ওঁর মত বিরাট পুরুষকে আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে যাওয়া কি ঠিক? অন্যের ক্ষেত্রে যা শোভা পায় না, ওর ক্ষেত্রে তা অশোভন হবে কেন বলতে পারো?"

"আমাব চাইতে অনেক বেশী জানো তুমি ওঁর সম্বন্ধে, কাজেই ও কথা আমি বলতে না পারলেও একটা কথা বলব জোরের সঙ্গে। উনি গোঁয়ার, জেদী, উচ্চাশায় অন্ধ উন্মাদ হতে পারেন—কিন্তু যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে ওঁর জুড়ি নেই। কথাটা কি সত্যি?"

"অবশ্যই সত্যি। চ্যালেঞ্জার বাজে কথা বলার লোক নন—ওঁর কোন কাজই অকাজ নয়। কদ্দুর শুনেছো বল। হেস্টিংস ডাউনের ব্যাপার বলেছেন?"

"মোটামুটি বলেছেন।"

"পুরো ব্যাপারটাই জেনো বিরাট আকারে হতে চলেছে—চিন্তাটা যেমন বিরাট—কাজটাও তেমনি বিরাট। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের দুচক্ষে দেখতে পারেন না চ্যালেঞ্জার, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করেন। কেননা উনি জানেন ওঁর সম্মতি ছাড়া কোন খবরই

কাগজে ছাপাব না। তাই ওঁর পরিকল্পনার কিছু কিছু আমি জানি। ওঁর পাণ্ডিত্য এতই অগাধ যে কথা বলে তল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই শুধু এইটুকুই জেনো যে ওঁর পুরো প্ল্যানটাই নিরেট বনেদের ওপর তৈরী—ফালতু নয়—অবাস্তব নয়। কাজ উনি শেষ করে এনেছেন। যে কোন মুহূর্তে অনেক নতুন ঘটনাই ঘটবে—এরপর কি করতে হবে সে নির্দেশ পাবে হয় আমার মুখে না হয় ওঁর নিজের মুখে। এর মধ্যে কিন্তু তুমি কাজে কামাই দিও না—যা-যা বলেছেন তৈরী করে ফ্যালো।"

শেষ পর্যন্ত পরবর্তী নির্দেশ এল ম্যালোনেরই কাছ থেকে। কয়েক হপ্তা পরে নিজেই এল আমার আফিসে—প্রফেসরের হুকুম মত।

বললে—"চ্যালেঞ্জার পাঠিয়েছেন।"

"হাঙরের আগে আগে পাইলট মাছ ছোটে শুনেছি। তুমি সেই পাইলট মাছ।"

"যা খুশী বলতে পার। ওঁর সঙ্গে থাকলেও বুক দশহাত হয়। সত্যিই আশ্চর্য মানুষ হে—কাজ তো প্রায় মেরে এনেছেন। যে কোন মুহূর্তে ঘণ্টা বাজিয়ে পর্দা তুলে ভেল্কি দেখাবেন। এবার তোমার পালা।"

"চোখে না দেখা পর্যন্ত এক বর্ণও বিশ্বাস করছি না। তবে আমি তৈরী। মালপত্র সব গুছিয়ে রেখেছি লরীতে। হুকুম হলেই বেরিয়ে পড়ব।"

"তাহলে তাই পড়ো। তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি তো। প্রচণ্ড উদ্যম আর সময়ানুবর্তীতায় নাকি ঠাসা তোমার চরিত্র—আমার নাম ডুবিও না। আপাততঃ এসো আমার সঙ্গে। ট্রেনে বসে বলব কি করতে হবে।

সেদিন মে মাসের বাইশ তারিখ—বসন্তের মিষ্টিমধুর সকাল। শুরু হল আমার স্মরণীয় অভিযান—দুদিন পরেই যে অঞ্চল বিখ্যাত

হতে চলেছে পৃথিবীর ইতিহাসে—যে রঙ্গমঞ্চে ছোট্ট একটা ভূমিকা অভিনয়ের সুযোগ আমি পেয়েছি—রওনা হলাম সেই পতিত জমি অভিমুখে। চলন্ত ট্রেনে বসে টেড আমাকে একটা চিঠি দিল। চ্যালেঞ্জার লিখেছেন আমাকে। চিঠির মধ্যে রয়েছে আমার কর্মের ফিরিস্তি।

"মহাশয়" (শুরু হল চিঠি)—

"হেংগিস্ট ডাউনে পৌঁছে চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ বার ফোর্থের সঙ্গে দেখা করবেন—আমার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন উনিই। তরুণ বন্ধু ম্যালোন এই চিঠি নিয়ে যাচ্ছে কাউকে আমার কাছে আসতে দিতে চাই না বলে। ছোকরার সঙ্গে হরবখৎ যোগাযোগ রয়েছে আমার—লোকজনের হামলা থেকে আমাকে আগলে রাখার ভার ওকেই দিয়েছি। চোদ্দ হাজার ফুট সুরঙ্গের নিচে পৌঁছে অদ্ভুত অনেক কাণ্ডকারখানার সম্মুখীন হয়েছি। পৃথিবীগ্রহের দেহটা যে কি, সে সম্বন্ধে আমার ধারণাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়েছে। কিন্তু আরো চাঞ্চল্যকর প্রমাণ দরকার—নইলে আধুনিক বিজ্ঞানী মহলের জড় মস্তিষ্ককে সচেতন করা যাবে না। সে প্রমাণ দেবেন আপনি—দেখবে ওরা। লিফটে চড়ে পাতালে নামবার পথে, দেখবার চোখ যদি থাকে, তাহলে পর-পর দেখবেন মাধ্যমিক খড়িস্তর, কয়লার খনি, ডেভনিয়ান আর কেমব্রিয়ান নিশানা এবং সব শেষে গ্রানাইট পাথর। সুরঙ্গের বেশীর ভাগ রয়েছে এই গ্রানাইট স্তর। সুরঙ্গের তলদেশ ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। অনুগ্রহ করে ত্রিপলে হাত দেবেন না। তলার স্পর্শকাতর বস্তুটাই পৃথিবীর চামড়ার বাইরের দিক—বুঝেশুনে হাত দিতে না পারলে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে—যে কাণ্ড পরে ঘটাতে চাইছি তা আগেই ঘটে যেতে পারে। আমার নির্দেশমত তলদেশ থেকে বিশফুট ওপরে আড়াআড়ি ভাবে সুরঙ্গের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত দুটো মজবুত লোহার বরগা রাখা হয়েছে—দুটোর মাঝখানে সামান্য ফাঁক আছে। আপনার কুয়োর নল ঐ ফাঁকে আটকে থাকবে—ক্লিপের মত বরগা দুটো দুপাশ থেকে

ধরে রেখে দেবে। পঞ্চাশ ফুট লম্বা ড্রিল নিলেই কাজ চলবে। বরগার নিচ দিয়ে বিশ ফুট নেমে যাবে ত্রিপলের মাথা পর্যন্ত—আর বেশী নামাতে যাবেন না—প্রাণটা বেঘোরে যাবে। বাকী তিরিশ ফুট উঠে থাকবে বরগার ওপরে। ড্রিল ছেড়ে দিলেই নিজের ভারেই ড্রিলের ছুঁচোলো অংশ পৃথিবীর নরম বস্তুর মধ্যে আপনা থেকেই চল্লিশ ফুট পর্যন্ত ঢুকে যাবে আশা করছি। বস্তুটা অত্যন্ত নরম—ঠেলে ঢুকোনোর দরকার হবে না। মোটামুটি বুদ্ধি থাকলেই আমার এই নির্দেশ বোঝা উচিত—কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে মনে হয় আর একটু বোঝানোর দরকার। দরকার মত আমার তরুণ বন্ধু ম্যালোনের মারফৎ জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে খবর পাঠাবেন।

"জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার।"

অনুমান করে নিন কি নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে পৌঁছোলাম সাউথ ডাউন্সের উত্তর সানুদেশে—স্টরিংটন স্টেশনে। অতি ঝরঝরে একটা ব্রদ্ধিমার্কা গাড়ী দাঁড়িয়েছিল আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ভক্স-হল থারটি। সেই গাড়ীতে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে গেলাম মাইল ছ-সাত পথ। রাস্তায় লোকজন গাড়ী-ঘোড়া নেই—কিন্তু বিস্তর চাকার দাগ আছে। অর্থাৎ মালপত্র নিয়ে ভারী ভারী গাড়ী যায় হামেশাই। এক জায়গায় একটা ভাঙা লরী পড়ে আছে ঘাসের মধ্যে। বুঝলাম, আমাদের মতই অবস্থা কাহিল হয়েছিল লরীর মালিকের—লরী ফেলেই পালাতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। আরেক জায়গায় আগাছার মধ্যে উঁকি মারছে মরচে পড়া একটা বিরাট যন্ত্র। ভালভ আর পিস্টন দেখেই বুঝলাম জিনিসটা কি—হাইড্রলিক পাম্প।

কাষ্ঠ হেসে ম্যালোন বললে—"কার কাণ্ড জানো? খোদ চ্যালেঞ্জারের। উনি যেমনটি চেয়েছিলেন তার থেকে সামান্য ফারাক হয়েছিল। এক ইঞ্চির দশভাগের একভাগ। কিন্তু কিছুতেই নিলেন না—ঐখানেই ফেলে দিলেন।"

"সেকি! মামলা হয়ে যাবে যে! গেছেও নিশ্চয়?"

"মামলার কথা আর বলো না ভাই! এখানেই একটা আদালত বসানো দরকার। সারা বছর একজন বিচারপতিকে ব্যস্ত রাখার মত মামলা জুগিয়ে যাবেন চ্যালেঞ্জার। শুধু আদালত বলি কেন, একটা আলাদা গভর্ণমেন্টও দরকার শুধু ওঁর জন্যে। কারও ধার ধারেন না হে! রেক্স বনাম জর্জ চ্যালেঞ্জার, জর্জ চ্যালেঞ্জার বনাম রেক্স। এক আদালত থেকে আরেক আদালতে শয়তানের নাচ নেচে বেড়াবে দু'জনে—মামলা কিন্তু শেষ হবে না। এসে গেছি। এই যে জেনকিন্স, পথ ছাড়ো—আমি হে আমি।"

কপির মত কানওয়ালা অদ্ভুত চেহারার বিশালকায় এক ব্যক্তি গাড়ীর মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল সন্দিগ্ধ চোখে। ম্যালোনের গলা শুনে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সবুট সেলাম ঠুকল খটাৎ শব্দে।

"তাই বলুন, আপনি এসেছেন। আমি ভাবলাম আমেরিকান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সেই ছিনেজোঁকটা।

"এসে গেছে নাকি ওদের লোক?"

"আজকে এসেছিল। গতকাল তাড়িয়েছি টাইমস্-এর লোক। মাছির মত চারদিকে ভ্যানভ্যান করছে দিনরাত। ঐ দেখুন না—" দূরে দিগন্তের কাছাকাছি একটা কালো বিন্দু দেখিয়ে বললে—"চকচক করছে দেখছেন? টেলিস্কোপ বসিয়েছে চিকাগোর ডেলী নিউজ পত্রিকা। আঠার মত লেগে রয়েছে পেছনে। কাকের মত ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসে আছে বেকন বরাবর।"

"বেচারা! আমি নিজে খবরের কাগজে কাজ করি বলেই ওদের মনের অবস্থাটা বুঝি।" বলতে বলতে আমাকে নিয়ে গেট পেরিয়ে এল ম্যালোন—গেটের দুপাশে দুর্ভেদ্য কাঁটাতারের মারাত্মক বেড়া।

চীৎকারটা শুনলাম ঠিক তখনি। পেছন থেকে আকুল কণ্ঠে "ম্যালোন! টেড ম্যালোন!" বলে কে যেন বুকফাটা কান্না কেঁদে উঠল। চমকে ফিরে দেখি গেট-কীপারের আসুরিক বাহুবন্ধনে

ছটফট করছে একজন বেঁটে মোটা লোক—মোটরবাইক চালিয়ে এসে নামতে না নামতেই ঝাপটে ধরেছে দ্বাররক্ষক।

"ছাড়ো বলছি। খবরদার হাত দিও না গায়ে। ম্যালোন। হাড় গুঁড়িয়ে দিল যে গরিলাটা—ছেড়ে দিতে বলো না।"

"জেনকিন্স! জেনকিন্স। ছাড়ো, ছেড়ে দাও। আমার বন্ধু। কি হে বুড়ো বরবটি, এ তল্লাটে কি মনে করে? তোমার এখতিয়ার তো ফ্লিট স্ট্রীটে—মরতে সাসেক্সে এসেছো কেন?"

"যে জন্মে তুমি এসেছো।—গল্প একটা লিখতেই হবে হেংগিষ্ট ডাউন্স রহস্যের ওপর। হুকুম হয়েছে লেখা না নিয়ে যেন ফিরি।"

"কিন্তু রয়, তা যে হবার নয়। তারের বেড়ার এদিকে আসতে হলে অনুমতি চাই প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের।"

"আরে, সে চেষ্টাও কি করিনি। গেছিলাম আজ সকালে।"

"কি বললেন প্রফেসর?"

"কি আবাব বলবেন!" উৎকট মুখভঙ্গী করে বলল রয়—"বললেন, অনুমতি দেওয়ার আগে জানলা গলিয়ে আমাকে ফেলে দিলে কেমন হয়?"

হেসে উঠল ম্যালোন।

"তুমি তখন কি বললে?"

"আমি বললাম, দরজাটা কি দোষ করেছে? বলেই আর দাঁড়াই নি। দরজাটা যে সত্যিই কোন দোষ করেনি, তা প্রমাণ করার জন্যেই সাঁৎ করে বেরিয়ে এসেছি দরজা দিয়ে। তর্ক করার সময় তখন নয়। কিন্তু লণ্ডনের দাড়িওলা অসুরটা আর এখানকার এই গলাকাটা গুণ্ডাটা আমার ক্যামেরার বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। ম্যালোন, তুমি এদের নিয়ে আছো কি করে?"

"রয়, ইচ্ছে করলে আমি সবই পারি। কিন্তু এ-যাত্রা তুমি হেরে গেলে। ফ্লিট স্ট্রীটে তো শুনি তোমাকে নাকি আটকানোর ক্ষমতা দুনিয়ার কারো নেই—কিন্তু এখানে তোমার নাক গলানোর ক্ষমতাও

নেই। খামোকা মাঠে ময়দানে পড়ে না থেকে বরং অফিসে ফিরে যাও। দিন কয়েকের মধ্যে চ্যালেঞ্জারের অনুমতি এলেই খবর তোমার অফিসে পৌঁছে দেব।”

“ঢোকা তাহলে যাবে না?”

“একদম না।”

“টাকা দিলে আপত্তি আছে?”

“সেটা তুমিই ভাল জান।”

“শুনেছি নিউজিল্যাণ্ডে যাওয়ার সোজা রাস্তা এইটাই।”

“তার চাইতেও সোজা রাস্তায় পৌঁছে যাবে হাসপাতালে—যদি এর পরেও নাক গলানোর চেষ্টা করো। আর বকিও না—কেটে পড়ো। অনেক কাজ বাকী।”

কম্পাউণ্ডে পা দিয়ে ম্যালোন বললে—“ওর নাম রয় পার্কিন্স—যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদদাতা। এক সময়ে একসঙ্গে কাজ করেছি দুজনে। রয় নাকি অজেয়—জগতের কোন বাধাই ওর কাছে বাধা নয়—ওর সেই সুনাম আজ ক্ষুণ্ণ হল। ওর ঐ নিরীহ ভাল মানুষের মত মুখখানাই ওকে সব বাধা পার করিয়ে ছাড়ে। আচ্ছা, ঐ যে বাড়ীগুলো দেখছ—”আঙুল দিয়ে দূরে কতকগুলো লাল ছাদের ভারী সুন্দর বাংলো দেখিয়ে বললে ম্যালোন—“ওখানে থাকে শ্রমিক কর্মচারীরা। মোটা মাইনে দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে নানান জায়গা থেকে—প্রত্যেকেই অবিবাহিত এবং কথা দিয়েছে মদ খাবে না, এখানকার কথাও কাউকে বলবে না। সেইজন্যেই একটা কথাও ফাঁস হয়নি আজ পর্যন্ত। ঐ মাঠটা ফুটবল খেলার জন্যে। একটেরে বাড়ীটায় লাইব্রেরী আর স্ফূর্তি করার ঘর—দুটোই আছে। যাই বলো, বুড়ো বৈজ্ঞানিক সংগঠন করতে জানেন। ঐ আসছেন মিঃ বারফোর্থ—ইঞ্জিনীয়ারদের বড়কর্তা।”

রোগা, লম্বা, বিষণ্ণ-বদন এক ব্যক্তি ভীষণ উদ্বিগ্ন মুখে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে।

কথাও বলল বিমর্ষ কণ্ঠে—"আপনিই নিশ্চয় আর্টেজিয়ান ইঞ্জিনীয়ার? আপনি আসবেন আগেই শুনেছি। বাঁচলাম এতক্ষণে। বলব কি মশাই, আধমরা হতে বসেছি স্রেফ দায়িত্বের বোঝায়—স্নায়ু আর নিতে পারছে না। সুরঙ্গ খুঁড়ছি আজ কতদিন হল—কখন যে কি উৎপাত উঠে আসবে সেই উৎকণ্ঠাতেই প্রাণ আমার যায় যায়। কখনো তেড়েফুঁড়ে উঠছে খড়িজলের ফোয়ারা, আবার কখনো দেখছি কয়লার খনি, কখনো পেট্রলের পাতাল পুকুর, আবার কখনো স্রেফ নরকের আগুন। জানি না শেষ পর্যন্ত কি আছে—যাই থাকুক না কেন সে মোকাবিলার ভার আপনার।"

"একদম নিচে কি খুব গরম?"

"গরম তো বটেই। বিলক্ষণ গরম। তবে কি জানেন, বাতাসের ঐ চাপও বদ্ধ পরিবেশে গরম তো থাকবেই—তার বেশী নয়। টাটকা বাতাস ঢুকিয়ে বদ্ধ বাতাস যে টেনে তুলে আনা হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু বেশী গভীর সুরঙ্গে তাতে কি কোনো সুরাহা হয়? দু'ঘণ্টার বেশী পাতাল সুরঙ্গে আজ পর্যন্ত কেউ থাকতে পারেনি। প্রফেসর নিজেও নেমেছিলেন গতকাল। কাজ দেখে খুব খুশী। দুপুরে খেতে আসুন। তারপর নিজের চোখেই দেখবেন 'খন।"

সামান্যই খেলাম এবং তাড়াতাড়ি খেলাম। তারপর ম্যানেজার সযত্নে দেখালেন ইঞ্জিন-হাউসের যাবতীয় যন্ত্রপাতি। সেই সঙ্গে দেখলাম ঘাসের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তর ভাঙাচোরা কলকব্জা—কোন কাজেই আর লাগে না। একপাশে একটা প্রকাণ্ড অ্যারল হাইড্রলিক বেলচা—প্রথম দিকে মাটি খোঁড়া হয়েছে এই দিয়ে, এখন পুরো মেশিনটাই খুলে ফেলে রাখা হয়েছে ঘাসের ওপর। ঠিক তারপাশেই রয়েছে আর একটা অতিকায় মেশিন। ইস্পাতের দড়ির ওপর বাঁধা সারি সারি বালতি পাতালে নামিয়ে মাটি কাটা রাবিশ তুলে আনত পাতাল-সুরঙ্গ থেকে। পাওয়ার হাউসে হেলায় পড়ে বেশ কয়েকটা এসচার উঈস টারবাইন। সাংঘাতিক শক্তি

ধরে প্রতিটি ইঞ্জিন। হর্স-পাওয়ারের হিসেবে শক্তির ধরনটা হয়ত বোঝা যাবে না—তাই অন্যভাবে বুঝিয়ে বলছি। মিনিটে একশ চল্লিশবার ঘুরপাক খাওয়ার ক্ষমতা রাখে এক-একটা টারবাইন—চালু রাখে হাইড্রলিক অ্যাকুমুলেটর্স্—ফলে, তিন ইঞ্চি পাইপের মধ্যে দিয়ে প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে চোদ্দশ পাউণ্ডের প্রচণ্ড চাপ সুরঙ্গের মধ্যে নেমে গিয়ে চালাতে থাকে চার-চরটে রক-ড্রিল, ঘুরতে থাকে ব্র্যাণ্ড টাইপের ধারালো ফলা। ইঞ্জিন হাউসের ওপরেই পাওয়ার হাউস। চারদিকে এত আলো জ্বলছে এই পাওয়ার হাউসের দৌলতেই। তারপরেই আর একটা দু'শ অশ্বশক্তিসম্পন্ন মহাকায় টারবাইন—দশ ফুট পাখা ঘুরিয়ে বারো ইঞ্চি পাইপের মধ্যে দিয়ে হু-হু করে বাতাস ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছে সুরঙ্গের তলদেশে। ম্যানেজার অতি যত্নের সঙ্গে প্রতিটি মেশিন দেখালেন, যান্ত্রিক বিবরণ বিশদভাবে বোঝালেন। শুনতে শুনতে আমার সারা গা হাত পা-য়ে যেন খিঁচ ধরে গেল—যেমনটা এই মুহূর্তে হয়ত হচ্ছে এই কাহিনীর পাঠকের। বাঁচলাম একটা ঝরঝর দুমদাম ঝনঝনাৎ আওয়াজ শুনে। ফিরে দেখি আমারই লেল্যাণ্ড লরী আসছে। বিরাট লরী—এক সঙ্গে তিনটন মাল টানতে পারে। লরীর ওপর ঠাসা আমার যন্ত্রপাতি, টিউব এবং টুকিটাকি বিস্তর জিনিস। স্তূপাকার মালপত্রের ওপর বসে আমার ফোরম্যান পিটার, আর একজন মুখে তেল কালি মাখা ভীষণ নোংরা অ্যাসিস্ট্যান্ট। গোঁ-গোঁ করে গজরাতে গজরাতে ঘাসের ওপর গিয়ে দাঁড়াল রাক্ষুসে লেল্যাণ্ড। দুই মূর্তি টপাটপ লাফিয়ে নেমে মাল নামাতে লাগল নিচে—বক্তৃতার তোড়ে বাধা পড়ায় স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচলাম আমি। ম্যালোন আর আমাকে নিয়ে ম্যানেজার এগোলেন সুরঙ্গের দিকে।

সে এক অদ্ভুত জায়গা। মনে মনে যা ভেবেছিলাম তার চাইতে অনেক ব্যাপকভাবে এলাহি কাণ্ড চলছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। ঘোড়ার খুরের আকারে ছোটখাট পাহাড় ঘিরে রয়েছে পুরো

অঞ্চলটা। এ পাহাড় মনুষ্য নির্মিত। ধরিত্রীর জঠর বিদীর্ণ করে সুরঙ্গ নেমেছে নিচে—মাটি তুলে ঢালা হয়েছে পাহাড়ের আকারে। খড়িমাটি, কাদামাটি, কয়লা, গ্রানাইট—এই চারটে জিনিসই দেখলাম অশ্বখুরাকৃতি সেই পাহাড়ে। পাহাড় যেখানে তিন দিকে ঢালু হয়ে এসে মিশেছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে সারি সারি লোহার থাম আর বড় বড় চাকা—গম্ভীর গর্জনে চলছে পাম্প, চালু রয়েছে পাতাল-লিফট। ইটের তৈরী টানা লম্বা একটা বাড়ী নির্মিত হয়েছে আড়াআড়ি ভাবে ঘোড়ার খুরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। পাম্প রয়েছে এই বাড়ীব একদিকে—আর একদিকে সুরঙ্গের খোলা মুখ। তিরিশ কি চল্লিশ ফুট ব্যাসের একটা প্রকাণ্ড হাঁ—ওপরে ইট আর সিমেন্টের ছাউনী। ঘাড় লম্বা করে আট মাইল গভীর সেই অকল্পনীয় সুবঙ্গের গভীরে তাকাতেই মাথা ঘুরে গেল আমার। তেড়চাভাবে রোদ পড়েছে সুবঙ্গের মুখে—কয়েকশ যুট পর্যন্ত খড়িমাটির স্তর দেখা যাচ্ছে—মাটি যেখানে আলগা, ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা আছে, সেই জায়গাগুলো ইটের গাঁথনি দিয়ে মজবুত করা হয়েছে। গহ্বরটা সোজা নেমে গেছে পাতালে—অনেক নিচে অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা আলোর কণা—আলপিনের ডগার মত ছোট্ট—কিন্তু মিশমিশে অন্ধকারের বুকে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল।

"কিসের আলো, ম্যালোন?" শুধোলাম আমি।

পাঁচিলে ভর দিয়ে আমার পাশে দাঁড়াল ম্যালোন। মাথা বাড়িয়ে দেখল আলোর বিন্দুটা।

বলল—"খাঁচা উঠছে। চমৎকার লাগছে দেখতে, তাই না? চোখ ফেরানো যায় না। ও রকম অনেক খাঁচাই ওঠানামা করছে কিন্তু আট মাইল বরাবর। আলোটা শক্তিশালী আর্কল্যাম্পের। খুব জোরে আসছে—পৌঁছোবে মিনিট কয়েকের মধ্যেই।"

সত্যিই যেন নক্ষত্রবেগে উঠে এল আলোর কণাটা। অন্ধকারের

মধ্যে থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই ধেয়ে এল ওপরে। দ্রুত আকারে বৃদ্ধি পেল দ্যুতিময় কণা—প্রখর দীপ্তিতে দিনের আলোর মতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সুরঙ্গ। চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার। তাকিয়ে থাকতেও পারলাম না। তারপরেই ঘটাং ঘট করে চাতালে এসে লাগল লোহার খাঁচা। নেমে এল চারজন লোক—এগিয়ে গেল প্রবেশ পথের দিকে।

"যাক, সবাই ফিরেছে।" বললে ম্যালোন—"দু ঘণ্টা শিফট ডিউটি বড় কম কথা নয়। নিচে নামলেই বুঝবে। তোমার কিছু জিনিস এই সঙ্গে নামিয়ে দিতে পারো। তুমিও চল। নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না।"

ইঞ্জিন হাউসের লাগোয়া একটা বাড়ীতে ম্যালোন নিয়ে গেল আমাকে। হাল্কা তসরের কাপড়ে তৈরী অনেকগুলো পোশাক ঝুলছিল দেওয়ালে। ম্যালোনের দেখাদেখি আমিও আগে নিজের জুতো মোজা কোট প্যান্ট জামা গেঞ্জি—সব খুললাম। তারপর গায়ে দিলাম তসরের পোশাক—পায়ে পরলাম রবারের চটি। আমার আগেই ধড়াচূড়া পরে নিয়ে সাজঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ম্যালোন। ঠিক তার পরেই একটা ভীষণ হাঁকডাক কানে ভেসে এল—যেন এক সঙ্গে দশটা কুকুর ঝটাপটি করছে। ছুট্টে বেরিয়ে এসে দেখি আমারই সেই ঝুলকালি মাখা অ্যাসিস্ট্যান্টটিকে জাপটে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ম্যালোন। কুয়োখোঁড়ার জন্যেই পিটার ওকে এনেছে—কিন্তু ম্যালোন আসুরিক বলে কি যেন ছিনিয়ে নিতে চাইছে লোকটার হাত থেকে—তেলকালি মাখা অ্যাসিস্ট্যান্টটিও তেমনি গোঁয়ার—মরিয়া হয়ে আঁকড়ে রয়েছে জিনিসটা। কিন্তু ম্যালোনের সঙ্গে পারবে কেন—ওর গায়ের জোরের খবর আমি অন্ততঃ রাখি। হাত থেকে জিনিসটা কেড়ে নিয়ে পায়ের তলায় ফেলে দমাদম করে তার ওপর খানিক নেচে নিয়ে জিনিসটাকে টুকরো টুকরো করে ছাড়ল চক্ষের নিমেষে।

ভেঙে যাওয়ার পর বুঝলাম বস্তুটা কি। ফটো তোলার ক্যামেরা। তেলকালি মাখা আমার সেই অ্যাসিস্ট্যাণ্টটি মুখখানা আরো কালো করে উঠে দাঁড়ালো ভুমিশয্যা ছেড়ে।

বললে ভীষণ তীব্র স্বরে—"ম্যালোন, তুমি জাহান্নমে যাও। মেশিনটার দাম কত জানো? দশ গিনি। আনকোরা নতুন।"

"উপায় নেই, রয়। স্বচক্ষে যখন দেখলাম ছবি তুলছো, এ ছাড়া আর পথ ছিল না।"

রাগের চোটে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত চিড়বিড়িয়ে উঠল আমার। ধমকে উঠলাম কড়া গলায় "আমার কোম্পানীর ইউনিফর্ম পেলেন কোত্থেকে?"

রয় লোকটা সত্যিই পাজীর পা-ঝাড়া। মিটমিটে শয়তান। মিচকেপোড়া বদমাস। চোখ-টোখ টিপে দাঁত বার করে এমন একটা হাসি হাসল যেন দারুণ একখানা তামাসা হয়ে গেল এইমাত্র।

বলল—"কি যে বলেন। কায়দার কি আর শেষ আছে। এ বান্দা পারে না হেন কাজ নেই। আপনার ফোরম্যান কিন্তু কিস্সু জানেন না—ওঁকে যেন দুষবেন না। উনি তো ছেঁড়া ন্যাকড়া ভেবে ফেলে দিয়েছিলেন। আমি কি করলাম জানেন? নিজের জামা কাপড় দিলাম ওঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে—ব্যস, পেয়ে গেলাম ভেতরে আসার ছাড়পত্র।"

"ঢের হয়েছে, এখন বেরিয়ে যাও!" কাঠচেরা গলা ম্যালোনের —"না, না, তর্ক করো না। তোমার বরাত ভাল চ্যালেঞ্জার এখানে নেই। থাকলে কুকুর দিয়ে খাওয়াতেন। আমি নিজে রিপোর্টার বলেই অতটা নিষ্ঠুর হচ্ছি না—কিন্তু মনে রেখো এখানকার ডালকুত্তার কাজটা আমাকেও করতে হচ্ছে। শুধু ঘেউ ঘেউ করে ডেকেই ছেড়ে দেব তা ভেব না—ঘ্যাঁক করে কামড়েও দিতে পারি। বেরোও। বেরিয়ে যাও। কুইক মার্চ!"

হল্লা শুনে কম্পাউণ্ড থেকে দু'জন রক্ষী দৌড়ে এসেছিল। তারা

তো হেসেই খুন ম্যালোনের কাণ্ড দেখে। বত্রিশপাটি দাঁত বার করে দু'পাশ থেকে বগল দাবা করল অত্যুৎসাহী রয়কে এবং কুচকাওয়াজ করিয়ে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। এর কিছুদিন পরেই "অ্যাডভাইসার" পত্রিকায় চার-কলম জুড়ে চাঞ্চল্যকর সেই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল কেন, সুধী পাঠকপাঠিকারা এবার নিশ্চয় তা উপলব্ধি করছেন। "বৈজ্ঞানিকের উন্মাদ স্বপ্ন"—এই ছিল পিলে চমকানো সেই নিবন্ধের জবরদস্ত শিরোনামা—তার তলায় সাব-টাইটেল ছিল এই : "অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সোজা পথ"। প্রবন্ধটা বেরোনোর পরেই সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হতে হতে কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং "অ্যাডভাইসার" কাগজের সম্পাদক মশাইকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল তাঁর জীবনের সব চাইতে বিপজ্জনক এবং বিরক্তিকর এক সাক্ষাৎকারের। চ্যালেঞ্জারের মাথার শির ছিঁড়ে যায় নি নেহাৎ পরমায়ুর জোর ছিল বলে। সে কী প্রবন্ধ! রয় পার্কিন্স ওর সমস্ত প্রতিভা সন্নিবেশিত করেছিল ঐ একখানি কাহিনীর মধ্যে। অনেক রঙ চাপিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চুটিয়ে লিখেছিল "কাঁটা-তার ঘেরা গলা-কাটা গুণ্ডা বেষ্টিত টহলদার ডালকুত্তা সংরক্ষিত" কম্পাউণ্ডে "বহু-অভিজ্ঞ রণক্ষেত্র-সাংবাদিক রয় পার্কিন্সে"র রক্তজল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ; লিখেছিল কিভাবে "এনমোর গার্ডেন্সের লোমশ ষণ্ডাটা" নাকি "অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান সুরঙ্গ" প্রায় শেষ করে এনেছেন—কিন্তু তাঁর ভাড়াটে গুণ্ডারা সুরঙ্গের মুখ থেকেও মারতে মারতে টেনে এনেছে "বহু-অভিজ্ঞ রণক্ষেত্র-সাংবাদিক রয় পার্কিন্স"কে। এদের মধ্যে একজনকে রয় পার্কিন্স চেনে। "লোকটা সবজান্তা ওস্তাদ—সাংবাদিক মহলেও কিছুদিন ঘুর ঘুর করেছিল সাংবাদিক হওয়ার সুদূর স্বপ্ন নিয়ে"। আরেকজন পরেছিল "অদ্ভুত ধরনের প্রাচ্যদেশের পোশাক—কদাকার পৈশাচিক চেহারা তার—আর্টেজিয়ান ইঞ্জিনীয়ার বলে নিজেকে জাহির করলেও দেখতে মালটানা ছ্যাকরা গাড়ীর মতই"।

এইভাবে মনের সুখে আমাদের তুজনের পিণ্ডি চটকে মনটা হাল্কা হয়ে যাওয়ার পর রয় পার্কিন্স আশ্চর্য নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে পাতাল-কূপের মুখের কাছে রেললাইন পাতা হয়েছে কি ভাবে, কি ভাবে মাটি কাটা হয়েছে তেভাবেঁকা পথে যাতে ফাঁদল টাইপের ট্রেন মাটি নেওয়ার জন্যে নামতে পারে পাতাল-কূপের মুখে। জমজমাট সেই প্রবন্ধটায় লাভ হয়েছিল একটাই—সাউথ ডাউন্সের নিষ্কর্মা ভবঘুরেরা আরো বেশী করে ভীড় জমিয়েছিল আশে পাশে এবং শেষের সেইদিন যখন এসেছিল—অত কাছে জটলা পাকানোর জন্যে পস্তাতে হয়েছিল শোচনীয়ভাবে।

আমার ফোরম্যানটি সত্যিই কাজের। এইটুকু সময়ের মধ্যেই হাতাহাতি করে লরী খালি করে মালপত্র নামিয়ে ফেলেছে ঘাসের ওপর। যন্ত্রপাতি, ঘণ্টাবাক্স, ক্রোজফুট, ভি-ড্রিল, রড, ওজন - সব তৈরী। ম্যালোন কিন্তু বেঁকে বসল। ওর ইচ্ছে জিনিসপত্র পরে নামলেও চলবে—আগে নামতে হবে আমাকে। কাজেই উঠে বসলাম ইস্পাতের জাল ঘেরা খাঁচায়। চীফ ইঞ্জিনীয়ার রইলেন সঙ্গে। হু-হু করে নামতে লাগলাম ভূগর্ভে। নামতে নামতে দেখলাম, কূপের মাঝে মাঝে একটা করে চাতাল প্রত্যেকটা চাতালে ঝুলছে একটা লিফট। বৃটিশ লিফটের মত শম্বুকগতি নয়—রেলগাড়ীর মতই ছুটছে বায়ুবেগে। অথচ কিন্তু মনেই হচ্ছে না ওপর থেকে নিচে পড়ছি— যেন রেলে চড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি।

প্রতিটি খাঁচাই স্টীলের জাল দিয়ে ঘেরা—প্রখর আলো মাথা থেকে ঠিকরে যাচ্ছে কুয়োর দেওয়ালে। অস্পষ্ট কিছুই নেই। চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে ভূ-স্তরের পর ভূ-স্তর। সাঁৎ করে মিলিয়ে যাচ্ছে ওপরে। খড়িস্তর খুব পুরু নয়। তারপরেই এল কফি রঙের হেস্টিংস স্তর, হাল্কা রঙের অ্যাসবার্ণহাম স্তর, গাঢ় রঙের কার্বনিফেরাস কাদামাটি, তারপরেই বৈদ্যুতিক আলোয় ঝিকমিক করে উঠল একটার পর একটা কুচকুচে কালো কয়লার স্তর—মাঝে

মাঝে কাদামাটির বলয়। ইটের গাঁথনি দিয়ে আলগা মাটিকে জায়গায় জায়গায় ঠেকিয়ে রাখা হলেও সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে পুরো কুয়োটা দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালের নিজস্ব শক্ত গাঁথনির ওপর। দেখলে তাক লেগে যায়। কি পরিমাণ যান্ত্রিক দক্ষতা আর মেহনতের ফলে এ কাণ্ড সম্ভব হয়েছে—অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। কয়লার খনির ঠিক নিচেই যেন তাল তাল সিমেন্টের ডেলা দেখলাম মনে হল। পরক্ষণেই হু-উ-উ-স করে লিফট নেমে এল গ্রানাইট স্তরের মাঝে—চারদিকে লক্ষ হীরের মত ঝলমল করতে লাগল দেওয়ালে গাঁথা কোয়ার্জ ক্রিস্ট্যালের দানা। এই হল আদিম গ্রানাইট—হীরকচূর্ণের মত দ্যুতিময় কুয়োর দেওয়াল। নামলাম আরও নিচে—অনেক নিচে—জীবিত মানুষ এত পাতালে অবতরণের কথা কল্পনাও করতে পারেনি কখনো—একজন ছাড়া। চোখের সামনে দিয়ে তীব্রবেগে ওপরে উঠে যাচ্ছে প্রাচীন পাথরের বিচিত্র নমুনা। লালচে-সাদা ফেলসপারের স্তরটা জীবনে ভুলতে পারব না। গোলাপী রঙের আদিম প্রস্তর অপার্থিব রূপে ঝিলমিল করেছিল অনেকক্ষণ—স্তরটা অনেকখানি—প্রখর আলোয় যেন গোলাপী বিদ্যুৎ ছুটছিল দেওয়ালের গা থেকে। এইভাবে পেরিয়ে চললাম চাতালের পর চাতাল—লাফ দিয়ে ঢুকলাম এক লিফট থেকে আরেক লিফটে। উত্তরোত্তর বেড়েই চলল তাপমাত্রা—ভারী হতে লাগল বাতাস। হাল্কা তসরের পোশাকও ঘামে আটকে গেল গায়ের সাথে—দরদর ধারায় ঘাম গড়িয়ে ঢুকতে লাগল পায়ের চটিতে। শেষকালে মনে হল আর বুঝি পারব না—এত গরম সওয়ার ক্ষমতা আমার ফুরিয়েছে—ঠিক তখনি দেওয়ালের গা থেকে বার করা একটা গোলাকার চাতালে এসে দাঁড়িয়ে গেল লিফট। নেমে দাঁড়ালাম মঞ্চে। অদ্ভুত চোখে চারপাশের দেওয়াল দেখে নিল ম্যালোন। ওকে আমি জানি বলেই বলছি, ওর চোখের চাউনি দেখে সেদিন আমার বুকও কেঁপে উঠেছিল। অত বুকের পাটা দ্বিতীয় কোন পুরুষের আছে

বলে আমার জানা নেই—তা সত্ত্বেও সেদিন সেই মুহূর্তে ম্যালোনের ভয়-তরাসে চোখে ফুটে উঠেছিল আত্যন্তিক স্নায়বিক দুর্বলতা।

চীফ ইঞ্জিনীয়ার দেওয়ালে হাত বুলিয়ে নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরলেন হাতটা। বললেন—"দেখেছেন? অদ্ভুত, তাই না?" দেখলাম, চটচটে গাঁজলার মত কি যেন লেগে হাতময়। "প্রফেসর তো ভীষণ খুশী এই দেখে—আমি কিন্তু মশায় মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। দেওয়াল কি রকম কাঁপছে দেখেছেন? নিচ পর্যন্ত চলছে এই কাঁপুনি। এই দেখেই তো আনন্দে আটখানা হয়েছেন প্রফেসর। আমি কিন্তু এরকম কাণ্ড জীবনে দেখিনি মশায়।"

ম্যালোন বললে—"গতবারেও এ কাঁপুনি আমি দেখে গিয়েছি। তোমার ড্রিল লাগানোর জন্যে বরগা দুটো দেওয়ালে ঢোকানো হচ্ছিল। দেওয়াল কাটার সময়ে দেখেছি দেওয়াল যেন চমকে চমকে উঠছে। এক-একটা ঘা পড়েছে—দেওয়াল যেন শিউরে উঠেছে। বুড়োর কথা খাস লণ্ডনে অবাস্তব মনে হতে পারে— [illegible] আট মাইল নিচে নয়।"

"তেরপলের নিচে কি আছে যদি দেখেন ভিরমি খাবেন," বললেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার। "নিচের দিকের এই পাথর কিন্তু মাখনের মত নরম—কচাকচ কেটেছি—একটুও বেগ পাইনি। কিন্তু যেই পাথর গেল ফুরিয়ে, নিচে দেখা গেল সেই জিনিসটা। বলব কি মশায়—ও জিনিস পৃথিবীর কেউ কোনদিন দেখেনি। আট মাইল নিচে যে এরকম একটা স্তর থাকতে পারে, কল্পনাতেও আনা যায় না। দেখেই আঁৎকে উঠলেন প্রফেসর—'চাপা দিন। চাপা দিন। একদম ছোঁবেন না বলে দিলাম।' যেভাবে উনি চাপা দিয়েছেন, রয়েছে ঐভাবেই। কেউ হাতও দেয়নি।"

"এসেছি যখন একটু দেখতে ক্ষতি কি?"

আতংক ফুটে উঠল চীফ ইঞ্জিনীয়ারের মেহনৎ-রুক্ষ মুখে।

"বলছেন কি! প্রফেসরের সঙ্গে চালাকির পরিণামটা কি

জানেন? ভীষণ ধূর্ত উনি—ঠিক টের পেয়ে যাবেন তেরপল তোলা হয়েছিল। তারপরের ব্যাপারটা ভাবতে পারেন?—যাক গে, যা হয় হবে, কোণ তুলে ঝট করে একটু উঁকি দেওয়া যাক।"

তেরপলের কোণে বাঁধা একটা দড়ির একপ্রান্ত বাঁধা ছিল দেওয়ালে গাঁথা ববগায়। ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলোয় চকচকে তেরপলের সেই কোণটা দেখে নিয়ে দড়ি ধরে টান দিলেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার—ছ'বর্গগজ পরিমাণ জায়গা উন্মোচিত হল চোখের সামনে।

শিউরে উঠলাম অতি অসাধারণ অতি ভয়ংকর সেই দৃশ্য দেখে। দেখলাম, ধূসর বর্ণের চকচকে পিচ্ছিল গাঁজলার মত একটা বস্তু ধীর ভাবে উঠছে আর নামছে নিঃশ্বাসের ছন্দে। ধুকপুকুনিটা সরাসরি উঠছে না—যেন একটা মৃদুমন্দ তরঙ্গের অতি-ক্ষীণ আভাস—স্পন্দন বেগ সঞ্চারিত হচ্ছে ওপর দিয়ে। ওপরের চেহারাও যেন কেমনতর। এক বস্তু দিয়ে নির্মিত নয়—সর্বত্র সমান প্রকৃতির নয়। যেন ঘসা কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখছি ভেতর পর্যন্ত-দেখতে পাচ্ছি ছোটবড় কোষের মত বায়ুভর্তি বা তরল পদার্থ ভর্তি অগুন্তি বস্তু। চেহারা তাদের একরকম নয়—আকারও একরকম নয়। সাদাটে অস্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে নিহিত এক অজানা রহস্যময় জগৎ। মন্ত্রমুগ্ধের মত অসাধারণ সেই দৃশ্যের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলাম আমরা তিনজনে।

আতংক-ঘন ফিসফিসানির সুরে ম্যালোন বললে—"ঠিক যেন একটা ছাল ছাড়ানো জন্তু। ইকিনাসের দৃষ্টান্তই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল দেখছি!"

"সর্বনাশ! এই জানোয়ারের গায়ে হার্পুন গাঁথার ভারটা পড়ল শেষকালে আমারই কাঁধে!" সভয়ে বললাম আমি।

ম্যালোন বললে—"সেটা তোমার পরম সৌভাগ্য, বন্ধু! এবং আমার চরম দুর্ভাগ্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার পাশেই থাকতে হবে বলে।"

"আমি কিন্তু থাকছি না," সাফ বলে দিলেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার। প্রফেসর যদি জোর করে পাঠান, চাকরী ছেড়ে পালাব। একী! দেখুন! দেখুন! কাণ্ড দেখুন!"

ধূসর বস্তুর ওপর দিকটা সহসা উত্তাল তরঙ্গের আকারে ঠেলে উঠল আমদের দিকে—জাহাজের গলুইতে দাঁড়ালে যেভাবে ঢেউ ঠিকরে আসে—অনেকটা সেইভাবে। তারপরেই ফের আস্তে আস্তে নেমে গেল নিচে—আবার একঘেয়ে ধীর গতিতে স্পন্দিত হতে লাগল পৃষ্ঠদেশ—মৃদুমন্দ ধুকপুকুনির ক্ষীণ ধাক্কায় দুলে দুলে উঠতে লাগল ধূসর রহস্য। দড়ি আলগা করে তেরপল নামিয়ে দিলেন বারফোর্থ।

বললেন ভয়ধরা কণ্ঠে—"আমরা আছি বুঝতে পেরেছে মনে হল?"

"কিন্তু ফুলে উঠে তেড়ে এল কেন? আলোর জন্যে মনে হয়। গায়ে আলো পড়তেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।"

"এবার আমায় কি করতে হবে বলুন," বললাম আমি।

লিফট যেখানে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তার তলা থেকে দুটো লোহার মোটা বরগা আড়াআড়িভাবে ঢুকে রয়েছে দু'দিকের দেওয়ালে—মাঝে ইঞ্চি নয়েক ফাঁক। বারফোর্থ সেইদিকে আঙুল তুলে বললেন—"মতলবটা বুড়ো প্রফেসরের। আমার হাতে ছেড়ে দিলে আরও ভালভাবে করতে পারতাম। কিন্তু ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া ঝকমারি। তার চাইতে মুখ বুঁজে হুকুম তামিল করা অনেক নিরাপদ।—ওঁর ইচ্ছে আপনার ছ'ইঞ্চি ড্রিল এনে ঐ ঠেকনার ওপর কোথাও রাখবার ব্যবস্থা করুন।"

"ও আর এমন কি ব্যাপার। আজ থেকেই লাগছি কাজে।" বললাম আমি।

ধরাধামের সবকটা মহাদেশে বহু কূপখননের পাঁচরকম অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু সেদিন যে কাজে হাত দিলাম, তার তুলনা

নজীর আমার কর্মজীবনে একটিও নেই। ঐখানে দাঁড়িয়ে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম, কেন প্রফেসর বারবার বলেছিলেন ড্রিল ঢোকাতে হবে দূর থেকে। অসুবিধেও হল না। ইলেকট্রিক কারেন্টের শরণ নিলাম—কেননা আটমাইল গভীর সুরঙ্গের আগা থেকে শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রিক তার পাতা ছিল দেওয়াল বরাবর। ঠিক করলাম দূর থেকে শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রিক কনট্রোল মারফৎ ড্রিল চালিয়ে দেব ধরিত্রীর কোমল জঠরে। ফোরম্যান পিটাব আর আমি নিরতিশীম যত্নে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে টিউবগুলো এনে সাজিয়ে রাখলাম পৃথিবী-গর্ভের পাথুরে চাতালে। তারপর সব নিচের লিফট একটু ওপরে তুলে রাখলাম—কাজ করবার জায়গা বার করার জন্যে। ওজনের ভাবে ড্রিল পোঁতা যায় ঠিকই—মাধ্যাকর্ষণের জোরে আপনা থেকেই ছুঁচালো ফলা ঢুকে যাবে জঠরে—কিন্তু তবু ওজনের ওপর ভরসা রাখতে পারলাম না। সংঘট্ট-পদ্ধতি প্রয়োগ করব ঠিক করলাম—জোর ধাক্কা দিতে হবে ওপর থেকে। তাই লিফটের তলায় ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মত প্রান্তদেশ থেকে কপিকলের মধ্যে দিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম একশ পাউণ্ড ওজন সহ টিউবগুলো। ওজন বাঁধা রইল একটি দড়িতে এবং সেই দড়িটি এমনভাবে আটকানো রইল দেওয়ালে যাতে ওপর থেকে সুইচ টিপলেই বিদ্যুৎ প্রবাহের দৌলতে দড়ি খসে যাবে দেওয়াল থেকে—ওজনের ভারে ড্রিল গেঁথে যাবে নিচে। কাজটা খুব সূক্ষ্ম এবং অতীব মেহনতের—বিশেষ করে নিরক্ষীয় উত্তাপের চাইতেও জঘন্য ঐ তপ্ত আবহাওয়ায়। সর্বোপরি রয়েছে পা ফস্কে পড়ে যাওয়ার আতংক। হাত ফসকে একটা যন্ত্রও যদি ছিটকে গিয়ে পড়ে মেমপলের ওপর—অকল্পনীয় বিপর্যয় শুরু হয়ে যাবে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই। তটস্থ হয়েছিলাম পরিপার্শ্বের জন্যেও—গায়ের লোম খাড়া হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। মুহুর্মুহু অনুভব করেছি অতি-বিচিত্র একটা কাঁপুনি, একটা শিহরণ দেওয়ালের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে—হাত দিতেই

স্পষ্ট অনুভব করেছি দূরায়ত ক্ষীণ ধুকপুকুনি। তাই কাজকর্ম শেষ করে যখন ওপরে ওঠার সঙ্কেত দিলাম, কি আনন্দই যে হয়েছিল আমার আর পিটারের তা বলবার নয়। বারক্োর্থকে বললাম ঝটপট খবর দিতে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে। সব তৈরী—যখন খুশী শুরু করতে পারেন এক্সপেরিমেন্ট।

বেশী অপেক্ষা করতে হল না। কাজ শেষের তিন দিন পরেই ডাক এল।

নিমন্ত্রণ পত্রটা বাস্তবিকই অসামান্য। ঘরোয়া বৈঠকের নেমন্তন্ন যে ভাবে করা হয়, অনেকটা সেইভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রফেসর। লিখেছেন :

প্রফেসর জি. ই. চ্যালেঞ্জার

এফ. আর. এস., এম. ডি., ডি-এসসি ইত্যাদি।

(জীববিজ্ঞান সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি এবং আরও অনেক সম্মানসূচক খেতাব ও নিয়োগ-পত্রের অধিকারী—ছোট্ট এই কার্ডের স্বল্প পরিসরে অত কথা লেখবার জায়গা নেই)

আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন

মিঃ জোন্সকে (মহিলা সঙ্গিনী আনা চলবে না)

সময় : ২১শে জুন, মঙ্গলবার, সকাল সাড়ে এগারোটা।

স্থান : হেংগিষ্ট ডাউন, সাসেক্স।

উপলক্ষ্য : মন এবং জড় জগতের ওপর প্রভুত্বের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ কবার সুযোগ লাভ।

ভিক্টোরিয়া থেকে বিশেষ ট্রেন ছাড়বে দশটা পাঁচ মিনিটে। যাত্রীরা টিকিটের পয়সা দেবেন পকেট থেকে। খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে এক্সপেরিমেন্টের পর—অবস্থা আয়ত্তের বাইরে গেলে খাওয়া না হতেও পারে। স্টেশন : স্টরিঙটন।

আর এস. ভি. পি (বড় বড় অক্ষরে চ্যালেঞ্জারের নাম), ১৪, বিস, এনমোর গার্ডেন্স, এস. ডব্লিউ।

একই চিঠি পেয়েছিল ম্যালোন! কাষ্ঠ হেসে বললে—"চিঠি দিয়ে চালিয়াতি দেখাচ্ছেন বুড়ো। আরে বাবা, চিঠি না দিলেও যাব। জল্লাদের হুকুমে ফাঁসিকাঠে হাজির থাকাও বলতে পার। প্রফেসর কিন্তু এর মধ্যেই হৈ-চৈ ফেলেছেন লণ্ডনে। হাটে বাজারে পথে ঘাটে অফিসে আদালতে মুখে কেবল ওঁরই নাম। প্রচার কাকে বলে, চ্যালেঞ্জার তা জানেন।"

অবশেষে এল সেই দিন। আগের দিন রাত্রে আমি নিজে গেলাম সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখবার জন্যে। ছেঁদা করার ফলা ঝুলছে ঠিক জায়গায়, ওজন চাপানো রয়েছে হিসেব মত, সুইচ টিপলেই বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটে আসবে যে কোন মুহূর্তে। দেখে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। অদ্ভুত এই এক্সপেরিমেণ্টে আমার অংশটুকু সুচারুভাবেই পালন করতে পেরেছি ভেবে বেশ ভাল লাগল। সুইচ টেপার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে রন্ধ্র মুখ থেকে পাঁচশ গজ দূরে—যাতে কোন বিপত্তি না ঘটে। বিশেষ সেই দিনটিতে সাউথ ডাউন্সে পৌঁছে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠলাম পুরো দৃশ্যটা এক নজরে দেখবার অভিলাষে।

গ্রীষ্মের সেই মনোরম ইংলিশ প্রভাতে যা দেখলাম তা মনে থাকবে অনেকদিন। দেখলাম, পৃথিবীর সব লোক যেন জড়ো হয়েছে হেংগিষ্ট ডাউনে। যতদূর দুচোখ যায় কেবল মাথা আর মাথা। রাস্তাঘাটে পিল পিল করছে কেবল মানুষ। গলিঘুঁজি বেয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে মোটরগাড়ী—কম্পাউণ্ডের গেটে নামিয়ে দিচ্ছে আরোহীদের। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার বেশী এগোতে পারছে না। ষণ্ডামার্ক একদল রক্ষী পাহারা দিচ্ছে ফটকে। ঘুষ দিয়ে কান্নাকাটি করেও ঢোকা যাচ্ছেনা ভেতরে। কার্ড না দেখালে হাঁকিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাইরে থেকেই। পাহাড়ের গায়ে, সানুদেশে এবং এদিকে ওদিকে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে ভোর থেকেই। ফটকে তাড়া খেয়ে উৎসাহীরা ছুটে গিয়ে ভীড় বাড়াচ্ছে সেখানে। ডার্বিরেসের দিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে এপ্সম ডাউন্সকে

যে রকম দেখায়, পুরো তল্লাটটাকে দেখাচ্ছে সেই রকম। কম্পাউণ্ডের মধ্যে তার দিয়ে ঘেরা পৃথক পৃথক বসবার জায়গা। অভ্যাগতদের কার্ড পরখ করার পর নিয়ে গিয়ে বসানো হচ্ছে নির্দিষ্ট খুপরির আসনে। ঠিক যেন এক একটা খোঁয়াব। একটা খোঁয়ারে বসবেন কেবল লর্ড সভাব সদস্যবা, আব একটায হাউস অফ কমন্সের মাননীয় সভ্যবা, তাব পাশেরটায় সমাজ শিরোমণি এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। বার্লিন অ্যাকাডেমীর ডক্টর ড্রিসিঙ্গার এবং সর্বোনের লা পেলিয়ারও থাকছেন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে। টিন আর বালির বস্তা দিয়ে বিশেষ একটা দিক একেবারে আলাদা করে রাখা হয়েছে অন্যেব থেকে—এখানে বসবেন রাজ পরিবারের তিনজন।

এগারোটা পনেরো নাগাদ স্টেশন থেকে পর পর এল কয়েকটা গাড়ী। বিশিষ্ট অভ্যাগতরা এলেন সেইসব গাড়ীতে। কম্পাউণ্ডে নেমে গেলাম অতিথি অ্যাপায়নে সাহায্য করতে। বিশেষভাবে ঘেরাও করা জায়গার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। মাথায় ভার্নিশ কর চকচকে উচু টুপী, গায়ে সাদা ওয়েস্টকোটের ওপর জমকালো ফ্রককোট। চোখে হাড়পিত্তি জ্বলানো চাউনি—যেন নেমন্তন্ন করে এনে কৃতার্থ করেছেন অতিথিদের—দাঁড়ানো ভঙ্গিমায় পরিস্ফুট আত্ম-অহমিকা—যেন ওঁর সমকক্ষ ব্যক্তি এখানে কেউ নেই—একমেবাদ্বিতীয়ম। এই চেহারা দেখেই কিন্তু একজন ছিদ্রান্বেষী সমালোচক রসিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—"জেহোভা কমপ্লেক্স কাকে বলে—প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তার আদর্শ নিদর্শন"। অতিথিদের উনিও অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। মাঝে মাঝে অভ্যাগতদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দিচ্ছেন। সবাই যখন এসে গেলেন, উনি গিয়ে উঠলেন একটা উচু টিলায়। চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ালেন দেশ বিদেশের মনীষিরা। চ্যালেঞ্জার তখন এমন ভাবে বুক ফুলিয়ে চারপাশে তাকালেন যেন মনে মনে চাইছেন এবার পটাপট হাততালি দিয়ে উঠুক জ্ঞানীগুণীরা। কিন্তু সে আশা তাঁর পূর্ণ

হল না। হাততালির ধার দিয়েও কেউ গেল না। ধড়িবাজ প্রফেসর তৎক্ষণাৎ সরাসরি শুরু করলেন মূল বিষয় নিয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা। গমগমে কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে গেল কম্পাউণ্ড ছাড়িয়েও বহুদূর পর্যন্ত।

বললেন বজ্রনাদ কণ্ঠে—"ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের অনুষ্ঠানে ভদ্রমহিলাদের উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। তাই নিমন্ত্রণ জানাই নি কাউকে। তার মানে এই নয় যে আমি মহিলা বিদ্বেষী। কেন না," অপরিসীম কৌতুকবোধ এবং কপট বিনয় দেখালেন চ্যালেঞ্জার—"এখনও পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে আমার সদ্ভাব বা সুসম্পর্কে চিড় ধরেনি এতটুকুও। আসল কারণ তা নয়। আজকের এক্সপেরিমেণ্ট শেষ পর্যন্ত সফল হবেই—কিন্তু বিপদশূন্য নাও থাকতে পারে। আপনাদের মুখে যে অস্বস্তি ফুটে উঠতে দেখছি এই মুহূর্তে—আশা করি তা এই বিপদের কথা শুনে নয়। খবরের কাগজ থেকে যারা এসেছেন, তাঁদের খুশী করার জন্যে জানাই—মাটির যে পাহাড় ওদিকে দেখেছেন, ওর ওপরেই বিশেষ একটা জায়গায় আপনাদের বসবার ব্যবস্থা আমি করেছি যাতে খুব ভালভাবে দেখতে পান এক্সপেরিমেণ্ট হচ্ছে কি ভাবে। আজকের এক্সপেরিমেণ্টে ওঁরা যে আগ্রহ দেখিয়েছেন প্রথম থেকেই, একদিক দিয়ে তার সঙ্গে আমার ঔদ্ধত্যের কোনো ফারাক নেই। কিন্তু আজ আর তাঁদের কোনো নালিশ থাকা উচিত নয়—আরামে বসে দু'চোখ ভরে দেখবার সব আয়োজনই আমি করেছি। অপ্রীতিকর কিছু নাও ঘটতে পারে—সেক্ষেত্রে রিপোর্টারদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে আমার ত্রুটি থাকবে না। আর যদি কিছু ঘটে যায়, তাহলেও আয়েশ করে মাটির পাহাড়ে বসে শেষ পর্যন্ত সবকিছু দেখে লিখে নিতে পারবেন—অবশ্য যদি শেষ পর্যন্ত লেখবার মত অবস্থা থাকে।

"সামান্য একপাল মানুষকে খোঁটা দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। কিন্তু একটা ব্যাপার প্রাঞ্জল হওয়া দরকার। আমার

মত একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে আমার সব কাজের কার্য কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কাউকে অসম্মান করার জন্যে এ কথা কিন্তু বলছি না। অভদ্রভাবে ক'জন কথার মাঝে বাগড়া দেওয়া চেষ্টা করছেন দেখছি। মোষের শিংয়ের চশমাধারী ভদ্রলোককে অনুরোধ করছি, দয়া করে ছাতাটা নাড়াবেন না। (একজনের কণ্ঠস্বর : অভ্যাগতদের সম্পর্কে এ জাতীয় কথা বলা অত্যন্ত আপত্তিকর।) বুঝেছি, 'একপাল মানুষ' মন্তব্যটা অনেকের মনঃপূত হয় নি। তাহলে বরং বলা যাক, আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছেন অসামান্য একপাল মানুষ। কথার কচকচি নিয়ে খামোকা মাথা গরম করে লাভ নেই। ফট করে ভদ্রলোক বাধা দেওয়ায় যে কথাটা বলতে গিয়েও বলা হল না, এবার তা বলি। যে কাজ নিয়ে আজকের এই এক্সপেরিমেণ্ট, সে সম্পর্কে খুঁটিয়ে রসিয়ে প্রাঞ্জলভাবে আমি একখানা বই লিখেছি। বইটা এখনও প্রকাশিত হয় নি বটে, কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে পারি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটা সাড়া ফেলবে। পৃথিবী সম্পর্কে, পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে এ ধরনের যুগান্তরকারী গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয় নি এবং এককথায় বলতে গেলে, এ যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়ে থাকবে বইখানা। (দারুণ সোরগোল—আসল কথা বলুন না মশায়। ইয়ার্কি মারার জন্যে ডেকেছেন নাকি? ফালতু কথা শুনতে এসেছি মনে করেছেন?) ব্যাপারটা খোলসা করে বলার মুখেই যদি এ রকম বাধা বারবার দেখা যায়, তাহলে কিন্তু হট্টগোল থামিয়ে শান্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব আমি—বলাবাহুল্য সে ব্যবস্থা খুব সুখের নাও হতে পারে। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই : ভূ-স্তর ফুটো করে আমি একটা সুরঙ্গ বানিয়েছি এবং পৃথিবীর স্নায়ুময় বহিরাবরণে খোঁচা মেরে ফলাফলটা কি হয় দেখব মনস্থ করেছি। কাজটা খুবই সূক্ষ্ম—ভার দিয়েছি অধস্তন ব্যক্তিদের ওপর। এঁদের একজন মিঃ পিয়ারলেস জোন্স—কূপখননে বিশেষজ্ঞ বলে নিজেই নিজের নাম জাহির করেন। আর

একজন মিঃ এডোয়ার্ড ম্যালোন—আজকের এক্সপেরিমেন্টে তিনিই আমার প্রতিনিধি। সংবেদনশীল ভূপৃষ্ঠের যেটুকু বেরিয়ে আছে—পিন ফোটানো হবে সেইখানে এবং তারপর যা ঘটতে পারে সেটা এখনও বিতর্কের বিষয়। আপনারা দয়া করে যে যাঁর জায়গায় গিয়ে বসুন। এই দুই ভদ্রলোক কুয়োর মধ্যে নেমে গিয়ে শেষবারের মত দেখে আসবেন যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর আমি এইখানে বসে এই টেবিলের ওপর এই সুইচটা টিপে দেব—সম্পূর্ণ হবে এক্সপেরিমেন্ট।”

চ্যালেঞ্জারের বিছুটির জ্বালা ধরানো, গাঁক-গাঁক গলার বক্তৃতা শুনলেই হেন শ্রোতা নেই যাঁর হাড়পিত্তি না জ্বলে যায়—পৃথিবীর বহিরাবরণে ছুঁচ ফোটানোর মত তাঁদেরও মনে হয় যেন ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে স্নায়ুর মধ্যে ছুঁচ ফোটানো হয়েছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। অসন্তোষ এবং ঘোরতর আপত্তির অস্পষ্ট গুঞ্জনে মুখর হল কম্পাউণ্ড—তারই মধ্যে অভ্যাগতরা গিয়ে বসলেন যে যাঁর জায়গায়। চিবির ওপর টেবিলের সামনে একা বসে রইলেন চ্যালেঞ্জার—উত্তেজনায় কাঁপছে দাড়ি, তাঁর কালো কেশর এবং ঘনকৃষ্ণ দাড়ি—অসাধারণ সেই ব্যক্তিত্ব দেখলে বুকের ভেতরটা কেন জানি গুরগুর করে ওঠে। দৃশ্যটা কিন্তু বেশীক্ষণ উপভোগ করতে পারলাম না আমি আর ম্যালোন। জল্লাদের হুকুম তামিল করতে দ্রুতপদে অন্তর্হিত হতে হল সুরঙ্গের ভেতরে। বিশ মিনিট পরে তলদেশে পৌঁছে দড়ি ধরে টেনে তুলে ফেললাম ত্রেপল—বেরিয়ে পড়ল ধূসর ধুকুপুকুনির পার্থিব প্রহেলিকা।

কি ভাষায় বোঝাই সেই বিচিত্র বিস্ময়কে? রহস্যময় কসমিক টেলিপ্যাথি মারফৎ বৃদ্ধ গ্রহ যেন আগেই খবর পেয়ে গিয়েছে—আর দেরী নেই—এখুনি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অশ্রুতপূর্ব এক এক্সপেরিমেন্ট—কীটানুকীট মানুষদের বড্ড বেশী আস্কারা দেওয়া হয়ে গিয়েছে—রগড় দেখতে চায় বসুন্ধরার গায়ে আলপিন ফুটিয়ে। উন্মুক্ত অংশটুকু

তাই যেন টগবগ করে ফুটছে প্রচণ্ড রাগে! বড়বড় ধূসর বুদবুদ চড়চড় শব্দে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে এবং ওপরে উঠেই ফেটে যাচ্ছে বোমাফাটার শব্দে। চামড়ার নিচেই ছোটবড় কোষের মত বস্তু এবং বাতাসের ফাঁকগুলো পর্যন্ত বিষম উত্তেজনায় যেন অস্থির হয়ে উঠেছে—ঘনঘন পরস্পরের গায়ে লেগে গিয়েই আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। মৃদু মন্দ ঢেউয়ের মত যে স্পন্দন আগে দেখেছিলাম ধূসর বস্তুটার ওপর দিয়ে সুসমছন্দে বয়ে যেতে—এখন তা অনেক দ্রুত এবং প্রচণ্ড। ঘন কালচে-লাল একটা বস্তু দেখা যাচ্ছে বিচিত্র বস্তুটার ওপরকাব আবরণের ঠিক নিচে—ধমনী-শিরা-উপশিবার পেঁচালো শাখাপ্রশাখা দিয়ে যেন ভলকে ভলকে ছুটছে গাঢ় বর্ণের সেই তরল বস্তু। প্রাণের স্পন্দন পরিস্ফুট পূর্ণমাত্রায়। ভারী বাতাসে উগ্র কটু গন্ধ—মানুষের ফুসফুস সে হাওয়ায় বেশীক্ষণ টিঁকতে পারে না।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছি বর্ণনাতীত সেই দৃশ্যের পানে, এমন সময়ে নিঃসীম আতংকে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে কানের কাছে বিকট চেঁচিয়ে উঠল ম্যালোন "মাই গড, জোন্স! এদিকে ছাখো!"

পলকের জন্যে সেদিকে চেয়েছিলাম। পরমুহূর্তে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে লাফ দিয়ে লিফটে চড়ে বললাম রুদ্ধশ্বাসে চলে এসো। বাঁচতে যদি চাও, পালাও এখান থেকে!"

চকিতের জন্যে দেখেছিলাম ভয়াবহ সেই দৃশ্য। দেখেছিলাম সুরঙ্গের তলার দিকের দেওয়াল ধূসর প্রহেলিকার মতই স্পন্দিত হচ্ছে একই ছন্দে—একই তালে। ধূসর রহস্যের অতি-ব্যস্ততা সঞ্চারিত হয়েছে পাথুরে দেওয়ালেও—আসন্ন যন্ত্রণাশঙ্কায় শঙ্কিত যেন নীরস দেওয়ালও—ধুকধুক স্পন্দনের ছন্দে তাই মুহুর্মুহু সঙ্কুচিত ও প্রসারিত পাতাল-কূপের তলদেশ। কম্পনের ধাক্কা গিয়ে লাগছে বরগা দুটো দেওয়ালের যে গর্তে ঢোকানো—সেখানেও। নড়াচড়ার ফলে খসে এসেছে বরগা—ইঞ্চি কয়েক আর বাকী—স্পন্দনের ঢেউ

আর কয়েকবার আছড়ে পড়লেই খসে পড়বে নিচে। তখন আর ইলেকট্রিক রিলিজের দরকার হবে না—ছুঁচোলো ফল আপনা থেকেই আমূল ঢুকে যাবে ধরার বুকে। সে ঘটনা ঘটবার আগেই ভূগর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের দুজনকেই। আট মাইল গভীর পাতাল রন্ধ্রে থাকতে থাকতেই যদি আবো প্রচণ্ড খেঁচুনি শুরু হয়ে যায়, তাহলে আর রক্ষে নেই। কখন কোন মুহূর্তে অসাধারণ সেই ঔড়কা শুরু হবে—তা জানি না। কি মহা বিপর্যয় আরম্ভ হবে, তাও জানি না—শুধু জানি কল্পনাতীত কম্পনটা শুরু হওয়ার আগেই এই নরককুণ্ড থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের। উন্মাদের মত তাই ভূপৃষ্ঠ অভিমুখে ধেয়ে চললাম দুই মূর্তিমান।

দুঃস্বপ্নসম সেই উর্ধ্বযাত্রাব স্মৃতি কোনদিনই স্মৃতিপটে ফিকে হবে না- দুজনের কেউই মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারব না কি ভাবে সেদিন প্রাণহাতে নিয়ে দুজনে পালিয়ে এসেছিলাম পৃথিবীপৃষ্ঠে। নক্ষত্রবেগে উড়ে চলেছিল যেন লিফটের পর লিফট —তা সত্ত্বেও প্রতিটি সেকেণ্ডকে মনে হয়েছে ঘণ্টার মত সুদীর্ঘ। সাঁ-সাঁ ঝন-ঝন শব্দে পৌঁচেছি একটা চাতাল থেকে আরেকটা চাতালে—এক লিফট ছেড়ে লাফিয়ে পা দিয়েছি আরেক লিফটে। তবুও মনে হয়েছে জীবন নিয়ে আর বুঝি পৌঁছোতে পারব না সূর্যের আলো আর চাঁদের কিরণে ধোওয়া মধুময় পৃথিবী পৃষ্ঠে। প্রতিবারেই নতুন লিফটে লাফিয়ে উঠে সুইচ টিপে দিয়ে নিবিড় উৎকণ্ঠায় ইস্পাতের জালতির ফাঁক দিয়ে তাকিয়েছি রন্ধ্রমুখে- ক্ষীণ আলোক কণা পরিসরে বৃদ্ধি পেয়েছে একটু একটু করে, আশার আলোয় উদ্দীপ্ত হয়েছে নিরাশার তিমিরে আচ্ছন্ন অন্তর। আলোক বিন্দু অবশেষে বড় বৃত্ত হয়ে উঠে স্পষ্ট করে তুলেছে নীল আকাশকে—রন্ধ্রমুখের ইটের গাঁথনি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে দৃষ্টিপথে—তারপরেই কামানের মুখ থেকে গোলা বেরিয়ে আসার মত ছিটকে গিয়ে থমকে গিয়েছে শেষ চাতালে—লাফ দিয়ে

নেমেছি বাইরে—পরমানন্দে জ্যামুক্ত তীরের মত ছিটকে গিয়েছি নরম সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারেনি। বুড়ি ছুঁয়ে পালিয়ে আসার মত অবস্থা হল পরের মুহূর্তে। তিরিশ কদমও যাইনি—পাতাল-রন্ধ্রের তলদেশে খসে পড়ল আমার সূচীমুখ লৌহদণ্ড আমূল গেঁথে গেল ধরিত্রী মায়ের স্নায়ুগ্রন্থিতে এবং উপস্থিত হল চরম মুহূর্ত।

ঠিক কি ঘটেছিল অবিস্মরণীয় সেই মুহূর্তে, তা চোখ খুলে দেখবার মত অবস্থা আমার বা ম্যালোনের কারুরই ছিল না। বিক্ষুব্ধ-সাইক্লোনের আচমকা দাপটে যেন ঠিকরে গিয়েছিলাম দুজনে ঘাস জমির ওপর দিয়ে—বরফ ছাওয়া প্রান্তরের ওপর দিয়ে পাথর যেভাবে হড়কে গড়িয়ে পাকসাট খেতে খেতে ছুটে যায় দামাল ঝড়ের উৎপাতে —ঠিক সেইভাবে কে যেন আমাদের শূন্যে তুলেই আছড়ে দিয়ে গড়িয়ে দিল ঘাসজমির ওপর দিয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কান যেন ফেটে গেল একটা অতি-ভয়ংকর বুকফাটা ভীষণ আর্ত চীৎকারে। বীভৎস সেই চীৎকার পৃথিবীর মানুষ এর আগে কখনো শোনেনি। সেদিন সেখানে যাঁরা হাজির ছিলেন, বিকট চীৎকারে যাঁদের অন্তরাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিল—অশ্রুতপূর্ব সেই হাহাকার ধ্বনিকে সম্যক-ভাবে ব্যাখ্যা করার ভাষা আজও খুঁজে পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। সে চীৎকার একবারই শোনা গিয়েছিল এবং ঐ একটিমাত্র কদাকার চেঁচানির মধ্যেই যুগপৎ ফুটে উঠেছিল ক্রোধ, শাসানি, যন্ত্রণা এবং মহান প্রকৃতির দলিত সম্ভ্রমবোধ। হাজার সাইরেন ধ্বনির সম্মিলিত নির্ঘোষের মত বর্ণনাতীত সেই চীৎকার পুরো এক মিনিট ধরে বিরাম-হীন ভাবে আছড়ে পড়েছিল জনারণ্যের প্রতিটি কানে—নিথর গ্রীষ্মের আকাশ চিড়ে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি হয়ে ধেয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ উপকূলের দিকে দিকে—চ্যানেল পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল প্রতিবেশী ফরাসীদের কর্ণরন্ধ্রেও। পৃথিবীর ইতিহাসের সে চীৎকার সমতুল্য চীৎকার আর নেই—কারণ সে চীৎকার আহত ধরিত্রীর আর্ত নিনাদ।

একে মাটির ওপর দিয়ে পাকসাট খেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছি, তার ওপরে কানের পর্দায় ঐ অত্যাচার—কানে যেন তালা লেগে গেল, মাথা ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ করে। দেখবার শোনবার সমস্ত বোধশক্তি লোপ পেল কিছুক্ষণের জন্যে। অত্যাশ্চর্য দৃশ্যটার বর্ণনা শুনেছিলাম পরে—অন্যের মুখে।

ভূগর্ভ থেকে প্রথমেই উৎক্ষিপ্ত হল লিফটগুলো। দেওয়াল থেকে আলগাভাবে ঝুলছিল কেবল লিফটগুলোই—অন্যান্য যন্ত্রপাতি সাঁটা ছিল দেওয়ালের গায়ে। তাই বিস্ফোরণের ধাক্কায় দেওয়ালের যন্ত্র দেওয়ালেই লেগে রইল—কিন্তু তলা থেকে ধাক্কা খেয়ে চোদ্দটা লিফট কামান নিক্ষিপ্ত গোলার মত সটা-সট্ বেরিয়ে এসে শূন্যে উড়ে গেল একে একে। সে দৃশ্য নাকি দেখবার মত। ছররা বন্দুক থেকে পরপর লোহার গুলি ছুঁড়লে যেমন প্রতিটি গুলিই শূন্যে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে উড়ে যায়—ঠিক সেই ভাবেই চোদ্দটা লোহার খাঁচা একে একে শূন্যে ছিটকে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওয়াদিং জেটির কাছে সমুদ্র জলে—আরেকটা চিকেস্টারের কাছে একটা ক্ষেতের মাঝে। একটা খাঁচার পেছনে আর একটা খাঁচার উড়ে যাওয়ার সেই দৃশ্য যারা দেখেছেন, তাঁরা সকলেই' একবাক্যে স্বীকার করেছেন অমন দৃশ্য কালেভদ্রে কেন, কস্মিন কালেও দেখা যায় না। সুনীল স্বর্গ ভেদ করে প্রশান্ত অভিযানে উড়ে চলেছে চোদ্দটা লোহার খাঁচা— ভাবতে পারেন?

উষ্ণ প্রস্রবণটা দেখা দিল এর ঠিক পরেই। চোদ্দটা লিফট চোদ্দ দফায় শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত হওযার পরেই আলকাতরা ধরনের বা ঝোলাগুড়ের মতন চটচটে অতি জঘন্য একটা তরল বস্তু বিপুল ফোয়ারার আকারে ধেয়ে গেল প্রায় দুহাজার ফুট ওপরে। একটা অনুসন্ধিৎসু এরোপ্লেন ঠিক সেই সময়ে উড়ে এসেছিল মাথার ওপর। নিমেষ মধ্যে যেন বিমানবিধ্বংসী কামানের শিকার হতে হল বেচারীকে—প্রাণ নিয়ে পাইলট বেচারী মাঠের মধ্যেই উড়োজাহাজ

নামিয়ে ফেলল বটে—কিন্তু দেখা গেল মেশিন এবং মানুষ উভয়েই অতি কুৎসিত সেই নোংরা তরল পদার্থে প্রায় সমাধিস্থ হবার উপক্রম হয়েছে। অতি তীব্র, অতি দুর্গন্ধময় সেই বীভৎস বস্তুটা বসুন্ধরার প্রাণশক্তির আধার রুধির প্রবাহ কিনা সে বিষয়ে মতান্তর আছে। কেননা, বার্লিন বৈজ্ঞানিক মহল এবং প্রফেসর ড্রিসিঙ্গারের মতে আমেরিকায় ভোঁদর জাতীয় বা বেড়াল জাতীয় 'স্কাঙ্ক' চতুষ্পদের মত আত্মরক্ষার্থে পূতিগন্ধময় দেহরস পিচকিরির মত নির্গমনের ব্যবস্থা হয়ত ধরিত্রীর জঠরেও আছে—চ্যালেঞ্জারের মত হানাদারদের খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্মে শেষ মুহূর্ত বসুন্ধরা মা সেই বস্তুটিই অবিরল ধারায় ছড়িয়ে দিয়েছেন কীটানুকীট দু'পেয়ে উৎপাতদের অঙ্গে। পালের গোদা উৎপাতটি কিন্তু রক্ষে পেয়ে গেলেন আশ্চর্যভাবে—ঢিবির মাথায় সিংহাসনে বসে সানন্দে দেখলেন সফল এক্সপেরিমেন্টের আশ্চর্য ফল—পূতিগন্ধময় বস্তুটার একটি ফোঁটাও পড়ল না তাঁর গায়ে—কিন্তু পুরোপুরি নেয়ে উঠলেন খবরের কাগজের রিপোর্টার বেচারীরা—ফোয়ারার ঠিক নিচেই ওঁরা বসেছিলেন—গায়ের সেই দুর্গন্ধে নাকি কয়েক হপ্তা পর্যন্ত অন্নপ্রাশনের আহার পর্যন্ত উঠে আসার উপক্রম হয়েছিল আশপাশের মানুষদের এবং ভদ্রসমাজে বিচরণ বন্ধ ছিল বেশ কিছুদিন। মড়াপচা সেই বিকট গন্ধস্রাব ফোয়ারার আকারে হাওয়ায় ভর করে ভেসে গিয়েছিল দক্ষিণ দিকে এবং মজা দেখার আশায় জমায়েত বিপুল জনতার শিরে বর্ষিত হয়েছিল অঝোরধারে। কেউ মরেনি, কেউ জখম হয়নি। বাড়ী-ঘর-দোর ছেড়েও কেউ পালায়নি। কিন্তু কোনো বাড়ীতেই কেউ আর তিষ্ঠোতে পারেনি। নাক টিপে ধরেও ভয়ানক সেই দুর্গন্ধ থেকে নাকি পরিত্রাণ পাওয়া যায়নি বহুদিন পর্যন্ত। প্রতিটি দেওয়াল, প্রতিটি ছাদ, প্রতিটি জানলায় পূতিগন্ধময় স্বাক্ষর থেকে গিয়েছিল সেই পরম লগ্নের।

রন্ধ্রপথ বন্ধ হওয়া শুরু হল এর পরেই। প্রকৃতির নিয়মই হল

নিচ থেকে ক্ষত মুখ নিরাময় করা। প্রাণধারায় সূচীবিদ্ধ পৃথিবীও বিদীর্ণ ক্ষত বন্ধ করল অতি দ্রুতবেগে। আতীক্ষ্ণ শব্দলহরী প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে উঠে এল রন্ধ্রপথ বেয়ে। দেওয়ালে দেওয়াল লেগে ফুটো বন্ধ হয়ে যাওয়া আরম্ভ হয়েছে নিচের দিক থেকে—কর্ণবধিরকারী আতীব্র শব্দর পর শব্দ ভূগর্ভ থেকে অজস্র প্রতিধ্বনি হয়ে ক্রমশঃ উঠে আসছে নিচ থেকে ওপরে। অবশেষে কানের পর্দা যেন ফাটিয়ে উড়িয়ে, শ্রবণযন্ত্রকে যেন বিকল করে দিয়ে বিপুল শব্দে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে জুড়ে গেল রন্ধ্রমুখের ইঁটের তৈরী বৃত্তাকার গাঁথনি। ভূমিকম্পের মত একটা কম্পন তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে গেল চারপাশে। কাঁপুনির ঠেলায় ধ্বসে পড়ল মাটির পাহাড়। আর, সদ্যলুপ্ত ছিদ্র পথের ঠিক ওপরেই গড়ে উঠল পঞ্চাশ ফুট উঁচু লোহালক্কর আর বাজে জিনিসের একটা ছোট্ট পিরামিড। চ্যালেঞ্জারের আজব এক্সপেরিমেন্ট শুধু যে পূর্ণ পরিণতিতেই পৌঁছোলো তা নয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে কবরস্থ হয়ে রইল চিরকালের মত। পরে, রয়্যাল সোসাইটি উদ্যোগী হয়ে একটা চতুষ্কোণ সূচ্যগ্র স্তম্ভ বানিয়ে দেয় ঠিক সেই জায়গাটিতে। এই স্তম্ভটি না থাকলে আমাদের বংশধরেরা কোনদিন অত্যাশ্চর্য ঘটনাস্থলটি শেষ পর্যন্ত খুঁজেও পাবে কিনা সন্দেহ।

অতি-মনোহর বর্ণাঢ্য শেষ দৃশ্যের অবতারণা ঘটল এর ঠিক পরেই। অত্যাশ্চর্য প্রায়-অলৌকিক কাণ্ডকারখানার উপর্যুপরি আবির্ভাবের পরেই নিথর নৈঃশব্দ নেমে ছিল রবাহুত, অনাহুত, নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত সকলের মধ্যেই। দূরের এবং কাছের অগুন্তি মানুষ টুঁ শব্দটিও করতে পারে নি অনেকক্ষণ। বুদ্ধিবৃত্তি অবশ হয়ে গিয়েছিল। বিচার শক্তি লোপ পেয়েছিল। আস্থা ছিল না দর্শন-শক্তির ওপর, সন্দেহ হয়েছিল শ্রবণ যন্ত্রের সুস্থতা সম্বন্ধেও। তারপর একটু একটু করে ফের জাগ্রত হয়েছিল মগজের বোধ-শক্তি, একটু একটু করে বুঝতে পেরেছিল পরের পর ঘটে যাওয়া অদ্ভুত

অনৈসর্গিক ব্যাপারগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য। ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়েছিল কেন ঘটল এসব, ঘটালেন কে এবং কি ভাবে। সেই মুহূর্তেই নিমেষ মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ঝলকের মত আপামর জনসাধারণের চিত্তাকাশে ঝলসে উঠল অনন্যসাধারণ এক বৈজ্ঞানিকের অসমান্য কীর্তি—অন্তর দিয়ে প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করল অতি-মানুষ এই মহাবিজ্ঞানীর ধ্যানধারণা কত উচ্চস্তরের, কি পরিমাণ সুদূরপ্রসারী এবং কতখানি নিষ্ঠা, প্রত্যয় ও বিস্ময়কর প্রতিভার সমন্বয় ঘটিয়ে এইমাত্র সম্ভব করলেন এক অসম্ভব এক্সপেরিমেণ্টকে—প্রতিভাত করলেন এক মহাসত্যকে। আবেগে বিহ্বল হয়ে জনতা ছুটে এল চ্যালেঞ্জারের পানে। মাঠময়দান, টিলা, পাহাড়—দিগন্তব্যাপী কালোমাথার জনতার প্রত্যেকেই ঊর্ধ্বমুখে বিপুলকণ্ঠে অভিনন্দন জানাল তাঁকে। টিবি সিংহাসনে বসে উনি ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন অগুন্তিমানুষ ঘিরে ধরেছে তাঁকে—সহস্রকণ্ঠে প্রত্যেকেই জয়গান গাইছে তাঁর। হাতে হাতে উড়ছে গণনাতীত রুমাল। সে দৃশ্য আজও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে আমার স্মৃতি পটে। আজও চোখ বন্ধ করলে আমি সুস্পষ্ট দেখতে পাই নয়নাভিরাম সেই দৃশ্য। দেখতে পাই বিপুল হর্ষধ্বনির মাঝে আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। স্তিমিত চোখে নিরীক্ষণ করলেন উদ্বেলিত জনগণকে। মুখের পরতে পরতে ফুটে উঠল বিখ্যাত সেই মৃদু হাসি —নিজের প্রতিভা সম্পর্কে সম্যক সচেতনতার স্বাক্ষর। বাঁ হাত ন্যস্ত পাছার ওপর। ডান হাত অদৃশ্য ফ্রককোটের বুকের মধ্যে। স্মরণীয় সেই আলেখ্য কোনদিনই মুছে যাবে না পৃথিবীর ইতিহাস থেকে আরও একটি কারণে। পটাপট ক্যামেরার আওয়াজ শুনলাম আশে পাশে। ধারে কাছে দূরে সর্বত্র দেখলাম ক্যামেরার লেন্সে রোদের ঝলসানি। যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে মাঠে—এমনি ভাবে পটাপট শব্দে অজস্র ক্যামেরায় ধরে রাখা হল মহান দৃশ্যটা। গম্ভীরবদনে ঘুরে ঘুরে আট দিকের সব কটি মানুষকে

তিনি মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানালের—জুন মাসের সোনালী-রোদ সোনা বর্ষিয়ে চলল তাঁর উন্নত শিরে। মানুষের ইতিহাসে যেন সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে গেল চ্যালেঞ্জারের নাম এবং কাহিনী। চ্যালেঞ্জার মানে সেই মানুষ যিনি বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অতি বৈজ্ঞানিক; চ্যালেঞ্জার মানে সেই মানুষ যিনি পথিকৃৎদের মধ্যে মুখ্যপথিকৃৎ, চ্যালেঞ্জার মানে সেই মানুষ যাঁকে জননী বসুন্ধরা পর্যন্ত চিনতে এবং জানতে বাধ্য হয়েছেন কোটি কোটি মানুষের মধ্যে থেকে।

উপসংহারে বলব আর একটি কথা। নতুন করে যদিও বলার নেই, সকলেই জানেন এক্সপেরিমেন্টের প্রতিক্রিয়া টের পাওয়া গিয়েছিল পৃথিবীর সর্বত্রই। পিন ফোটানোর জায়গায় যে ভাবে বিকট চেঁচিয়েছে আহত পৃথিবী, সেভাবে অন্যত্র চেঁচায়নি ঠিকই। কিন্তু সত্বা যে তার একই, সে প্রমাণ রেখে গিয়েছে পৃথিবীব্যাপী বিবিধ আচরণে। যেখানে যত ফাঁক ফোকর এবং আগ্নেয়গিরি আছে—তার প্রতিটির মধ্যে দিয়ে সশব্দে বিরক্তি প্রকাশ করেছে পৃথিবী। সাংঘাতিক ভাবে তড়পেছিল আইসল্যাণ্ডের হেকলা—মহাবিপর্যয়ের আশংকায় প্রাণ উড়ে গিয়েছিল সেখানকার বাসিন্দাদের। চূড়ো উড়ে গিয়েছিল ভিসুভিয়াসের। লাভার স্রোত বেরিয়ে এসেছিল এটনার মুখ দিয়ে এবং ইটালির যাবতীয় আঙুরের ক্ষেত ধ্বংস করার জন্যে ইটালিয়ান আদালতে পাঁচলক্ষ লিরা খেসারতের মামলা আনা হবে ঠিক হয়েছে চ্যালেঞ্জারের বিরুদ্ধে। এমন কি মেক্সিকো আর মধ্য আমেরিকাতেও পৌঁছে গিয়েছিল পাতাল দেবতার আত্যন্তিক ক্ষোভের একাধিক চিহ্ন। স্ট্রম্বলির আর্তনাদে মুখর হয়ে গিয়েছিল পুরো পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল। দুনিয়া জুড়ে আলোচনা চলুক—এ উচ্চাশা মানব জাতির রক্তে আছে। কিন্তু গোটা দুনিয়াটা গলা ফাটিয়ে চেঁচাক—এ উচ্চাশার অধিকারী কেবল চ্যালেঞ্জারই।

সমাপ্ত